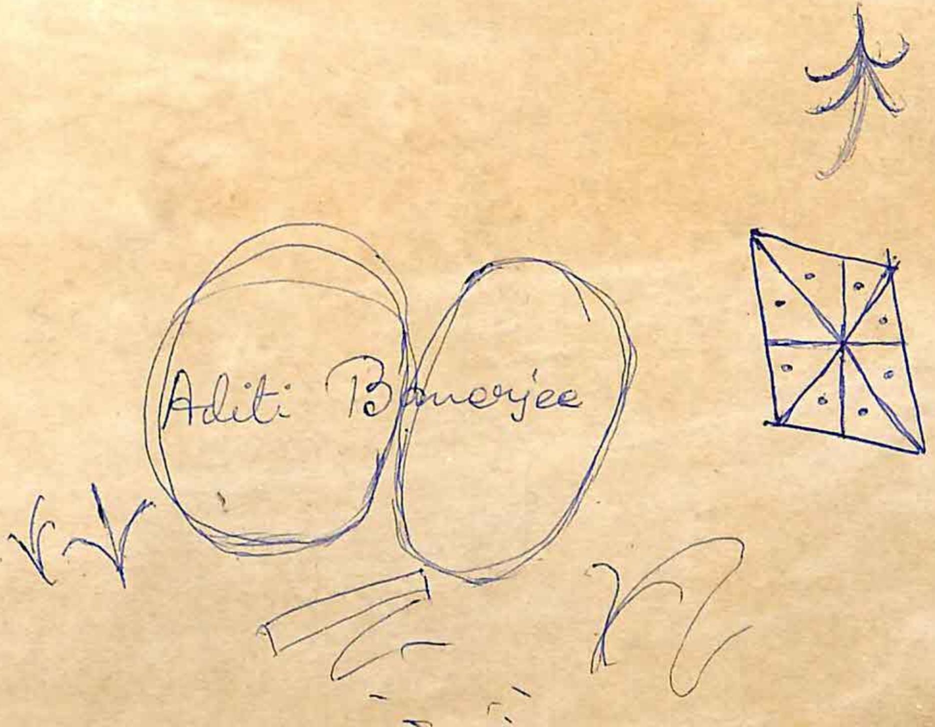
উচ্চমাধ্যমিক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

শিবনাথ চক্রবর্তী


Aditi Banerjee

উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান

(একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী)

শ্রীশিবনাথ চক্রবর্তী, এম. এ.

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, শ্যামাপ্রসাদ কলেজ, কলিকাতা

'An Introduction to Politics', 'রাষ্ট্রতত্ত্ব' (ত্রৈবার্ষিক স্নাতক সংস্করণ-১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড), 'অর্থতত্ত্ব', 'ধনবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞান', 'প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় ধনবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞান', 'উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট্, কলিকাতা-৭০০০৭৩
১৯৭৬

প্রকাশক : শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি. এ.
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট্, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ—অক্টোবর, ১৯৭৩

প্রধানমন্ত্রী নির্দেশিত ২০ দফা কর্মসূচী রূপায়ণে এবং
পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদের অনুরোধে
হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্য ১৪ টাকা ১৭ পয়সা

[ভারত সরকার প্রদত্ত স্বল্পমূল্য কাগজে মুদ্রিত]

মুদ্রাকর :

শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু
ডি. পি. প্রিণ্টার্স
৫২/১, সিকদার বাগান স্ট্রীট্
কলিকাতা-৪

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শঙ্কর প্রিণ্টার্স
২৭/৩বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট্,
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে পুনরায় পরিবর্তন ঘটিল। পূর্ব-ব্যবস্থার পরিবর্তে উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে ও কলেজগুলিতে স্বতন্ত্রভাবে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর মাধ্যমে এই নূতন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। পরিবর্তনে আপত্তি নাই যদি এই পরিবর্তিত ব্যবস্থা ছাত্র-ছাত্রীগণের প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতে এবং তাঁহাদের পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষালাভের সহায়ক হয়।

পাঠ্যসূচী অনুসরণ করিয়া পুস্তকখানি লিখিত হইল। পাঠ্যসূচীর বিষয়বস্তু যথাযথভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করা হইয়াছে। আশা করি, ছাত্র-ছাত্রীগণ পুস্তকপাঠে উপকৃত হইবেন।

প্রকাশক ও প্রেসকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

৺মহালয়া, অমাবস্যা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ
ইং ২৩. ৯. ৭৬

শ্রীশিবনাথ চক্রবর্তী
কলিকাতা-২৫

Syllabus of Political Science

(For Classes XI & XII) 200 MARKS

FOR CLASS XI

1. What is Political Science? Definition, Nature and scope– Relation with other Social Sciences; History, Economics, Sociology, Psychology and Ethics.

2. The State—Definition of the State; Characteristics of the State; Theory of State Origin.

(a) Divine Origin
(b) Force Theory.
(c) Social Contract Theory.
(d) Evolutionary Theory.

Sovereignty; its characteristics.

3. Nationality, Nation and Nationalism; Right of self-determination, Nationalism and Internationalism.

4. The United Nations—Objectives, structure and functions.

5. Law; Definition of Law; Sources of Law—Concept of Liberty; Safeguards of Liberty—Law and Liberty.

6. Citizenship—Definition of a citizen—Acquisition and loss of citizenship; Rights and Duties of a citizen—Civil and Political Rights; Fundamental Rights of an Indian Citizen—Economic and Social Rights; Directive principles in the Indian Constitution.

For Class XII

7. Constitution—Classification—Nature of the Indian Constitution; Salient features of the Indian Constitution.

8. Forms of Government—Unitary and Federal; Nature of the Indian Federation—Presidential and Parliamentary; Nature of the Indian Government; Presidential

or Parliamentary ?—Monarchy—Republic—India as a Republic.

9. Democracy—Its different forms—Merits and Demerits—Conditions for the success of Democracy—Dictatorship—Merits and Defects.

10. Organs of Government ; Functions of the different Organs of Government—Theory of Separation of powers—Executive—Single—Plural—Union and State Executives in India—President of India ; Powers and Position—Prime Minister ; Powers and Position of the Prime Minister—Legislature ; Unicameral & Bicameral—Union Legislature of India ; Its composition and functions—West Bengal State Legislature ; Its composition and functions—Processes of Law-making—Judiciary ; Independence of the Judiciary—The Indian Judiciary—Bureaucracy ; its importance and functions.

11. Public Opinion ; Its importance in a Democracy—Different Organs of Public Opinion—Party System—Functions of Political Parties ; —Merits and Demerits—One party, Bi-party and Multi-Party System—Importance of the Party system in Democracy.

12. Adult Franchise ; Arguments for and against.

সূচীপত্র

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

দ্বাদশ শ্রেণী

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইহার প্রকৃতি

(Political Science and its Nature)

সূচনা - Introduction

প্রাচ্যের পশ্চাদ্‌পদ ও পরাধীন জনসাধারণের কথা ছাড়িয়া দিলেও পাশ্চাত্য দেশসমূহের অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ও স্বাধীন জনসাধারণের মধ্যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে ঔদাসীন্য ও নিস্পৃহতা পরিলক্ষিত হইত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কাল হইতে প্রায় সর্বদেশের জনসাধারণের মধ্যে পূর্বতন এই ঔদাসীন্যের স্থলে এক সজীব ও সক্রিয় রাজনৈতিক চেতনা জন্মলাভ করিয়াছে। প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের ভাষায় বলা যায় যে, আধুনিক কালের মানুষ হঠাৎ রাজনৈতিক-চেতনা-সম্পন্ন জীবে পরিণত হইয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে মানুষের এই আকস্মিক সচেতনতা ও সক্রিয়তার কারণ হইল যে, আধুনিক মানুষের দৈনন্দিন জীবনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রভাব এরূপ সুদূরপ্রসারী যে কোন মানুষই এই প্রভাব উপেক্ষা করিতে পারে না। বর্তমান রাষ্ট্র ব্যক্তি মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তাহার সমগ্র সমাজজীবন এরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে যে, মানুষকে স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত থাকিতে বাধ্য করিয়াছে। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর প্রভাবও জাতীয় জীবনে অনতিক্রমণীয়। আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) ইহার শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে ও স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি এবং অর্থনৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে যে সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করিতেছে তাহা সদস্যরাষ্ট্রগুলির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের জনসাধারণের উপর প্রযুক্ত হইতেছে। ক্ষুদ্র ও অপেক্ষাকৃত অপরিচিত বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী সমগ্র পৃথিবীতে আজ আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া এমন কি সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ব্যক্তিকে রাষ্ট্র, সরকার, বিচারবিভাগ, সংবিধান, নির্বাচন, রাজনৈতিক দল প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের

বিশেষ বিষয়বস্তু সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। আধুনিক কালের মানুষকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান-মুখী করিতে সংবাদপত্র, টেলিফোন, দূরদর্শন, বেতার, চলচ্চিত্র প্রভৃতির অবদানও উপেক্ষণীয় নহে। আধুনিক কালে বহু ব্যক্তিই রাজনীতিকে জীবনের একটি প্রধান বৃত্তি বা পেশা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাই আজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চর্চা মানবজীবনের একটি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইতে চলিয়াছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি? ইহার সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও পরিধি—What is political Science? Definition, Nature and Scope.

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে রাষ্ট্র সম্পর্কে একটি বিশেষীকৃত জ্ঞান বলা হয়। এই জ্ঞান সমাজবিজ্ঞানেরই একটি শাখা। এই বিজ্ঞানে রাষ্ট্র সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ, রাষ্ট্রের সংগঠন, রাষ্ট্রীয় সরকার এবং রাষ্ট্রের কার্যপদ্ধতি আলোচিত হয়। আধুনিক কালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সাংগঠনিক কাঠামো (Structure) অপেক্ষা সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার (Political System) উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পর্যালোচনা রাজনৈতিক দল, বণিক সংঘ ও অন্য নানা জাতীয় চাপ-সৃষ্টিকারী সামাজিক সংগঠনগুলির (Pressure groups) প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত করিতে হয়। কারণ রাষ্ট্রীয় নীতি ও কর্মপদ্ধতি বহুল পরিমাণে এই চাপ-সৃষ্টিকারী সংগঠনগুলির প্রভাব দ্বারা নির্ধারিত হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ব্যাপক। বস্তুতঃ, এই বিজ্ঞানের সীমারেখা স্থির করা এক দুরূহ ব্যাপার। সংক্ষেপে বলা যায় যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করে: রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও সম্প্রসারণ, রাষ্ট্রীয় সংবিধানের বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক বিচার। সরকারের কাঠামো ও কার্যপদ্ধতি, বিভিন্ন প্রকারের আইন প্রণয়ন এবং ব্যক্তি ও ব্যক্তি-সমষ্টি লইয়া গঠিত সংঘগুলির কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণও এই বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর একটি প্রধান অংশ হইল আইন-প্রণয়নের বিশেষ পদ্ধতি, আইন প্রবর্তন, বলবৎকরণ ও আইনের প্রয়োগ। এতদ্ব্যতীত রাজনৈতিক ও অন্যান্য চাপ-সৃষ্টিকারী সংঘগুলির সংগঠন ও কর্মতৎপরতা, জনমতের প্রকৃতি ও প্রভাব এই বিজ্ঞানে আলোচিত হয়। বর্তমানে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কিভাবে আন্তর্জাতিক

আইন ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক শাখাসংস্থা দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাও এই বিজ্ঞানে আলোচিত হয়। পরিশেষে বলা যায় যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র সম্পর্কে নিছক বাস্তব বিবরণ ও বর্ণনার সমষ্টি মাত্র নহে, এই বিজ্ঞানের একটি দার্শনিক উদ্দেশ্যও আছে। এই উদ্দেশ্য হইল যে, অতীত ও বর্তমান রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, সরকারের সংগঠন ও কার্যপদ্ধতির তুলনামূলক বিচার সাহায্যে কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, যে সিদ্ধান্ত-গুলির ভিত্তিতে আগামীদিনের রাষ্ট্রগুলির ব্যবস্থাপনা ও কার্যপদ্ধতি ক্রমশ দোষমুক্ত হইতে পারে। অতীত ও বর্তমান রাষ্ট্রের যথাযথ স্বরূপ জানিতে পারিলেই রাষ্ট্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া মানুষ আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করিতে সমর্থ হইবে। রাষ্ট্রের আদর্শ পরিণতি কি তাহা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম বিষয়বস্তু। ব্যক্তি ও সমষ্টির পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচার ও আদর্শ সম্পর্ক স্থাপনই রাষ্ট্রের মুখ্য লক্ষ্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত এই শাস্ত্র স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। মানুষের ধর্মজ্ঞান হইতে দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি এবং এই দর্শনশাস্ত্র হইতেই রাষ্ট্রদর্শন (Political Philosophy) ও রাজনীতি (Politics) জন্ম লাভ করে। কালক্রমে মানুষের রাজনৈতিক চেতনা ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির ফলে এই শাস্ত্র ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের প্রভাবমুক্ত হইয়া এক স্বাধীন ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ শাস্ত্র হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাই এই শাস্ত্র ইহার পূর্বতন 'রাজনীতি' ও 'রাষ্ট্রদর্শন' নামকরণ পরিহার করিয়া বর্তমানে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' নামে অভিহিত হয়। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু আজ আর রাষ্ট্রতথ্য ও রাষ্ট্রতত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। ইহার বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা ও আলোচনা পদ্ধতির ভিত্তিতে এই শাস্ত্রের রাষ্ট্রবিজ্ঞান নামকরণ সার্থক হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইল যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি কি বিজ্ঞান-সুলভ? এই বিজ্ঞান কি গণিত, রসায়ন বা পদার্থবিদ্যার সমপর্যায়ভুক্ত হইতে পারে? রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান কিনা জানিতে হইলে প্রথমেই বিজ্ঞান কাহাকে বলে জানা আবশ্যক। 'বিজ্ঞান' শব্দটির সাধারণ অর্থ হইল বিশেষ রূপ বিদ্যা বা জ্ঞান। এই জ্ঞান পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা বা গবেষণার দ্বারা আহরণ করা হয় এবং

সেইজন্য এই জ্ঞানকে বিশেষ বিষয়সমূহ সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ জ্ঞান বলা হয়। এই সুসংবদ্ধ বা শৃঙ্খলিত জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা হইতে কতকগুলি সাধারণ সূত্র বা নিয়ম সংকলন করা যায় এবং সেই সংকলিত সূত্রসমূহের প্রয়োগ করিয়া বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর সত্যাসত্য নির্ণয় করা সম্ভব হয়। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতিকে বিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত করা হয়, কারণ ইহাদের বিষয়বস্তুগুলির শ্রেণীবিভাগ, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিয়া সুসংবদ্ধ জ্ঞান আহরণ করা যায় এবং এইরূপে নির্ণীত জ্ঞান হইতে কতকগুলি কার্যোপযোগী সূত্রও নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের মত তাঁহার বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিয়া রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে শৃঙ্খলিত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। মানুষের আচরণ দেশ-কাল ভেদে বিভিন্ন হইলেও মানুষের আচরণে মূলতঃ কতকগুলি সামঞ্জস্য দেখা যায়। এই মূল সামঞ্জস্যকে ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাঁহার পরীক্ষা ও গবেষণা কার্য করিতে পারেন। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে তাঁহার বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব এবং এই শ্রেণীবিভক্ত ও পরীক্ষিত জ্ঞান হইতে সাধারণ সূত্র সংকলন করিয়া বাস্তব রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে প্রয়োগ করাও সম্ভবপর। সমস্ত বিজ্ঞানেরই কতকগুলি সাধারণ সূত্র থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও রাজনৈতিক সূত্র নির্ধারণ করা সম্ভব। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রসায়নের মধ্যে পার্থক্য হইল যে, রাসায়নিক দ্রব্যগুলির নির্দিষ্ট অবস্থায় নির্দিষ্ট কারণে একই প্রকার প্রতিক্রিয়া হয়। তাই তাহাদের সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা যে সিদ্ধান্ত করা যায় তাহা নির্ভুল ও সঠিক হয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যদি মানব চরিত্রের উপর গণতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়াস পান তাহা হইলে তাহার সিদ্ধান্ত নির্ভুল হইতে পারে না। কারণ মানব চরিত্র রাসায়নিক দ্রব্যের মত সর্বত্র সমান বা অপরিবর্তনীয় নহে। অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে মানব চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। তবে সাধারণভাবে একথা বলা চলে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও পরীক্ষামূলক গবেষণা সম্ভব। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানও একটি সমাজবিজ্ঞান। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের মত প্রমাণযোগ্য না হইলেও ইহার বিজ্ঞানসুলভ প্রকৃতি অস্বীকার করা যায় না।

অতি আধুনিক কালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি এত বিস্তৃত হইয়াছে যে, এই বিজ্ঞানকে একটি একক বিজ্ঞান আখ্যা না দিয়া এই বিজ্ঞান সম্পর্কিত কতকগুলি বিশেষীকৃত শাখার সমষ্টি বলা যায়।

প্রথমতঃ, এই বিজ্ঞানের একটি অংশ রাজনৈতিক মতবাদ বা রাষ্ট্র দর্শন সম্পর্কিত আলোচনা করে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও রাষ্ট্র কর্তব্য সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ এই অংশে আলোচিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের কার্যকরী শক্তি হিসাবে সরকার ও সরকারের কার্যাবলী আলোচনা করে। তৃতীয়তঃ, দেশে প্রচলিত শাসনব্যবস্থার কাঠামো ও ইহার প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করাও এই বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। চতুর্থতঃ, আইনসভা ও আইন-প্রণয়ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি প্রধান বিষয়বস্তু বলিয়া বর্তমানে পরিগণিত হয়। পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্র প্রণীত এই আইনগুলির মধ্যে সাংবিধানিক আইন ও শাসন বিভাগীয় আইন বর্তমানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। ষষ্ঠতঃ, এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের সম্পর্ক আজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক মুখ্য আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। কোন রাষ্ট্রই আজ আর অন্য রাষ্ট্র-নিরপেক্ষভাবে ইহার কার্যাবলী পরিচালনা করিতে পারে না। সুতরাং পর-রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক এবং এই সম্পর্ক নির্ধারণকারী আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক-সংঘ—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ—আজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক অবিচ্ছেদ্য আলোচ্য বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয়। পরিশেষে বলা যায় যে, বর্তমান রাষ্ট্র আর স্থিতিশীল (Static) নাই—এই সংগঠন ও ইহার কার্যাবলীর অন্ততঃ কিয়দংশ গতিশীল (Dynamic) রূপ ধারণ করিয়াছে। জনমত, রাজনৈতিক দল ও সামাজিক অন্য নানাবিধ চাপ-সৃষ্টিকারী সংঘের প্রভাবে রাষ্ট্র আজ বিবর্তনমুখী হইয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা এই বিবর্তনের ফলে ক্রমশই বিস্তার লাভ করিতেছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের মানবীয় সম্বন্ধ বিচার

(Relation of the Political Science to other Social Sciences)

বিজ্ঞানবিষয়ক শাস্ত্রগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যথা, (ক) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Sciences) ও (২) মানবীয় বিজ্ঞান (Human or Social Sciences)। আদিম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া

বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানুষ প্রাকৃতিক ও মানবীয় জগৎ সম্বন্ধে নানারূপ তথ্য আহরণ করিয়াছে। যুক্তির ভিত্তিতে এই তথ্যগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে সজ্জিত করিয়া মানুষ নানা বিজ্ঞান সৃষ্টি করিয়াছে। প্রাকৃতিক শক্তিগুলি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিগুলি সম্বন্ধে যে তথ্যগুলির অধিকারী হইয়াছে, সেই তথ্যগুলির ভিত্তিতেই পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ-বিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান গঠিত হইয়াছে। আর, জীবজগৎ ও মানবসমাজ সম্বন্ধে মানুষ যে তথ্যগুলি আহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই তথ্যগুলির সুসংবদ্ধ ও যুক্তিসম্মত প্রকাশ হইল মানবীয় বিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, ধনবিজ্ঞান প্রভৃতি মানবীয় বিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত। উপরি-উক্ত বিভিন্ন বিজ্ঞান-বিষয়ক শাস্ত্রগুলির বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও এই শাস্ত্রগুলি কোন-না-কোন দিক দিয়া পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি মানবীয় বিজ্ঞান—সুতরাং এখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অপরাপর মানবীয় বিজ্ঞান-গুলির সম্পর্কে বিচার করা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস—Relation to History

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। স্যর জন্ সিলি ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্বন্ধ অতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইতিহাস হইল রাজনীতির মূল এবং রাজনীতিই হইল ইতিহাসের পরিণতি।

> "Politics without History has no root
> History without Politics has no fruit".

একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ইতিহাসে আলোচিত হয় মানবসমাজের ক্রমবিকাশ ও মানব-সভ্যতার বহুমুখী কাহিনী। রাষ্ট্র মানবসমাজের একটি প্রতিষ্ঠান যাহা যুগ-যুগান্তর ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্রের ক্রমবিবর্তনের কাহিনী ইতিহাসপাঠে জানা যায়। মানুষের রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় ইতিহাস হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। বস্তুতঃ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাসের নিকট অতিমাত্রায় ঋণী। ইতিহাসে মানবসমাজের রাজনৈতিক

অভিজ্ঞতার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাদিগকে ভবিষ্যতের আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করিয়া তুলিতে হইবে। সুতরাং ইতিহাসের সাহায্য ব্যতীত রাজনৈতিক জীবনের মঙ্গলময় পরিণতি হইতে পারে না। তাই বলিয়া আমরা যদি মনে করি যে, ইতিহাসে শুধু রাজনীতিরই আলোচনা হয়, তাহা হইলে মারাত্মক ভুল হইবে। ইতিহাস শুধু রাজনীতিরই ইতিহাস নয়। মানবসভ্যতার সবদিকই আলোচিত হয় এই ইতিহাসে। তাহার সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক, নৈতিক, কৃষ্টিগত সব কিছুরই কাহিনী ইতিহাসের বিষয়বস্তু। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইতিহাস হইতে শুধু সেই সকল তথ্য আহরণ করেন যে তথ্যগুলি রাজনৈতিক জীবন-সংগঠনে সহায়তা করে। ধর্মের ইতিহাসে বা চারুকলার ইতিহাসে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কোন প্রয়োজন হয় না।

ইতিহাসের সমগ্র বিষয়বস্তু যেমন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অনুসন্ধানের ক্ষেত্র নহে, সেইরূপ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমস্ত বিষয়বস্তুই ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় নাই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমন অনেক অংশ আছে যেগুলির সহিত ইতিহাসের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রের প্রকৃতিনির্ণয় বা রাষ্ট্রকর্তব্য সম্বন্ধে এমন অনেক মতবাদ আছে যাহা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত ও দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সমস্ত মতবাদের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। গার্ণার বলেন যে, ঠিকভাবে ইতিহাসের আলোচনা করিতে গেলে রাষ্ট্রনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের আলোচনা করা প্রয়োজন। আর ঠিকভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা করিতে গেলে ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা করা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান—Relation to Economics

গ্রীক দার্শনিকগণ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অনেক লেখক ধনবিজ্ঞানকে একটি পৃথক্ শাস্ত্র বলিয়া গণ্য করিতেন না। তাঁহাদের মতে ধনবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অংশ বলিয়া বিবেচিত হইত। তাঁহাদের মতে ধনবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু হইল রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনা করিবার জন্য প্রভূত পরিমাণে অর্থ আহরণ করা। ধনবিজ্ঞানের এইরূপ সংকীর্ণ সংজ্ঞা নির্দেশের কারণও ছিল। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করা এবং বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করাই রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে

করা হইত। এই কারণে রাষ্ট্রকে প্রভূত ক্ষমতাশালী করিয়া সমস্ত শক্তির আধার করিয়া গড়িয়া তোলা হইত। সেইজন্যই ধনবিজ্ঞানকে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হইত। এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের আয় প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া রাষ্ট্রকে অসীম শক্তিশালী করিয়া গঠন করা।

বর্তমান যুগে ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পরিধি অনেক ব্যাপক হইয়াছে। বর্তমানে ধনবিজ্ঞান শুধু রাষ্ট্রের জন্য অর্থসংগ্রহ লইয়া আলোচনা করে না; জনসমষ্টির কল্যাণের জন্য অর্থের ব্যবহার কিভাবে হওয়া উচিত সমগ্রভাবে তাহার আলোচনা করে। তাই বর্তমান যুগে ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হইল ধনের উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ সম্বন্ধে মানুষের যাবতীয় কাজকর্ম মানুষ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় কিভাবে ধন উৎপাদন করে ও উৎপাদিত ধন বিনিময়ের দ্বারা অর্থে রূপান্তরিত করিয়া অর্থের মাধ্যমে নিজস্ব পারিশ্রমিক নির্ধারিত করিয়া কিভাবে তাহার অভাব মোচন করে ইহাই হইল ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু। ধনের উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগব্যবস্থা বর্তমানে এত বিরাট আকার ও জটিল রূপ ধারণ করিয়াছে যে, এই শাস্ত্রের সম্যক্ অনুশীলনের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র হইতে ইহার বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। তাই বর্তমানে ধনবিজ্ঞান একটি সম্পূর্ণ পৃথক্ শাখারূপে পরিগণিত হয়।

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদিও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানের আলোচনা-ক্ষেত্র পৃথক্ তথাপি উভয় শাস্ত্র ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। উভয় শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য এক—সমাজের হিতসাধন করা। বেকার-সমস্যার দূরীকরণ, দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান ও কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিয়া দেশে যথেষ্ট ধনাগমের ব্যবস্থা করা এবং তদ্দ্বারা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন করা ধনবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। ধনবিজ্ঞানের সম্পর্করহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান কোন সুফল দিতে পারে না। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা, এমন কি রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব বহুল পরিমাণে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। অপর পক্ষে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা—ইহার ধনোৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টনব্যবস্থা বর্তমান যুগে রাষ্ট্র দ্বারা নির্ধারিত হয়। বহু অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান রাষ্ট্র ব্যতীত কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কোন প্রতিষ্ঠান করিতে পারে না। বর্তমান যুগে রাষ্ট্র

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিবার নিমিত্ত বহু জনহিতকর কার্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে রাষ্ট্র হইল ধনোৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থার একমাত্র নিয়ামক। অধুনা বহু রাষ্ট্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তিত করিয়া রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো সমগ্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত ধনবিজ্ঞানের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণ হইল যে, বর্তমান রাষ্ট্র জনগণের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত ; শুধু ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। তাই বর্তমান রাষ্ট্রকে কল্যাণরাষ্ট্র বলা হয়। এই কল্যাণরাষ্ট্র জনগণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের জন্য সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো নিয়ন্ত্রিত করে। এই রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের অবর্তমানে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে বিশেষ করিয়া ধনোৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটিত। আইনের দ্বারা রাষ্ট্র যেরূপ মানুষের সামাজিক জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া দেয়, সেইরূপ আইনের দ্বারা রাষ্ট্র মানুষের পরস্পরের সহিত অর্থনৈতিক সম্বন্ধ নির্ধারণ করিয়া সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে সহায়তা করে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানের আলোচনার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভবপর নয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান—Relation to Sociology

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মানুষের সামাজিক জীবন বিশ্লেষণ করাই হইল সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। মানুষকে লইয়া আলোচনা শুধু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে হয় না, আরও অনেক বিজ্ঞান আছে যেগুলি মানবজীবনের কোন-না-কোন দিক লইয়া আলোচনা করে। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে সকল মানবীয় বিজ্ঞানই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এই মানবীয় বিজ্ঞানগুলির কোন একটি পৃথক্‌ভাবে আলোচিত হইতে পারে না। সমাজবিজ্ঞানে মানুষের সামাজিক জীবনের সকল রকম অবস্থার আলোচনা হয়। এই বিজ্ঞানের পরিধি বহুদূর বিস্তৃত। মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় জানিতে হইলে আমাদের সমাজবিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হয়। পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি, রাষ্ট্র প্রভৃতি সমাজের ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিষ্ঠান মানবজাতির আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রভৃতি জীবনযাত্রার প্রণালী—সর্ব বিষয়ের আলোচনা হয় সমাজবিজ্ঞানে। এই কারণে সমাজ-বিজ্ঞানকে মানবীয় বিজ্ঞানগুলির মধ্যে মৌলিক বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয় সামাজিক মানুষের শুধু একটা দিক। রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া মানবজীবনের যে দিকটা আলোচিত হয় তাহাই হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু। মানুষের রাজনৈতিক কার্যকলাপগুলি মাত্র আলোচিত হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, কিন্তু সমাজবিজ্ঞানে মানুষের রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছাড়া আরও অনেক কিছু আলোচিত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু হইল নাগরিক জীবনের অধিকার ও কর্তব্য। কিন্তু এই অধিকার ও কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে সচেতন থাকে। রাষ্ট্র সমাজের অন্তর্বর্তী একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র। রাষ্ট্রজন্মের বহু পূর্বেই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং মানুষের জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ সম্বন্ধে যে সমস্ত দেশগত আচার ও পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহা রাষ্ট্রকর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং সমাজ রাষ্ট্র অপেক্ষা বৃহত্তর ও অধিক ব্যাপকভাবে মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপাদান সমাজবিজ্ঞান হইতে আহরণ করিতে হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানী না হইলে রাষ্ট্রসম্বন্ধে তাঁহার নির্ভুল ধারণা হইতে পারে না। বর্তমান যুগে যদিও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এত ব্যাপক হইয়াছে যে, সমাজবিজ্ঞানের অংশ হিসাবে আর ইহার আলোচনা সম্ভবপর নয়; তথাপি একথা সত্য যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের একটি বিশেষীকৃত শাখা। মানুষ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইবার বহু পূর্বেই সমাজ গঠন করিয়া সমাজসম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিল, সুতরাং সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর আলোচনা শুরু হয় সমাজজীবনের গোড়াপত্তন হইতে। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হয় রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হইতে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব—Relation to Psychology

মানুষ বিচারশক্তিসম্পন্ন জীব হইলেও অনেক সময় সহজাত প্রবৃত্তি, ভাবাবেগ ও উত্তেজনার দ্বারা কার্যে পরিচালিত হয়। মনস্তত্ত্বে মানুষের এই যুক্তিবহির্ভূত কার্যাবলীর আলোচনা করা হয়। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মানুষের পারস্পরিক রাজনৈতিক সম্পর্কের বিষয় আলোচিত হয়। কিন্তু মানুষের রাজনৈতিক কার্যাবলী অনেক সময়েই যুক্তিহীন ভাবাবেগ বা উত্তেজনার দ্বারা পরিচালিত হয়। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত নহে। ম্যাকডুগাল, ল্যা বঃ প্রভৃতি আধুনিক মনস্তত্ত্ববিৎ

পণ্ডিতগণ দেশের শাসনব্যবস্থার উপর মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় প্রভাবের গুরুত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যে শাসনব্যবস্থা জনসাধারণের ঐতিহ্য ও চিন্তাধারার ভিত্তিতে গঠিত, একমাত্র সেই শাসনব্যবস্থাই স্থায়িত্ব ও জনপ্রিয়তা লাভ করিতে সক্ষম হয়। অনেক সময় বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক সংস্কারের দাবীতে যে গণ-আন্দোলন উত্থিত হয় তাহা বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই দাবী প্রকৃত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা জনসাধারণের এক বিশেষ ভাবাবেগের অভিব্যক্তি মাত্র। প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা বা প্রচলিত আইনের প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং রাজনৈতিক বিপ্লবের মূলেও অনেক ক্ষেত্রে এই যুক্তিহীন গণ-বিক্ষোভ কার্যকর হইতে দেখা যায়। সুইস্ দেশে যে শাসনব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে তাহা অন্য দেশে সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই—ইহার মূলেও রহিয়াছে বিভিন্ন জাতির গঠনপ্রকৃতি ও মনোভাবের পার্থক্য। ইংলণ্ডের বিচিত্র শাসনব্যবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিলেও দেখা যায় যে, এই শাসনব্যবস্থার মূলে রহিয়াছে ইংরাজ জাতির স্বতন্ত্র জাতীয় বৈশিষ্ট্য। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু মনস্তত্ত্বের প্রভাবমুক্ত নহে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানুষের রাজনৈতিক কার্যকলাপের কিছু কিছু মনস্তত্ত্বের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হইলেও সকল রাজনৈতিক কার্যকলাপই মনস্তত্ত্বের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র—Relation to Ethics

প্রাচীন যুগের সকল দেশের দার্শনিকগণ বিশেষ করিয়া গ্রীক দার্শনিকগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিশাস্ত্রের শাখা বলিয়া গণ্য করিতেন। নীতিশাস্ত্রকেই তাঁহারা মূলশাস্ত্র বলিয়া মনে করিতেন ও রাষ্ট্রপরিচালনার মূল সূত্রগুলি নীতিশাস্ত্রের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইত। প্রাচীন ভারতেও রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ, রাজার কর্তব্য প্রভৃতি নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল্ তাঁহার 'রাজনীতি' গ্রন্থে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য-বর্ণনাপ্রসঙ্গে এই নৈতিক আদর্শের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাষ্ট্রের আদর্শ এই নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজনৈতিক কার্যকলাপের একমাত্র মাপকাঠি ছিল নৈতিক আদর্শ এবং এই নৈতিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া রাষ্ট্রের কার্য প্রধানতঃ পরিচালিত হইত।

ইতালীয় চিন্তানায়ক ম্যাকিয়াভেলি সর্বপ্রথম রাজনীতিকে নীতিশাস্ত্র হইতে পৃথক করিয়া নৈতিক আদর্শের পরিবর্তে সুবিধাবাদ আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলপ্রয়োগ মতবাদ ও সামাজিক চুক্তি-মতবাদ প্রচারের ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পুরাতন নৈতিক আদর্শবাদ পরিত্যাগ করিয়া নূতন আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইল। হব্‌স্‌, লক্‌, রুশো প্রভৃতি লেখকগণ এইরূপে নূতন আদর্শের সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিশাস্ত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিতে সহায়তা করেন। ফলে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ পৃথক্ শাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করিল।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু যে নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হইতে পৃথক্ এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক। নীতিশাস্ত্র মানুষের সমগ্র জীবনের—তাহার চিন্তাধারা, উদ্দেশ্য ও বাহিক আচরণ সব লইয়াই আলোচনা করে। রাষ্ট্র-বিজ্ঞান আলোচনা করে শুধু মানুষের বাহিক আচরণের। রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করে এ কথা বলিলেও ভুল হইবে, কেন-না রাষ্ট্র-বিজ্ঞান মানুষের সমগ্র বহির্জীবন লইয়াই আলোচনা করিতে পারে না। শুধুমাত্র মানুষের রাজনৈতিক জীবনের আলোচনাই হইল এই শাস্ত্রের বিষয়বস্তু। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়বস্তু হইতে সংকীর্ণতর। নীতিবিগর্হিত কার্য করিলে কোন দৈহিক শাস্তি নাই। বিবেকদংশন অথবা লোকনিন্দা সহ্য করিতে হয়, কিন্তু বে-আইনী অথবা রাষ্ট্রবিরোধী কার্য করিলে দৈহিক শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। কতকগুলি নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ স্থিরীকৃত হয়, যেমন মিথ্যাভাষণ বা অকৃতজ্ঞতা সর্বসময়ে ও সর্বদেশে নীতিশাস্ত্রবিরোধী বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের নির্দেশগুলি, যেগুলিকে আইন বলা হয় সেগুলি রচিত হয় জনস্বার্থের ভিত্তিতে অর্থাৎ জনগণের সুবিধা ও অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া। যুদ্ধের সময় আকাশপথে শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত অনাচ্ছাদিত আলো রাখা বে-আইনী বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু অনাচ্ছাদিত আলো রাখা নীতিশাস্ত্রবিরোধী নয়।

উপরি-উক্ত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এ কথা বলিতে হইবে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিশাস্ত্র হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ করা যায় না। উদ্দেশ্যের দিক দিয়া

দেখিতে গেলে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। উভয় শাস্ত্রই মানুষকে আদর্শ মানব করিয়া গড়িয়া তুলিতে চায়। সমাজে মানুষের আদর্শ আচরণ কি হওয়া উচিত নীতিশাস্ত্র তাহারই নির্দেশ দেয়। কোন্‌টি ন্যায়, কোন্‌টি অন্যায়, কোন্‌টি গ্রহণীয়, কোন্‌টি বর্জনীয়, তাহা নীতিশাস্ত্রে আলোচিত হয়। এক কথায় নীতিশাস্ত্র মানুষের চিন্তাধারা ও কার্যে উহাদের বহিঃপ্রকাশের মানদণ্ড নির্ধারণ করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানও নাগরিক হিসাবে মানুষের কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিয়া দেয়। রাষ্ট্রপ্রণীত আইনগুলির বৈধতা নীতিশাস্ত্রের মানদণ্ডে স্থিরীকৃত হয়। যদি কোন আইনের প্রচলিত নীতিবাদের সহিত সংঘর্ষ হয়, তাহা হইলে সে আইন জনগণ মান্য করিতে চায় না। রাষ্ট্রের প্রধান কার্য হইল সু-নাগরিক সৃষ্টি করা। এই সু-নাগরিক সৃষ্টি করিতে হইলে জনগণের নৈতিক জীবনের মান উন্নয়ন করা একান্ত আবশ্যক। নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আইন প্রণয়ন করিয়া এবং নীতিবিগর্হিত আইন, প্রথা ও লোকাচার দূর করিয়া রাষ্ট্র জনগণের নৈতিক জীবনের মান উন্নয়ন করিতে সহায়তা করে। বস্তুত, নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নির্দেশের মধ্যে সব সময় সূক্ষ্ম পার্থক্য করা যায় না। বর্তমান জনমত অনুসারে যাহা নীতি-শাস্ত্রসম্মত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে রাষ্ট্রনির্দেশের মাধ্যমে পরবর্তী কালে তাহা নীতিশাস্ত্রবিরোধী বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এইরূপে রাষ্ট্রপ্রণীত আইনের দ্বারা জনমতের পরিবর্তন ঘটে ও মানুষের নৈতিক জ্ঞান ও নৈতিক আদর্শেরও পরিবর্তন হয়। এক শতাব্দী পূর্বে আমাদের ভারতবর্ষে সতীদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল ও তখন এই প্রথা নীতিশাস্ত্রবিরোধী বলিয়া বিবেচিত হইত না। এই প্রথাকে আইনের দ্বারা রহিত করা হয়। কালক্রমে জনগণের নৈতিক জ্ঞানের পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশ হইতে এই প্রথা সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। তাহার কারণ আমরা শুধু বে-আইনী বলিয়া যে এই প্রথা আর মানি না তাহা নয়। এই প্রথা একটি দুর্নীতি ও নীতিশাস্ত্র-বিরোধী, রাষ্ট্র আইনের দ্বারা এই নৈতিক জ্ঞান জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছে। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রথম ও প্রধান তাৎপর্য হইল ব্যক্তির ও সমষ্টির মঙ্গলসাধন। রাষ্ট্রের আদর্শ নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। সুতরাং নীতিশাস্ত্রকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ করা যায় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র পরস্পরের পরিপূরক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র

(The State)

রাষ্ট্রসংজ্ঞা –Definition of the State

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রতত্ত্ব ও রাষ্ট্রতথ্য আলোচিত হয়। সুতরাং প্রথমেই রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ইতালীর চিন্তাবীর ম্যাকিয়াভেলী 'রাষ্ট্র' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন। গ্রীক ও রোমকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বাস করিত। রাষ্ট্রের আয়তন নগরেই সীমাবদ্ধ থাকিত। গ্রীক ও রোমকগণ যথাক্রমে 'পোলিস্' ও 'সিভিটাস' এই দুইটি শব্দ দ্বারা রাষ্ট্রকে বুঝাইত। টিউটন যুগ হইতে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন রাষ্ট্রের 'রাষ্ট্র' নামকরণ হইল। টিউটনেরাই সর্বপ্রথম 'স্ট্যাটাস্' কথাটি ব্যবহার করিল। বর্তমান যুগে 'রাষ্ট্র' শব্দটি অনবধানতাবশতঃ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় 'রাষ্ট্র' শব্দটি জাতি, সরকার, সমাজ, দেশ প্রভৃতি শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় আবার রাষ্ট্র শব্দটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক সরকার বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়, যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বতন্ত্র অংশগুলিকে রাজ্য (State) বলা হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্র শব্দটিকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। অতীত যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন লেখকগণ রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। কয়েকটি সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই সমস্ত লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য রাজনীতির জন্মদাতা মহামতি অ্যারিস্টটল্ বলিয়াছেন যে, স্বাবলম্বী ও পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে যখন অনেকগুলি পরিবার ও গ্রাম একত্রিত হয়, তখনই তাহাকে রাষ্ট্র বলা হয়। স্বাবলম্বী ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বলিতে লেখক মানবচরিত্রের নৈতিক উৎকর্ষের উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। আর এই মানবজীবনের চরম নৈতিক উৎকর্ষ লাভ হয় রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে। সুতরাং

অ্যারিস্টটল্ ও অতীত যুগের অন্যান্য দার্শনিকের মতে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও উদ্দেশ্য নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

জার্মান পণ্ডিত ব্লুনৎস্লি ও সিডেল্ রাষ্ট্রের অনুরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। ব্লুনৎস্লির মতে, যখন একদল লোক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সংঘবদ্ধ হয়, তখনই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। সিডেল্ বলেন, যখন বহু সংখ্যক লোক পৃথিবীর কোনো নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ অধিকার করিয়া কোনো উচ্চতর শক্তির অধীনে সম্মিলিত হয়, তখনই রাষ্ট্রের সূত্রপাত হয়। উড্রো উইলসনের মতে, নির্দিষ্ট ভূ-ভাগের মধ্যে আইন ও শৃংখলার সহিত সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলা হয় ("A state is a people organised for law within a definite territory")।

অন্যান্য বহু লেখক তাঁহাদের নিজস্ব ভাষায় রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই সংজ্ঞাগুলির কোনোটি ত্রুটিবিহীন নহে। অনেকের মতে ডাঃ গার্ণার রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। তিনি বলিয়াছেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনতান্ত্রিক আইনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্র অল্প-বিস্তর বহুসংখ্যক জনসমষ্টি যাহারা স্থায়িভাবে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করে ও যাহারা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন অর্থাৎ বৈদেশিক শাসন-পাশ হইতে মুক্ত এবং যাহাদের একটি সুনিয়ন্ত্রিত শাসনপ্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সরকার আছে, যে শাসনপ্রতিষ্ঠানের নির্দেশ ঐ স্থানের অধিবাসীরা প্রতিনিয়ত পালন করিতে অভ্যস্ত।

("The state, as a concept of Political Science and Public law, is a community of persons more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so, of external control and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience.")

রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য Characteristics of the State

উপরি-উক্ত সংজ্ঞাগুলি বিশেষ করিয়া, ডাঃ গার্ণারের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রই চারিটি উপাদান লইয়া গঠিত;

যথা, জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ, শাসনপ্রতিষ্ঠান বা সরকার ও সার্বভৌম ক্ষমতা। জনসমষ্টি ও নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ হইল রাষ্ট্রের বাস্তব অস্তিত্বের ভিত্তি। শাসনপ্রতিষ্ঠান ও সার্বভৌমিকতা হইল রাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক ভিত্তি।

(ক) **জনসমষ্টি** Population

বহু জনসমষ্টি না হইলে রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জনসমষ্টির অবশ্য শ্রেণীবিভাগ করা যায়; যথা, পূর্ণ-নাগরিক, অসম্পূর্ণ-নাগরিক অর্থাৎ যাহাদের ভোটাধিকার জন্মে নাই, বিদেশী ও প্রজা। প্রজাগণের শুধু কর্তব্য পালনের দায়িত্ব থাকে, কিন্তু তাহাদের অধিকারের দাবী স্বীকৃত হয় না। বৃটিশ শাসনকালে ভারতীয়গণ প্রজাপদবাচ্য ছিল। রাষ্ট্রগঠনে একদল লোক প্রয়োজন, কিন্তু কত লোক লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইবে তাহার কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। প্রাচীনকালে গ্রীক ও রোমকগণ ক্ষুদ্রকায় নগররাষ্ট্রে বাস করিত, তাই অ্যারিস্টটল্ প্রভৃতি দার্শনিকেরা এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী লেখক রুশো পর্যন্ত রাষ্ট্রের জনসমষ্টির সংখ্যা নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। প্লেটো রাষ্ট্রের জনসমষ্টির সংখ্যা ৫,০০ -এ এবং অ্যারিস্টটল্ ১০,০০০-এ সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমান যুগে বৃহদায়তন রাষ্ট্রের আবির্ভাবের ফলে প্রাচীন মতবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্তমান যুগে মনাকো, স্যান্ম্যারিণো প্রভৃতি অল্পসংখ্যক জনসমষ্টি লইয়া গঠিত রাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া, মহাচীন ও ভারতের ন্যায় জনবহুল রাষ্ট্রও পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান যুগেও জনসংখ্যার দিক দিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। য়্যান্ডোরা রাষ্ট্রের জনসংখ্যা হইল মাত্র ৫,০০০, অপরপক্ষে চীনদেশের জনসংখ্যা হইল ৪২২ মিলিয়নেরও অধিক। কিন্তু এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক রাষ্ট্র এমন সংখ্যক জনসমষ্টি লইয়া গঠিত হইবে যাহার দ্বারা সরকারের সর্ববিধ কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে।

রাষ্ট্রগঠনে জনসংখ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থা ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে দেশে যথেষ্ট জনবল থাকা একান্ত প্রয়োজন।

রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসাবে জনসংখ্যার গুরুত্ব অন্য দিক দিয়াও বিবেচনা করা যাইতে পারে। যদি ভারত বা ইতালী প্রভৃতি রাষ্ট্রের

মত দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও যান্ত্রিক জ্ঞান অপেক্ষা জনসংখ্যা বেশী হয় তাহা হইলে সে দেশে উৎকট দারিদ্র্য ও আয়বৈষম্য অবশ্যম্ভাবী হয়। জন্ম নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন বৃদ্ধি অথবা অন্য দেশের নিকট হইতে বলপূর্বক অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য অতিরিক্ত ভূমি দখল করা ছাড়া সংখ্যাধিক্য সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রাকৃতিক সম্পদ ও যান্ত্রিক জ্ঞানের তুলনায় জনসংখ্যা কম। সুতরাং এই সমস্ত দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইতে পারে। আবার ফরাসী দেশে জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার ফলে সেদেশ ক্রমশই হীনবল হইয়া পড়িতেছে। একটি দেশের জনগণ যদি সমজাতীয়, সমভাষাভাষী ও সমধর্মী হয় তাহা হইলে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি পাইয়া ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উপরি-উক্ত সমতাগুলির অভাবে অনেক সময় জাতীয় ঐক্য দুর্বল হয়। কিন্তু মার্কিন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রদ্বয় ও সুইজারল্যাণ্ড বিভিন্ন জাতির লোক লইয়া গঠিত হইলেও এই দেশগুলিতে জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মগত বিভেদ সত্ত্বেও রাজনৈতিক ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(খ) নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ— Definite territory.

নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ বলিতে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা বুঝায়। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই আধিপত্য এবং কার্যকলাপ এই নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পরিচালিত হয়। তাই নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড ব্যতীত রাষ্ট্র গঠন করা যায় না। এই নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড বলিতে শুধু ভূমির উপরিভাগ বুঝায় না। ইহা এক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। রাষ্ট্রান্তর্গত ভূ-ভাগ, ভূগর্ভস্থ সমুদয় পদার্থ, আকাশপথ, নদনদী, গিরিপর্বত ও ১২ মাইল পর্যন্ত সমুদ্রোপকূল এই ভূ-খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন। কিন্তু রাষ্ট্রের এই নিজস্ব ভূ-খণ্ডের উপর একাধিপত্যের দুই-একটি বাধা আছে। বিদেশ হইতে আগত ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতের গৃহ স্বরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইলেও সে গৃহ পররাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া আইনতঃ পরিগণিত হয়। দিল্লীতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডের অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। বিদেশী যুদ্ধ জাহাজ পররাষ্ট্রের বন্দরে সাময়িক কালের জন্য অবস্থান করিলেও তাহার উপর বন্দর কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের কোনো কর্তৃত্ব থাকে না।

ভ্রাম্যমাণ যাযাবর জাতি রাষ্ট্রগঠন করিতে পারে না। যখন একদল লোক স্থায়িভাবে নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বসবাস আরম্ভ করে, তখনই তাহাদের

লইয়া রাষ্ট্রগঠনের সূত্রপাত হয়। কত লোক লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইবে ইহার যেমন নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা স্থির হয় নাই, সেইরূপ রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডের আয়তনের কোনো নির্দিষ্ট সীমা স্থিরীকৃত করা যায় না। বর্তমান যুগে যে সমুদয় সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে ভূ-খণ্ডের আয়তনের বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। তবে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় প্রকারের রাষ্ট্রেরই ভূখণ্ড থাকা চাই। এস্থলে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাষ্ট্রের প্রাধান্য ও মর্যাদা সব সময়েই এই ভূখণ্ডের আয়তনের উপর নির্ভর করে না। বৃটেন, জার্মানী, ফরাসী প্রভৃতি দেশ আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও জ্ঞান ও বিজ্ঞানে জগৎ-সভ্যতায় ইহাদের অবদান আদৌ উপেক্ষণীয় নহে। মনাকো বা স্যাম্ম্যারিণোর ন্যায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের বিপদ হইল যে, এ জাতীয় রাষ্ট্র কখনও সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে না। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে ইহারা পরনির্ভরশীল হয় এবং এই পরনির্ভরশীলতা অনেক সময় ইহাদের স্বাধীনতা হরণ করে। তবে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সুবিধা হইল যে, রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা স্বল্প হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ফলে জনগণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অধিবাসিগণ অধিকতর সুসংবদ্ধভাবে একতাবদ্ধ হইয়া তাহাদের মতামত প্রকাশ করিতে পারে এবং বৃহৎ রাষ্ট্রের অধিবাসিগণ অপেক্ষা অধিকতর সক্রিয়ভাবে তাহাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করিতে পারে। বৃহদায়তন রাষ্ট্রের কতকগুলি সুবিধা আছে। রাষ্ট্রের আয়তন বিস্তৃত হইলে সে রাষ্ট্রের পক্ষে আত্মরক্ষা করা সহজসাধ্য। এই কারণেই রুশ দেশ জয় করা অসম্ভব। ইহা ছাড়া, বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি ইহাদের নৈসর্গিক সম্পদের প্রাচুর্যের সাহায্যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করিয়া লোকের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রুশিয়া প্রভৃতি দেশ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু অতিকায় রাষ্ট্রগুলির প্রধান অসুবিধা হইল যে, আয়তনের ব্যাপকতার জন্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগসূত্র ক্ষীণ ও দুর্বল হয়। ফলে জাতীয় ঐক্য ব্যাহত হয়। শাসন-ব্যবস্থায়ও নানারূপ জটিলতা সৃষ্টি হয়। বর্তমান যুগে যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতি ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনপদ্ধতি প্রচলনের ফলে বৃহদায়তন রাষ্ট্রের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের উপর ইহার আত্মরক্ষা করিবার সামর্থ্য ও সার্বিক উন্নতি নির্ভর করে।

(গ) শাসনযন্ত্র বা সরকার—Government.

একদল লোক কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় বসবাস করিলেই তাহাকে রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া চলে না। নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী জনসমষ্টিকে সুসংবদ্ধ করিয়া একটি সুদৃঢ় ভিত্তিতে তাহাদের ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে। সুসংবদ্ধ জনসমষ্টির এই ঐক্যবদ্ধতা শাসনযন্ত্রের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। তাই যতদিন পর্যন্ত না তাহারা এক সুনিয়ন্ত্রিত শাসনযন্ত্র রচনা করিয়া ইহার কর্তৃত্বাধীনে আসে ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রের কোনো সূচনা হইতে পারে না। এই শাসনযন্ত্রই হইল রাষ্ট্রের কার্যকরী শক্তি, যে শক্তির সাহায্যে রাষ্ট্র ইহার ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দিতে পারে। শাসনযন্ত্রবিহীন বা শাসনযন্ত্রবিকল রাষ্ট্র নাবিকহীন পোতের মত বেশীদিন স্থায়ী হইতে পারে না। শাসনযন্ত্রই হইল রাষ্ট্রের নিয়ামক বা কর্ণধার। মানুষ যেমন তাহার বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, রাষ্ট্রও সেইরূপ পরিচালিত হয় শাসনযন্ত্রের দ্বারা। তাই শাসনযন্ত্রকে সাধারণ লোকে রাষ্ট্র বলিয়া ভুল করে। শাসনযন্ত্রের সাধারণতঃ তিনটি বিভাগ থাকে; যথা, আইনসভা, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ। এই তিন বিভাগে নিযুক্ত কর্মচারীসমষ্টিকে লইয়া রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র গঠিত।

সাধারণ লোকে রাষ্ট্র ও সরকারকে অভিন্ন বলিয়া মনে করে। কিন্তু রাষ্ট্র ও সরকার একার্থবোধক নহে পরন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সরকার রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য উপাদান। রাষ্ট্র এই শাসনযন্ত্র সাহায্যে ইহার অস্তিত্ব বজায় রাখে, রাষ্ট্র কর্তব্য পালন করে এবং এই শাসনযন্ত্রের মাধ্যমেই নীতি ও উদ্দেশ্য কার্যকর করা হয়। রাষ্ট্র একটি স্থায়ী সংগঠন কিন্তু শাসনযন্ত্রের সচরাচর পরিবর্তন ঘটিতে পারে এবং শাসনযন্ত্রের এই পরিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয় না। শাসনযন্ত্র বা সরকার আইনসভা, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের কর্মীসমূহকে লইয়া গঠিত। সুতরাং সংখ্যাল্পতা হইল শাসনযন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। অপরপক্ষে বিদেশী ব্যতীত রাষ্ট্রান্তর্গত সমগ্র জনসমষ্টি লইয়া রাষ্ট্র গঠিত। পরিশেষে বলা যায় যে রাষ্ট্র একটি মনঃকল্পিত ধারণা মাত্র—ইহার বাস্তব কোন অস্তিত্ব নাই। অপরপক্ষে শাসনযন্ত্রের একটি বাস্তব অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

(ঘ) সার্বভৌম ক্ষমতা—Sovereignty.

রাষ্ট্রগঠনের সর্বপ্রধান উপাদান হইল সার্বভৌম ক্ষমতা। এ ক্ষমতা রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ। জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও শাসনযন্ত্র থাকিলেও সার্বভৌম

ক্ষমতাবিহীন রাষ্ট্র প্রকৃত রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য রাষ্ট্রকে এই চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইতে হইবে। এই ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র রাষ্ট্রান্তর্গত সমগ্র জনসমষ্টির নিকট হইতে একক ও পূর্ণ আনুগত্য দাবী করিতে পারে। রাষ্ট্রের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নাই যাহার উপর রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতা পরিচালিত হইতে পারে না। রাষ্ট্র সমাজের একটি সংঘ, কিন্তু অবাধ ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্র সামাজিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির উপর প্রভুত্ব করে। রাষ্ট্রের ভিতর এমন কোনো শক্তি থাকিতে পারে না, যে শক্তি রাষ্ট্রের কোনো কার্যকে অবৈধ বা অযৌক্তিক বলিয়া অমান্য করিতে পারে। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতাকে আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা (Internal Sovereignty) বলা হয়। রাষ্ট্র যে শুধু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সর্বেসর্বা তাহাই নয়। এই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হয় না। নিজ ইচ্ছা অনুসারে প্রত্যেক রাষ্ট্রই ইহার কার্য পরিচালনা করিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার দুইটি দিক আছে। প্রথমটি হইল, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার পরিচালনা করিবার অবাধ ও চরম ক্ষমতা; অপরটি হইল, বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি (External Sovereignty)। যে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নাই, সে রাষ্ট্র স্বভাবতঃই বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। সুতরাং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অবাধ ও অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইতে হইলে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণপাশ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সুতরাং একদল লোক, কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সংঘবদ্ধ হইয়া স্বাধীনভাবে আইন-শৃংখলা বজায় রাখিবার জন্য সরকার গঠন করিলেই সেই দেশকে রাষ্ট্র বলা যায় না। উদাহরণে বলা যায় যে, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্টের পূর্বে ভারতকে রাষ্ট্র বলা যাইত না। কারণ বহুলোক বিরাট দেশে একটি শক্তিশালী সরকারের অধীনে বাস করিলেও ভারতীয়গণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিল না। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্টের পর ভারত স্বাধীনতা অর্জন করিয়া সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে। তাই ভারত আজ রাষ্ট্র মর্যাদার অধিকারী। পশ্চিমবঙ্গ একটি স্টেট অর্থাৎ রাজ্য, কিন্তু রাষ্ট্র নহে। কারণ জনসমষ্টি স্থায়িভাবে একটি সরকারের অধীনে বাস করিলেও পশ্চিমবঙ্গের সার্বভৌম ক্ষমতা নাই। ইহা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঞ্চল মাত্র।

রাষ্ট্রের যে অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত সার্বভৌমিকতার উল্লেখ করা হইল এই সার্বভৌমিকতা প্রয়োগ করিতে রাষ্ট্রের আইনতঃ কোন বাধা না থাকিলেও কার্যতঃ কোনো রাষ্ট্রই নির্বিচারে এই সার্বভৌমিকতা প্রয়োগ করিতে পারে না বা প্রয়োগ করে না। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জনমতের বিরুদ্ধে কোনো রাষ্ট্রই এমন কি স্বৈরাচারী রাষ্ট্র বা একনায়ক পরিচালিত রাষ্ট্র ইহার ইচ্ছা অবাধভাবে প্রয়োগে বিরত থাকে। অবাধ সার্বভৌমিকতা প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া ভয়াবহ। ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব (১৬৮৮) ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) ও রুশ বিপ্লব (১৯১৭) ইহার জলন্ত সাক্ষ্য।

পররাষ্ট্র সম্পর্কিত ব্যাপারেও বর্তমানে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা বহুলাংশে সংকুচিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক আইনের বাধা ও বিশেষ করিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সিদ্ধান্ত আজ কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। সুতরাং অসীম ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্র আজ সসীম রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে এবং অবাধ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সংকোচনই হইল জগতে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার একমাত্র উপায়।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি—Origin of the State.

কোন্ সময়ে বা কি পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা জানা যায় না। কোনো পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী যে রাষ্ট্রের গঠন কার্য হইয়াছে ইতিহাসও এরূপ সাক্ষ্য দেয় না। সুতরাং রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়।

তাই রাষ্ট্রের উৎপত্তি-সম্পর্কে নানা মতবাদ প্রচলিত আছে। এই মতবাদগুলির বিশেষ কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়াই এই মতবাদগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। এখন এই মতগুলির আলোচনা করিয়া ইহাদের সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা যাউক।

ঐশ্বরিক উৎপত্তি বা রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি-মতবাদ—Divine Origin of the State.

এই মতবাদটি অতি প্রাচীন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বহুদেশে এই মতবাদ প্রচলিত ছিল। এই মতবাদে বলা হয় যে, রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি এবং রাজা হইলেন স্বয়ং ভগবানের প্রতিনিধি। অনেক ক্ষেত্রে এই মতবাদকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে রাজাকে কোন দেবতার বংশোদ্ভব বলিয়া কল্পনা করা

হইত। আইন বলিতে রাজার ইচ্ছাকেই বুঝাইত। লোকের ধারণা ছিল ভগবানের ইচ্ছাই রাজার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইত।

এই মতবাদ অনুসারে একমাত্র রাজতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থাই হইল ঈশ্বরানুমোদিত শাসন-ব্যবস্থা। রাজার অবর্তমানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনের অধিকারী হইবে। রাজা শাসনকার্যের জন্য একমাত্র ভগবানের নিকট দায়ী ও প্রজাসাধারণের পবিত্র কর্তব্য হইল রাজ-আজ্ঞা নির্বিচারে পালন করা।

এই মতবাদটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, যুক্তি অপেক্ষা লোকের ধর্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়াই এই মতবাদটি গঠিত হয়। এই মতবাদ শাসকসম্প্রদায়কে যথেচ্ছাচারী করিয়া তুলে এবং জনসাধারণের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে। বর্তমান যুগে এই মতবাদ অবিশ্বাস্য হইলেও, যে যুগে এই মতবাদটি প্রচলিত ছিল. সে যুগে ইহার উপযোগিতা ছিল। রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি ও রাজা ভগবানের নির্বাচিত প্রতিনিধি—এই মতবাদ প্রচার করিয়া রাজনৈতিক চেতনাবিহীন প্রাচীন সমাজ অন্ধবিশ্বাসের মধ্য দিয়া জনসাধারণকে আইন-শৃংখলা মান্য করিতে শিক্ষা দেয়। আইন-শৃংখলা না মানিলে কোন রাষ্ট্র বা কোন সংগঠনই কাজ করিতে পারে না। ইহা ছাড়া এই মতবাদের সাহায্যে রাজশক্তি মধ্যযুগের শক্তিশালী ধর্মীয় সংগঠনের প্রভাব-মুক্ত হইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হয়। ইহার ফলে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Secular State) গঠনের সূত্রপাত হয়। পরিশেষে বলা যায় যে, এই মতবাদ রাষ্ট্রের নৈতিক উদ্দেশ্যের প্রতি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে। শাসকগণ যদি শাসন-ব্যাপারে নৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হন, তাহা হইলে শাসন-ব্যবস্থা উন্নততর হয়। আইনের কাছে দায়িত্ব ছাড়াও শাসকগণের একটা অতিরিক্ত নৈতিক দায়িত্ব আছে—এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে শাসক-শাসিত সম্পর্ক শান্তিপূর্ণ হয়।

পরিবারের ক্রম-সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি মতবাদ—The Patriarchal and Matriarchal Theories.

এই মতবাদে বলা হয় যে, পরিবার বড় হইয়াই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কতকগুলি পরিবার লইয়া গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়, কয়েকটি গোষ্ঠী লইয়া জাতি এবং অবশেষে কয়েকটি জাতি লইয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। পারিবারিক সংগঠনের ক্রমিক পরিণতির ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি—এই মতবাদের মূলকথা হইলেও

পরিবারের কর্তৃত্ব লইয়া লেখকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, প্রাচীন পরিবারগুলি ছিল পিতৃ-তান্ত্রিক অর্থাৎ পরিবারের কর্তা ছিলেন সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ, আবার কেহ বলেন যে, প্রাচীন পরিবারগুলি ছিল মাতৃ-তান্ত্রিক অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠা নারী ছিলেন পরিবারের সর্বময়ী কর্ত্রী।

এই মতের প্রধান সমর্থক হইলেন ইংরাজ লেখক স্যর হেন্‌রি মেন। কিন্তু তাঁহার বহু পূর্বে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌ল পরিবার হইতে যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে এই মতবাদ প্রচার করেন।

রাষ্ট্রগঠনের প্রথমদিকে পরিবারের মধ্যে বর্তমান রাষ্ট্রের অঙ্কুর নিহিত ছিল একথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও একমাত্র পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে, একথা মানিয়া লওয়া যায় না। রক্তসম্পর্ক হইল পারিবারিক ঐক্যের ভিত্তি। কিন্তু রাষ্ট্রের ঐক্য শুধুমাত্র রক্তসম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত, একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হয়।

বলপ্রয়োগ মতবাদ—The Theory of Force.

অনেকে বলেন রাষ্ট্র পশুবলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শক্তিশালী লোক বা শক্তিশালী জাতি দুর্বল লোক বা দুর্বল জাতিকে শারীরিক শক্তি দ্বারা জয় করিয়া নিজ কর্তৃত্বের অধীনে আনিয়া রাষ্ট্রগঠনের গোড়া পত্তন করে। প্রাচীন মানব-সমাজ নানা গোষ্ঠী, দল ও উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। গোষ্ঠীপতি বা দলপতি নিজের অনুচরদের সাহায্যে অন্যদলকে পরাস্ত করিয়া বিজিত দলের উপর আপন আধিপত্য স্থাপন করিত। এইরূপে যখন কোনো দলপতি তাহার অনুচরদের সাহায্যে যথেষ্ট আয়তনের কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাসনকার্য আরম্ভ করে, তখন রাষ্ট্রের সূত্রপাত হয়। সুতরাং যুদ্ধ রাষ্ট্রগঠনের একটি প্রধান উপায়।

'জোর যার মুল্লুক তার' ('Might is right.'), 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' ('None but the brave deserves the fair') প্রভৃতি প্রবাদ-বচনগুলি হইতে প্রমাণিত হয় যে, উৎপত্তির প্রথম পর্যায়ে রাষ্ট্র নিশ্চিতরূপে বলপ্রয়োগ-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই মতবাদে আরও বলা হয় যে, বলপ্রয়োগ দ্বারা রাষ্ট্র শুধু গঠিত হয় না। গঠিত রাষ্ট্র স্থায়ী করিতে হইলেও বলপ্রয়োগ আবশ্যক। আভ্যন্তরীণ শান্তি-

শৃংখলা রক্ষা ও বহিরাক্রমণ হইতে রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে হইলেও সব বিজেতাকেই পশুবলের উপর নির্ভর করিতে হয়।

এই মতবাদের প্রধান ত্রুটি হইল যে, বলপ্রয়োগ-নীতিকে রাষ্ট্র গঠনের একমাত্র উপাদান বলিয়া মনে করে। কিন্তু রাষ্ট্র কেবল শারীরিক শক্তির ভিত্তিতে গঠিত হইতে পারে না। শাসকের অধিকার শুধু পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কারণ যে অধিকার শুধু পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। বলের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অধিকারের অবসান ঘটে। ইতিহাসও এই সাক্ষ্য প্রদান করে। মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করাই যদি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত কোনো রাষ্ট্রই এই মহান উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না। ইহা ছাড়া, এই মতবাদ গণতন্ত্র-বিরোধী। এই মতবাদ কার্যকর হইলে স্বাধীনতা সাম্য, মৈত্রী প্রভৃতি গণতান্ত্রিক নীতিগুলি বিনষ্ট হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা লোপ পাইবে। একমাত্র যুদ্ধ দ্বারাই আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা হইবে।

এই মতবাদের অন্তর্নিহিত সত্য হইল যে, শান্তি-শৃংখলা রক্ষা ও বিদেশী শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য পশুবলের প্রয়োজন। কিন্তু সকলের রক্ষক ও পালক হিসাবে রাষ্ট্র শুধু শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমনের জন্য এই পশুবল প্রয়োগ করিবে এবং এই বলপ্রয়োগ জনগণ দ্বারা সমর্থিত হইবে। বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এই সত্য মানিয়া লইতে হইবে যে, জনসাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থাই স্থায়ী হইতে পারে না। সুতরাং পশুবল রাষ্ট্রের ভিত্তি নহে। জনগণের ইচ্ছাই হইল রাষ্ট্রের প্রধান ভিত্তি। ("Will, not force, is the basis of the State".)

সামাজিক চুক্তি মতবাদ—The Social Contract Theory.

এই মতবাদে বলা হয় যে, মানুষ ইচ্ছা করিয়া রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছে। মানুষ পূর্বে রাষ্ট্রের বাহিরে ছিল। রাষ্ট্রের অবর্তমানে মানুষের জীবনযাত্রার যে অসুবিধা হইত, তাহা দূর করিবার জন্য সকলে মিলিয়া একটা চুক্তি করে এবং এই চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

এই মতবাদটি অতি প্রাচীন। ভারতীয় দার্শনিক কৌটিল্য ও গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর লেখার মধ্যে চুক্তির উল্লেখ দেখা যায়। পরবর্তী কালে

আরও কয়েকজন লেখক চুক্তিবিষয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু রাষ্ট্রগঠনে চুক্তির কার্যকারিতা সম্পর্কে ইংরাজ লেখক হব্‌স্‌ ও লক্‌ এবং ফরাসী লেখক রুশো সবিস্তারে আলোচনা করেন। সুতরাং সমাজিক চুক্তি মতবাদ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে হইলে, এই তিনজন লেখকের মত সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক।

হব্‌স্‌ঃ হব্‌স্‌ বলেন যে, রাষ্ট্রসৃষ্টির পূর্বে মানুষ এক বন্য পরিবেশে বাস করিত। এই অবস্থায় মানুষের তৈয়ারী কোন আইন ছিল না। যে যার খুসীমত বাস করিত। গায়ের জোরেই প্রত্যেকে তাহার অধিকার রক্ষা করিত। কাজেই এই অবস্থায় দুর্বলের কোন অধিকার ছিল না। নিজ স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য পরস্পরের সহিত কলহ-বিবাদ করিয়াই মানুষ বাঁচিয়া থাকিত। এই অবস্থাকে হব্‌স্‌ প্রকৃতির রাজত্ব (State of Nature) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতির রাজত্বের এই অরাজকতা এবং জীবন, ধন ও মানের অনিশ্চয়তা হইতে পরিত্রাণ পাইবার উদ্দেশ্যে মানুষ অবশেষে নিজেদের মধ্যে একটি পারস্পরিক চুক্তি করিল। চুক্তির দ্বারা মানুষ প্রকৃতির রাজত্বে যে অবাধ ক্ষমতার অধিকারী ছিল তাহা নিঃশেষে, বিনা শর্তে ও পুনঃপ্রাপ্তির দাবী না রাখিয়া এক ব্যক্তি বা একটি সংসদের হস্তে ন্যস্ত করিল। এই ব্যক্তি হইলেন রাজা। সুতরাং হব্‌সের মতে জনগণ নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তি করিয়া একজনকে রাজা করিল এবং তাঁহার হস্তে বিনা শর্তে সমুদয় ক্ষমতা অর্পণ করিল। কাজেই যিনি রাজা হইলেন তিনি এই চুক্তির কোনো পক্ষ নহেন এবং চুক্তির শর্ত দ্বারা বাধ্য নহেন। তিনি তাঁহার খুসীমত শাসন করিবেন এবং এজন্য কাহারও নিকট তাঁহার কোন দায়িত্ব থাকিবে না। এইরূপে হব্‌স্‌ তাঁহার মতবাদ সাহায্যে রাজাকে অবাধ ক্ষমতার অধিকারী করিলেন। ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইল।

লক্‌ঃ

হব্‌সের মত লক্‌ও বলেন যে, রাষ্ট্রের জন্মের পূর্বে মানুষ এক প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করিত। এই প্রাকৃতিক পরিবেশ হব্‌স্‌ বর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবেশের মত অসহনীয় ছিল না। এখানে মানুষ মোটামুটি শান্তিতে ও স্বাধীনভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে জীবন পরিচালনা করিত। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ ও বলবৎ

করিবার মত কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছিল না। এই অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে মানুষ নিজেদের মধ্যে একটা পারস্পরিক চুক্তি করিয়া রাষ্ট্র গঠন করিল। রাষ্ট্র গঠিত হইলে তাহারা দ্বিতীয় আর একটি চুক্তি করিয়া একজনকে রাজা করিল। এই দ্বিতীয় চুক্তি তাহারা রাজার সহিত করিল। চুক্তির শর্ত হইল যে, রাজা যতদিন পর্যন্ত তাহাদের জীবন, ধন ও মান রক্ষা করিতে পারিবেন, ততদিন প্রজাগণ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবে ও তাঁহার আদেশ পালন করিবে। রাজা যদি চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেন, তাহা হইলে প্রজাগণও তাঁহাকে মান্য করিবার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হব্‌স্ শুধু একটি একপক্ষীয়-চুক্তি দ্বারা অবাধ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন, লক্ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি দ্বারা সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করেন।

রুশো :

ফরাসী লেখক রুশোও প্রকৃতির রাজত্ব হইতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করেন। রাষ্ট্রের জন্মের পূর্বে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করিত। কিন্তু রুশোর মতে এই প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল মর্ত্যের স্বর্গ। এখানে সব মানুষই ছিল স্বাধীন ও সমান। কিন্তু কালক্রমে জনসংখ্যা ও সভ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মানুষের জীবন কৃত্রিম ও জটিল হইয়া উঠিল। এই জটিল জীবনযাত্রা পরিচালনা করিবার জন্য তাহাদের নানাবিধ সঙ্ঘ গঠন করিতে হইল। অবশেষে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আবিষ্কারের ফলে কেহ প্রভু ও কেহ দাস হইল। এইরূপে মানুষ প্রকৃতির রাজত্বের সরল ও সহজ জীবনযাত্রাপথ হইতে ক্রমে ক্রমে যখন তথাকথিত সভ্যতার উচ্চস্তরে পৌঁছিল, তখন তাহাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদ-জ্ঞান জন্মিল। ইহার ফলে তাহাদের আদিম স্বাধীনতা ও সাম্যভাব দূর হইয়া তাহারা হবস্-বর্ণিত এক অসহনীয় পরিবেশে উপনীত হইল। এই অসহনীয় পরিবেশ হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে তাহারা নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তি করিয়া কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা কোন সংসদের হাতে তাহাদের ক্ষমতা হস্তান্তর না করিয়া সমগ্র সমাজের হাতে অর্থাৎ তাহাদের সাধারণ ইচ্ছার (General will)—হাতে ক্ষমতা সমর্পণ করিল। রুশোর মতে চুক্তি দ্বারা গঠিত এই সাধারণ ইচ্ছাই হইল সমাজের সর্বশক্তির অধিকারী। রুশোর এই সাধারণ ইচ্ছা হইল সমষ্টিগত ইচ্ছা। একমাত্র সমষ্টিই এই ইচ্ছা

প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করিতে পারে। রাষ্ট্রের মধ্যে সমষ্টির এই ইচ্ছা হইল চূড়ান্ত ও নির্ভুল। এই চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত ইচ্ছার উদ্দেশ্য হইল সমষ্টির মঙ্গল সাধন করা। যদি ব্যক্তিগত ইচ্ছার সহিত সাধারণের বা সমষ্টিগত ইচ্ছার বিরোধ হয়, তাহা হইলে সাধারণের ইচ্ছাই বলবৎ হইবে। রুশোর মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে ব্যক্তি যে ক্ষমতার অধিকারী ছিল, তাহা চুক্তি দ্বারা সাধারণ ইচ্ছায় সমর্পণ করিলেও ব্যক্তি-স্বাধীনতা বা সাম্য নষ্ট হইল না। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তিই ব্যক্তিগতভাবে যাহা সমষ্টিতে সমর্পণ করিয়াছিল, চুক্তি দ্বারা গঠিত রাষ্ট্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই আবার তাহা ফিরিয়া পাইল। রুশোর মতে সরকারের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নাই। সরকার সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং সাধারণ ইচ্ছার অধীন শাসনযন্ত্র মাত্র।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই তিনজন লেখকই চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করিলেও তাঁহাদের মতবাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল। প্রকৃতির রাজত্বের বিশেষত্ব, চুক্তির প্রকৃতি, পক্ষ ও বিষয়বস্তু এবং রাজা ও প্রজার সম্পর্ক এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে তিনজন লেখকই ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনজন লেখক একই মতবাদের সাহায্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিলেও তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন।

হব্‌স্ তাঁহার মতবাদ দ্বারা গণশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া রাজশক্তির উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। ফলে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। লক্ রাজ-শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া গণশক্তির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ফলে, শাসন-ব্যবস্থা দুর্বল ও অস্থায়ী হয় এবং জনসাধারণের খামখেয়ালের দ্বারা পরিচালিত হয়। রুশো তাঁহার মতবাদ দ্বারা স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়া লোকায়ত্ত সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

সমালোচনা Criticism.

এই মতবাদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত বহু সমালোচনা হইয়াছে। প্রধানতঃ বলা যায় যে, এই মতবাদের পিছনে কোন ঐতিহাসিক সত্য নাই। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন রাষ্ট্রই চুক্তির দ্বারা গঠিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের যে অধিকারের কথা বলা হয় তাহা যুক্তিসম্মত নহে। কারণ প্রাকৃতিক

পরিবেশে মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করিবার মত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছিল না। যেখানে অধিকারগুলি বলবৎ করিবার কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ নাই, সেখানে অধিকার থাকিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, যে সমস্ত রাজনৈতিক চেতনা-বিহীন মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বাস করিত, তাহারা যে রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হইয়া রাষ্ট্র গঠন করিল ইহা সম্পূর্ণ ভুল। চতুর্থতঃ, সভ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মানুষ চুক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারিয়া তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক চুক্তি দ্বারা স্থির করে। প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের মধ্যে এই চুক্তির ধারণা থাকা অসম্ভব। চুক্তি সামাজিক অগ্রগতির নিদর্শন, ইহার প্রারম্ভের নিদর্শন হইতে পারে না। পঞ্চমতঃ, এই মতবাদে জনমতকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। জনমত যে সব সময়ে নির্ভুল সিদ্ধান্ত করে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অনেক সময় দেখা যায় যে, যুক্তিহীন উত্তেজনার দ্বারা পরিচালিত হইয়া জনমত অত্যাচারী শাসক অপেক্ষাও দেশের ও দশের অনেক অনিষ্ট সাধন করে। সুতরাং এদিক দিয়া এই মতটি বিপর্জ্জনক।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে এই মতবাদটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভব না হইলেও এই মতবাদটির উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্র মানবীয় প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের সম্মতি ও সহযোগিতার ভিত্তির উপর স্থাপিত—এই সত্যটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া এই মতবাদটি আধুনিক গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করে। কোন রাজশক্তি যে ঐশ্বরিক বিধান বা পশুবলের উপর স্থায়ী হইতে পারে না, এই মতবাদ তাহাই প্রচার করিল। মানুষের ব্যক্তিত্বের উপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করিয়া এই মতবাদ ব্যক্তিকে তাহার অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে শিক্ষা দিয়াছে। বল প্রয়োগ নীতির অবসান ঘটাইয়া শাসক-শাসিতের সম্পর্ক স্থির করিয়া এই মতবাদটি লোকায়ত্ত শাসন প্রবর্তন করিতে সাহায্য করিয়াছে।

ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ—Historical or Evolutionary Theory

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে বা কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী রাষ্ট্র গঠিত হয় নাই। কোন একটি বিশেষ উপাদান দ্বারাও রাষ্ট্র গঠিত হয় নাই। রাষ্ট্র মানব-সমাজের ক্রম-অগ্রগতির ফল। আদিম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান

যুগ পর্যন্ত এক বিরামবিহীন পরিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র ধীরে ধীরে ইহার বর্তমান রূপ পাইয়াছে। উৎপত্তির প্রথম যুগে রাষ্ট্র অতি সরল ও সাধারণ সংগঠন ছিল, কিন্তু তারপর সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে ক্রমশই জটিলতর হইতে লাগিল।

প্রথমতঃ, মানুষ সামাজিক জীব, তাই দলবদ্ধভাবে বাস করিতে চায়। মানুষের এই সমষ্টিগতভাবে বাস করিবার স্বভাবের মধ্যে রাষ্ট্রগঠনের বীজ উপ্ত আছে। রাষ্ট্রগঠনের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে পরিবারের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে এবং রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত ক্ষুদ্র পরিবার হইতে গোষ্ঠী ও গোষ্ঠী হইতে বৃহত্তর ও জটিলতর জাতির উদ্ভব হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন কালে ধর্মের বন্ধনও রাষ্ট্রগঠনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। প্রাচীন কালের রাজারা ধর্মগুরু বলিয়াও পরিচিত ছিলেন। মানুষের রাজনৈতিক চেতনা জন্মিবার পূর্বে ধর্মই মানুষের মনে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব জাগরিত করিয়া মানুষকে রাষ্ট্রের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করিতে শিক্ষা দিয়াছিল।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রগঠনের কোনো এক সময়ে পশুবলের কার্যকারিতার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা-রক্ষা ও বহিরাক্রমণের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সমাজেই একজন দলপতির অধীনে যুদ্ধের ব্যবস্থা করিতে হইত। এইরূপে সামরিক প্রয়োজনে মানুষ নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে ক্রমশঃ ঐক্যবদ্ধ হইয়া সুশৃংখল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল।

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রের উৎপত্তির ইতিহাসে 'শাসিতের ইচ্ছা ও সহযোগিতা' বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। রাষ্ট্র যে জনগণের সম্মতি ও সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে, [illegible]র চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এই মত প্রচার করিয়া জনসাধারণকে তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই রাজনৈতিক চেতনা জনসমাজে ক্রমশঃ সঞ্চারিত হওয়ার ফলে শক্তির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র জনমতের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

ইহা ছাড়াও আরও অনেকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে রাষ্ট্রের পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। জনসমাজে জাতীয়তাবোধ যতই

শক্তিশালী হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতার দাবী স্বীকৃত হইয়া বিশাল সাম্রাজ্যের স্থলে ছোট ছোট জাতীয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইল। বর্তমান যুগে যোগাযোগ-ব্যবস্থার আশাতীত উন্নতি হওয়ার ফলে বিভিন্ন দেশের জনসমাজের মধ্যে নানাজাতীয় সহযোগিতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, জগতের সকল জাতিই আজ রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করিয়া এক বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আর এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক রাষ্ট্রই আজ তার সার্বভৌম শক্তি অন্ততঃ আংশিকভাবে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। আধুনিক কালে অর্থনৈতিক কারণেও রাষ্ট্রগুলির পরিবর্তন ঘটিতেছে। সকলকে সমান সুবিধা দান করিবার জন্য পূর্বের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্র আজ সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, রাষ্ট্র একদিনে বা একটি উপাদানে গঠিত হয় নাই। মানুষের মনে রাষ্ট্রের ধারণা জন্মিতে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়াছে। পরিবারের মতন সরল প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া গঠিত হইলেও পরবর্তী কালে মানুষের রাজনৈতিক চেতনা-বিকাশের ফলে রাষ্ট্র বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

রাষ্ট্র-উৎপত্তি সম্পর্কে ডঃ গার্ণার ও বার্জেস্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য।

"The state is neither the handiwork of God, nor the result of superior physical force, nor the creation of resolution or convention, nor a mere expansion of the family". Garner)

এখন জিজ্ঞাস্য হইল যে, রাষ্ট্র যদি ঈশ্বর, পশুবল, চুক্তি বা পরিবার সম্প্রসারণ দ্বারা সৃষ্টি না হয় তাহা হইলে ইহার উৎপত্তির উৎস কোথায়? বার্জেস্ এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়াছেন:

"The state is a continuous development of human society out of grossly imperfect beginning through crude but improving forms of manifestations towards a perfect and universal organisation of mankind." (Burgess)

রাষ্ট্র হইল মানব সমাজের বিভিন্ন বিকাশের মধ্য দিয়া দীর্ঘদিনব্যাপী বিবর্তনের ক্রমোন্নত ফল। মানব-জীবনে বর্তমান রাষ্ট্রের প্রভাব যে সুদূর-

প্রসারী তাহা নয়, মানুষ আজ রাষ্ট্রকে সমাজ-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া মনে করে।

সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য—Characteristics of Sovereignty.

সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান অপরিহার্য উপাদান। সার্বভৌমিকতা ব্যতীত কোন সংগঠনই রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। রাষ্ট্রের এই আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র সম্পর্কিত অসীম ক্ষমতা হইল ইহার নিজস্ব ক্ষমতা—কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা নহে। এই ক্ষমতা রাষ্ট্রের আদিম (Original) ক্ষমতা। এই ক্ষমতা ব্যতীত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না এবং রাষ্ট্র ছাড়া সার্বভৌমিকতা থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের স্বৈর (Absolute) ক্ষমতা। এই ক্ষমতা কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন হইতে পারে না। এই স্বৈর ক্ষমতার বলে আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র সম্পর্কিত ব্যাপারে রাষ্ট্র অন্য নিরপেক্ষ-ভাবে আপন ইচ্ছা বলবৎ করিতে পারে। এই স্বৈর ক্ষমতার অবর্তমানে কোন রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, এই ক্ষমতা অসীম (Unlimited)। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ন্ত্রণে ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে অবাধভাবে প্রযোজ্য।

চতুর্থতঃ, এ ক্ষমতা অবিভাজ্য (Indivisible)। সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এবং একমাত্র রাষ্ট্রই হইল ইহার অধিকারী। এই ক্ষমতা বণ্টনযোগ্য নহে। বণ্টিত হইলেই এই ক্ষমতার বিনাশ হয়, ফলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়, কারণ আংশিকভাবে সার্বভৌম কোন সংগঠনকেই রাষ্ট্র বলা যায় না। সুতরাং একাধিক প্রতিষ্ঠান একযোগে আংশিকভাবে এই ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারে না। সমাজ-ব্যবস্থার ঐক্য বজায় রাখিবার নিমিত্তই সার্বভৌমিকতার এই অবিভাজ্যতা অপরিহার্য। একই সমাজে একাধিক প্রতিষ্ঠান এই ক্ষমতার অধিকারী হইলে সমাজ-ব্যবস্থায় কোন কিছুরই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে না। ফলে সমাজ-ব্যবস্থা দুর্বল হয়। তাই সমাজ-ব্যবস্থার ঐক্য ও সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে সার্বভৌমিকতার অবিভাজ্যতা প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের এই সার্বভৌম ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এ ধারণা সত্য নহে। যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায়

সরকারের ক্ষমতাবলী কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়—সার্বভোম ক্ষমতা ভাগ করা হয় না এবং সার্বভৌম শক্তি নিজে এই ক্ষমতা ভাগ করিয়া দেয়।

পঞ্চমতঃ, এই ক্ষমতা স্থায়ী (Permanent)। রাষ্ট্র ব্যতীত এই ক্ষমতার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, আবার এই ক্ষমতা বতীত রাষ্ট্র থাকিতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সহিত এই ক্ষমতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শাসন-যন্ত্রের পরিবর্তনে এই ক্ষমতার অস্তিত্বের কোন হানি হয় না।

ষষ্ঠতঃ, এই ক্ষমতা হস্তান্তরযোগ্য নহে (Inalienable)। কোন মানুষ যেমন নিজের জীবন অপরকে দান করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, তদ্রূপ সার্বভৌমিকতা অপর রাষ্ট্রকে দান করিয়া কোন রাষ্ট্রও বাঁচিতে পারে না। সার্বভৌমিকতা অবসানের ফলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। কিন্তু রাষ্ট্র নিজে ইহার ভূ-খণ্ডের কোন অংশ অন্য রাষ্ট্রকে হস্তান্তর করিতে পারে। এই হস্তান্তরের ফলে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার কোন হানি হয় না।

সপ্তমতঃ, রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা আইনানুমোদিত স্বত্ববিশিষ্ট (Imprescriptible)—দীর্ঘকাল ভোগ-দখল-বিশিষ্ট রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা সাময়িক অপপ্রয়োগ বা অপব্যবহারের কারণে বিনষ্ট হইতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে পোল্যাণ্ড রাষ্ট্র জার্মানী কর্তৃক বিজিত হয় এবং সাময়িক কালের জন্য এই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা জার্মানী কর্তৃক পরিচালিত হয়। ফলে পোল রাষ্ট্র সার্বভৌমতাচ্যুত হয়। কিন্তু জার্মানীর পরাজয়ের পর পোল রাষ্ট্র পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। সুতরাং সাময়িক কালের জন্য অপব্যবহারের ফলে পোল রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বিনষ্ট হয় নাই।

তৃতীয় অধ্যায়

জাতি

(The Nation)

স্বজাতীয় মানুষ, জাতীয় জনসমাজ, জাতি ও জাতীয়তাবাদ—
People, Nationality, Nation and Nationalism.

স্বজাতীয় মানুষ বলিতে বুঝা যায়, একই ঐতিহ্য দ্বারা পরিপুষ্ট একদল লোক যাহারা একই নির্দিষ্ট ভূ-ভাগে বাস না করিতেও পারে অথবা এক ভাষাভাষী নাও হইতে পারে। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও ইহুদি জাতির কোন নির্দিষ্ট মাতৃভূমি ছিল না। তাহারা বিভিন্ন দেশে বাস করিত ও সেইজন্য তাহাদের ভাষাগত কোন ঐক্য ছিল না। কিন্তু বিভিন্ন দেশের নাগরিক হইলেও সমষ্টিগতভাবে এক অতি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী বলিয়া ইহুদি জাতির মধ্যে এক গভীর ঐক্যবোধ আছে। সমগ্র ইহুদি জাতি এই ঐক্যবোধ দ্বারা আজ পর্যন্ত অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেদের সকলকেই স্বজাতীয় মানুষ বলিয়া মনে করে।

জাতীয় জনসমাজ গঠিত হয় তখনই, যখন স্বজাতীয় একদল লোক আরও গভীরতর ঐক্যবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেদের অন্য জনসমাজ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনে করে। জাতীয় জনসমাজের মধ্যে ভাষাগত, বংশগত, ধর্মগত বা কৃষ্টিগত ঐক্য বিদ্যমান থাকে। রক্তের, ভাষার, ধর্মের বা কৃষ্টির অভিন্নতা এই একতাবোধকে শক্তিশালী করিয়া জাতীয় জনসমাজের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা উন্মেষের সহায়তা করে।

জাতীয় জনসমাজ যখন রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ আত্মসচেতন হয় ও নিজেদের বহিঃশাসন হইতে মুক্ত করিয়া এক স্বাধীন রাষ্ট্রের মাধ্যমে তাহাদের নিজস্ব জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার প্রয়াস পায়, তখন জাতীয় জনসমাজ জাতিতে রূপান্তরিত হয়।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যে, রাজনৈতিক চেতনার ক্রমবিকাশের ফলে স্বজাতীয় মানুষ জাতীয় জনসমাজ বলিয়া পরিচিত হয় এবং স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের ফলে জাতীয় জনসমাজ জাতিতে পরিণত হয়।

জাতীয় জনসমাজ বা জাতিগঠনের উপাদান—Elements of Nationality.

জাতীয় জনসমাজ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইলে জাতিতে পরিণত হয়। সুতরাং যে উপাদানগুলি জাতীয় জনসমাজ-গঠনে সহায়তা করে, সেইগুলিই জাতিগঠনেরও সহায়ক। একমাত্র রাজনৈতিক চেতনার অবস্থিতি বা অভাবের উপর ইহাদের পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত। জাতিগঠনের উপাদানগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—বাহ্যিক উপাদান ও ভাবগত উপাদান। এই উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করিলে জাতিগঠনে ইহাদের প্রত্যেকটির কার্যকারিতা উপলব্ধি করা যায়।

কুলগত ঐক্য—Racial Unity.

অনেকে মনে করেন জাতিগঠনে কুলগত ঐক্য অপরিহার্য। যখন জাতীয় জনসমাজের সমস্ত মানুষ নিজেদের একই বংশোদ্ভব বলিয়া মনে করে তখনই জাতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ কথা সব সময় সত্য নয়। উদ্ভবের দিক দিয়া দেখিতে গেলে জার্মান ও ইংরেজ একই টিউটন বংশোদ্ভব, কিন্তু জাতি হিসাবে ইহারা দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। অপর পক্ষে, ইংরাজ ও স্কচ্ এক বংশোদ্ভব না হইলেও এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডে তিনটি সম্পূর্ণ পৃথক বংশোদ্ভব মানুষ—জার্মান, ইতালীয় ও ফরাসী একজাতি বলিয়া পরিচিত। সুতরাং অভিন্ন কুল জাতিগঠনের একমাত্র উপাদান বা অপরিহার্য বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। ইহা ছাড়া, ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে যুগযুগান্তর ধরিয়া যে রক্তের সংমিশ্রণ চলিয়াছে, তাহার ফলে কোন জাতিই আজ আর অবিমিশ্র জাতি বলিয়া দাবী করিতে পারেন না। কিন্তু এককুলোদ্ভব হইলে জাতীয় ঐক্য দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হয় একথা অস্বীকার করা যায় না।

ভাষাগত ঐক্য—Sameness of Language.

কুলগত ঐক্য যেরূপ জাতিগঠনে অপরিহার্য নয়, ভাষাগত ঐক্যও সেরূপ অপরিহার্য নয়। সুইজারল্যাণ্ডে তিনটি বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক বাস করে, কিন্তু তাহাদের ভাষাগত বিভেদ জাতিগঠনের অন্তরায় হয় নাই। পরন্তু এই ভাষার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাহারা এক আদর্শ জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া একই রাষ্ট্রে একজাতি হিসাবে বসবাস করিতেছে। ভাষা ভাবের আদান-প্রদানে সহায়তা করিয়া ঐক্যবোধ বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। সুতরাং ভাষাগত ঐক্য জাতিগঠনে সাহায্য করে একথা সত্য হইলেও ভাষাগত ঐক্যের অভাবে যে জাতি সৃষ্টি হইতে পারে না, একথা বলা যায় না।

ধর্মগত ঐক্য—Religious Unity.

মধ্যযুগে ধর্মগত ঐক্য জাতিগঠনের একটি প্রধান উপাদান বলিয়া বিবেচিত হইলেও বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহে ইহার প্রভাব অনেক হ্রাস পাইয়াছে। একমাত্র মধ্য-প্রাচ্যের মুসলমান রাষ্ট্রগুলি ব্যতীত অন্য কোথাও ধর্মের ভিত্তিতে জাতি গঠিত হয় নাই। ধর্মগত ঐক্যের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পাকিস্তানের সৃষ্টি করিয়াছে। ইয়ুরোপে অনেক জাতি আছে যাহাদের মধ্যে ধর্মগত অনৈক্য জাতিগঠনের অন্তরায় হয় নাই। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, ইহুদি প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং বর্তমান যুগে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব জাতিগঠনের উপাদান বলিয়া গণ্য হয় না।

ভৌগোলিক ঐক্য—Geographical Unity.

কতকগুলি লোক এক ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট ভূ-ভাগে বাস করিলে তাহারা একজাতিতে পরিণত হয়। ভৌগোলিক ঐক্য জাতিগঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলিয়া ধরিয়া লইলেও ইহাকে অপরিহার্য বলা চলে না। বহুদিনব্যাপী এক ভৌগোলিক ঐক্যের মধ্যে বসবাস করিয়াও ভারতের অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমান একজাতিতে পরিণত হয় নাই। আবার, বিভিন্ন ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বাস করিয়াও ইহুদি জাতি তাহাদের একজাতিত্ব হারায় নাই।

ভাবগত ঐক্য – Spiritual unity.

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক যে, জাতিগঠনে বাহ্যিক উপাদানগুলি সব সময় বিশেষ কার্যকর হয় না। এগুলির অবিদ্যমানেও জাতির উদ্ভব সম্ভব। জাতীয় জনসমাজ বা জাতিগঠন প্রধানতঃ নির্ভর করে জাতির এক বিশেষ মনোভাবের উপর। যখন জাতীয় জনসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার মূলগত ঐক্যে একান্ত আস্থাবান্ হইয়া একজাতিত্ব ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, তখনই কুলগত, ভাষাগত বা ধর্মগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাহারা একজাতিতে পরিণত হয়। এখন প্রশ্ন হইল, এই ভাবগত ঐক্য কি?

ভাবগত ঐক্য একটা মানসিক অনুভূতির ব্যাপার। এই অনুভূতি বাহ্যিক ঐক্য অপেক্ষা মানসিক ঐক্যের উপর বেশী নির্ভর করে। একদল লোকের মধ্যে কুলগত বা ভাষাগত বা আরও অনেক প্রকার সামাজিক বিভিন্নতা থাকিতে পারে, কিন্তু অতীতে যদি একই ইতিহাসের ঘটনাবলীর পথে তাহাদের জীবন গঠিত হইয়া থাকে, যদি তাহারা একই ঐতিহ্য বা সভ্যতার অধিকারী বা একই সুখ-দুঃখের অংশ-গ্রহণকারী হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতে একই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শে উপনীত হইবার জন্য তাহারা দলবদ্ধ হয়, তাহা হইলে এইরূপ মনোভাব-সম্পন্ন একদল লোক নিজেদের অন্যান্য সকল দল হইতে পৃথক বলিয়া মনে করে। অতীতের এই সম-সুখদুঃখভোগের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আদর্শ এই জনসমষ্টির মধ্যে ঐক্যবোধ জাগরিত করিয়া সকলকে একতার সূত্রে গ্রথিত করে। সময়ের অগ্রগতির ফলে এই ভাবগত ঐক্যের বন্ধন তাহাদের মধ্যে দৃঢ়তর হয় ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলিকে সম-সুখদুঃখ ও সম-স্বার্থের ভিত্তিতে একত্রিত করিয়া এক-জাতিতে পরিণত করে। সুইস্ জাতির অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

বাহ্যিক ও ভাবগত ঐক্যের ফলে যখন একদল লোক নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য জনসমাজ হইতে নিজেদের পৃথক মনে করে, তখনই তাহাদের জাতীয় ভাবের উদয় হয়। এই জাতীয় ভাব বা সাজাত্য-বোধ (Nationalism) জাতিগঠনের চরম পরিণতি। সাজাত্যবোধ দুইটি পরস্পর-বিরোধী মনোভাবের উপর গড়িয়া উঠে। একটির দ্বারা সম-সুখদুঃখ-ভোগী ও সম-আদর্শে অনুপ্রাণিত একদল লোক পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া

ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়। অপরটি অসম-সুখদুঃখভোগী ও অসম-আদর্শে অনুপ্রাণিত জনসমষ্টিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিভেদের সৃষ্টি করে ও বিভিন্ন জাতিতে পরিণত করে।

জাতি ও রাষ্ট্র—Nation and State.

নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলার সহিত সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলা হয়। জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ, শাসন-ব্যবস্থা ও সর্বোপরি সার্বভৌমিকতা—এই চারিটি হইল রাষ্ট্র অস্তিত্বের লক্ষণ। কিন্তু জাতির সংজ্ঞা রাষ্ট্রের সংজ্ঞা হইতে শুধু পৃথক্ নয়, গভীরতর বটে। জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে রাষ্ট্রভুক্ত জনসমষ্টির মধ্যে একাত্মবোধ থাকা অপরিহার্য। রাষ্ট্র ও জাতি একার্থবোধক হয় তখন, যখন রাষ্ট্রভুক্ত সমগ্র জনসমষ্টি একই ঐতিহ্যে বিশ্বাসী ও একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। একাত্মবোধের অবর্তমানে একটি রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে কিন্তু একজাতি গঠিত হইতে পারে না। কিন্তু একই রাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘকাল বসবাস করিলে একই শাসন, আইন ও একই শিক্ষাব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন জাতি ক্রমশঃই একাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া এক জাতিতে পরিণত হয়। আবার একদল লোক যখন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাদের নিজস্ব জীবন, ভাষা, কৃষ্টি ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করিতে দৃঢ়সংকল্প হয়, তখন এই একাত্মবোধই তাহাদের জাতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠন করিতে সাহায্য করে। এইজন্য বলা হয় যে, রাষ্ট্র জাতি সৃষ্টি করে, আবার জাতিও রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। ("The state creates the nation and the nation creates the state")

ভারতীয়গণকে কি এক জাতি বলা যায়?—Is India a Nation?

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করিবার পূর্বে ভারতীয়গণকে একজাতি বলিয়া অনেকে গণ্য করিতেন না। বিশেষ করিয়া মুসলীম লীগ প্রচারিত দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতীয়গণকে এক জাতি বলিয়া পরিগণিত করা যুক্তিসম্মত ছিল না। দেশবিভাগের পরবর্তী কালে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতীয়গণকে আর এক জাতি বলিয়া স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। সত্য বটে, ভারতে কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত প্রভৃতি জাতি গঠনের বিভিন্ন বাহ্যিক ঐক্যের অভাব। কিন্তু ভারতবাসী আজ এক গভীরতর ভাবগত ঐক্যের বন্ধনে

আবদ্ধ হইয়া সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আর এই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মাধ্যমে ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি তাহাদের ভাবগত ঐক্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বিশ্বের দরবারে তাহাদের ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করাই হইল ভারতীয় সভ্যতার মূল আদর্শ। এই আদর্শ স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের মাধ্যমে আজ সফল হইতে চলিয়াছে। সুতরাং তিন জাতি সমন্বিত সুইস দেশ ও বহু জাতি সমন্বিত সোভিয়েত দেশের মত ভারতীয়গণও আজ এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

এক জাতি এক রাষ্ট্র—One Nation one State.

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, যখন একদল লোক বাহ্যিক বা ভাবগত ঐক্যের দ্বারা নিজেদের পৃথক সত্তা সম্বন্ধে আত্মসচেতন হয়, তখনই তাহারা তাহাদের পৃথক সত্তা এক পৃথক রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের সাহায্যে বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। প্রত্যেক আত্মসচেতন জাতি ইহার নিজস্ব রাষ্ট্র গঠন করিয়া ইহার জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাঁচাইতে চায়। জাতির এই দাবী স্বীকৃত হইলে প্রত্যেক রাষ্ট্র মাত্র একটি সম-অনুভূতি-সম্পন্ন জাতি লইয়া গঠিত হইবে। একটি রাষ্ট্রের মধ্যে একাধিক বিরোধী-মনোভাবাপন্ন জাতির সমন্বয় উভয় জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবার অন্তরায় হইবে। বৈরিভাব, আত্মকলহ প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইয়া যাহাতে প্রত্যেক জাতি পরস্পরের সহিত শান্তি ও সম্প্রীতিতে বাস করিয়া নিজেদের সভ্যতা ও কৃষ্টির অবদানে জগৎ-সভ্যতার উন্নতি করিতে পারে সেজন্য রাষ্ট্রগুলির 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের চিন্তাবীর জন স্টুয়ার্ট মিল জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রের একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন।

আত্মনির্ধারণের নীতি ও বাস্তবক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ—Right of Self-determination and its application to practical politics.

প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি উড্‌রো উইল্‌সনের আন্তরিক চেষ্টায় স্বীকৃত হইল

তখন এই নীতিতে ইয়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে জাতির ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করিবার একটা প্রচেষ্টা চলে। প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের দাবীকে আত্ম-নির্ধারণের নীতি বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। এই নীতির ভিত্তিতেই 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' মতবাদ সমর্থিত হয়। যে সমস্ত জাতি তাহাদের রাজনৈতিক স্বাধিকার হইতে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হইয়া নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিলোপের শেষ ধাপে উপনীত হইয়াছিল, এই আত্মনির্ধারণ-নীতি সেই সমস্ত নষ্টগৌরব জাতিকে তাহাদের ভাব, ভাষা, ধর্ম, তাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য, তাহাদের রাজনৈতিক স্বাধিকার ও ঐতিহ্য-পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে। সুতরাং এই নীতির প্রয়োগের উপর একটা মুমূর্ষু জাতির জীবন-মরণ নির্ভর করে। বাস্তবক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং রাজনৈতিক স্বাধিকারের ভিত্তি বহুজাতি না হইয়া একজাতি হওয়া উচিত।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই আত্মনির্ধারণের নীতি অবাধভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব কিনা ও ইহার অবাধ প্রয়োগ জাতীয় স্বার্থের অনুকূল কি প্রতিকূল তাহা বিবেচনা করা উচিত। যাঁহারা সর্বক্ষেত্রে এই নীতির অবাধ প্রয়োগ সমর্থন করেন না, তাঁহারা এই নীতির বিরুদ্ধে কতকগুলি যুক্তি দেখান। প্রথমতঃ, বলা হয় যে, সর্বক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করা সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি বহুদিন হইতে এক ভৌগোলিক ভূ-ভাগে ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করিবার ফলে সম-সুখদুঃখভোগী হইয়া এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, পরবর্তী কালে কোন আকস্মিক কারণে ক্ষুদ্র জাতিগুলিকে আত্মনির্ধারণ-নীতির ভিত্তিতে পৃথক্ রাষ্ট্র গঠন করিবার অধিকার দেওয়া জাতিগুলির স্বার্থের প্রতিকূল হইবে। অপরপক্ষে যদি একটি জাতির দুইটি অংশ সমুদ্র, পর্বত বা অন্য কোন নৈসর্গিক ব্যবধানে দুইটি পৃথক্ ভৌগোলিক ভূ-ভাগের বাসিন্দা হয়, তাহা হইলেও তাহাদের এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া একত্র সমাবেশ দ্বারা আত্মনির্ধারণের নীতি কার্যকর করা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু যাহাকে পূর্বে অসম্ভব ও অবাঞ্ছনীয় বলা হইত, ঘটনাচক্রে বর্তমান শতাব্দীতে তাহা সম্ভব, সুতরাং বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করা হয়। প্রথম মহাসমরের পর গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে প্রথম লোক-বিনিময় আরম্ভ হয়। তুরস্কে গ্রীক অধিবাসিগণ গ্রীসে ফিরিয়া আসে আর গ্রীসের তুর্ক অধিবাসিগণ তুরস্কে প্রত্যাবর্তন করে। লোক-বিনিময়ের মাধ্যমে আত্মনির্ধারণ-নীতির

প্রয়োগ দ্বারা 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' এই সমস্যার সমাধান জার্মানি ও চেকোশ্লোভাকিয়া, এবং জার্মানি ও পোল্যাণ্ডের ক্ষেত্রেও অনুসৃত হয়। ইদানীং কালে ভারত-বিভাগের ফলে লোক-বিনিময় অনেক স্থলে পরোক্ষভাবে বাধ্যতামূলকরূপে দেখা দিয়াছে। এরূপ অধিক সংখ্যায় ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে লোক-বিনিময় বোধহয় অন্য কোন দেশে ইতিপূর্বে আর কখনও হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিষ্ঠিত পুরাতন রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে যদি এই নীতির অবাধ প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে বর্তমান আটাশটি রাষ্ট্রের পরিবর্তে ইয়ুরোপে প্রায় আটষট্টি রাষ্ট্রের উদ্ভব হইবে। ক্ষুদ্র সুইস্ দেশ ও ইংলণ্ড প্রত্যেকটি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া তিনটি অতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। এই তিনটির কোনটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ বা আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে না। পরন্তু দেশ বিভাগের ফলে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিবে, সেগুলির সন্তোষজনক সমাধান না হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি সর্বদাই আত্মকলহে লিপ্ত থাকিয়া তাহাদের সভ্যতা ও কৃষ্টির অগ্রগতিতে যত্নবান্ হইতে পারিবে না। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এই তিনটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কলহ ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

তৃতীয়তঃ, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিলেই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইয়া তাহাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করিতে পারিবে, ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ক্ষুদ্র জাতিগুলির অচিরে কোন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের তাঁবেদার হইবার সম্ভাবনা থাকে।

চতুর্থতঃ, এই নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র-পুনর্গঠন কার্য একবার আরম্ভ হইলে ইহার আর পরিসমাপ্তি হইবে না। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র জাতি এই আত্মনির্ধারণ-নীতির ভিত্তিতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিবার দাবী করিবে। ফলে, ঐক্যবদ্ধ বহু রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটিবে। রাজনীতি গ্রাম্য দলীয় মনোভাবে পর্যবসিত হইবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইহার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। জাতিগুলির মধ্যে আত্মকলহ, ক্ষমতালিপ্সা, প্রতিশোধস্পৃহা প্রভৃতি প্রবল আকার ধারণ করিয়া যুদ্ধ অনিবার্য করিয়া তুলিবে। ফলে, শান্তির পরিবর্তে জগতে এক অশান্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পঞ্চমতঃ, এই নীতির অবাধ প্রয়োগের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রগুলি (Poly-national States) যে এক জাতির ভিত্তিতে

গঠিত রাষ্ট্রগুলি (Mono-national States) অপেক্ষা অনগ্রসর বা অপেক্ষাকৃত দুর্বল একথা ঠিক নয়। অধিকন্তু অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্র-জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সভ্যতায়, কৃষ্টিতে ও শক্তি-সামর্থ্যে অনেক এক জাতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিক অগ্রসর ও শক্তিশালী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, সুইস্ দেশ প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি ইহার সত্যতা প্রমাণ করে।

এতদ্ব্যতীত এই আত্মনির্ধারণ-নীতি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোন একটি অসন্তুষ্ট জাতির দাবীর দ্বারা স্বীকৃত হইতে পারে না—ইহার স্বীকৃতি ও ইহার প্রয়োগ-ক্ষমতা নির্ভর করে জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ইচ্ছার উপর। সুতরাং এই আত্মনির্ধারণ-নীতি একটি নৈতিক দাবী মাত্র, কাজেই ইহাকে একটি আইনসঙ্গত দাবী বলা চলে না। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আলাণ্ড দ্বীপ এই আত্ম-নির্ধারণ-নীতির ভিত্তিতে যখন ফিনল্যাণ্ড দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সুইডেনের সহিত মিলিত হইবার দাবী জানাইল, তখন লীগ অব্ নেশন্সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ জাতির এই দাবী শুধু নৈতিক দাবী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল।

সুতরাং এই দাবী সম্পর্কে বলা যায় যে, ইহা সর্বক্ষেত্রে অবাধভাবে প্রয়োগ করা উচিত নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া যখন একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবিশিষ্ট জাতিকে বলপূর্বক আর একটি জাতি তাহার পদানত করিয়াছে, বা সংখ্যালঘিষ্ঠ হইলেও সমগ্র জনসমষ্টির এক বিশাল অংশ তাহাদের পৃথক ঐতিহ্যের ভিত্তিতে এই স্বাধিকার দাবী করে—এই সকল ক্ষেত্রে আত্মনির্ধারণ-নীতি প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, ভারত, বর্মা ও কোরিয়ার এই দাবী নৈতিক ও আইনসম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পশুবলের সাহায্যে জাতির এই আত্মনির্ধারণের দাবী চিরদিন দমিত রাখা সম্ভব নয়—ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য।

জাতির অন্যান্য দাবী—Other Rrights of Nationalities.

আত্মনির্ধারণের দাবী সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ না করা গেলেও জাতির অন্যান্য দাবীগুলি পূরণ করা উচিত। বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলি অন্যান্য কতকগুলি অধিকারের দাবী করিতে পারে। এই অধিকারগুলি পূরণ করিতে জাতীয় রাষ্ট্রের যত্নবান্ হওয়া উচিত।

(ক) জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার অধিকার—Right to Exist.

একটি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকগুলিকে ইহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখিবার অধিকার দেওয়া উচিত। জাতীয় রাষ্ট্র এমন কোন নীতি বা আইন বলবৎ করিবে না, যাহাতে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষ-ভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হইতে পারে।

(খ) ভাষারক্ষার অধিকার—Right to Language.

একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাষাভাষী সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বাস করিতে পারে। এই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলি তাহাদের নিজেদের ভাষার মাধ্যমে যাহাতে ভাবের আদান-প্রদান, শিক্ষাকার্য বা সাহিত্য ও কৃষ্টির পুষ্টিসাধন করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া উচিত। বলপূর্বক সংখ্যালঘিষ্ঠের ভাষার ব্যবহার বন্ধ করিয়া তাহাদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাধ্যতামূলক করা উচিত নয়।

(গ) সংখ্যালঘিষ্ঠের স্থানীয় আচার ও প্রথা রক্ষার অধিকার—Right to Retention of local Laws and Customs.

সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের এই অধিকারের দাবী লীগ অব নেশন্স্ কর্তৃক স্বীকৃত হয়। প্রত্যেক জাতির সামাজিক জীবন কতকগুলি আচার, রীতি-নীতি ও প্রথার দ্বারা অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। জাতীয় জীবনের অনেকখানি স্থান এই সামাজিক প্রথাগুলি অধিকার করিয়া থাকে। কোন সম্প্রদায়ের এই সামাজিক প্রথাগুলি যদি সমগ্র জাতীয় জীবনের বা জাতীয় নৈতিক জ্ঞানের বিরোধী না হয়, তাহা হইলে এই প্রথাগুলি রক্ষা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

(ঘ) আইনগত ও রাজনৈতিক সাম্যের অধিকার—Right to Legal and Political Equality.

জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক এই দুই প্রকার অধিকারের দাবী করিতে পারে। যোগ্যতা থাকিলে প্রত্যেক নাগরিকই—সে যে সম্প্রদায়ের লোক হউক না কেন, ভোট দিবার ক্ষমতা বা সরকারের সর্ববিধ কার্যে যোগদান করিবার অধিকার অর্জন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠ

সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া কাহারও অধিকারের কোন তারতম্য হওয়া উচিত নয়। আইনের চক্ষে সব নাগরিকই সমান। কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিয়া কোন সম্প্রদায় রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোনরূপ বিশেষ অধিকার উপভোগের দাবী করিতে পারে না।

জাতীয়তাবাদ—Nationalism.

পূর্বেই বলা হলা হইয়াছে যে, সাজাত্যবোধ একটা মানসিক অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মানসিক অনুভূতির সক্রিয় বহিঃপ্রকাশের ফলে কতকগুলি জাতির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া এক জাতির ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। এই অনুভূতি মানুষকে তাহার অধিকারগুলি সম্বন্ধে আত্মসচেতন করিয়া নির্যাতিত পরাধীন জাতিগুলির মুক্তিলাভের পথের সন্ধান আনিয়া দেয়। প্রত্যেক মুক্ত জাতি তাহার নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিয়া জগৎ-সভায় তাহার ন্যায্য আসন লাভ করিতে পারে। জাতীয়তাবোধ উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জাতি তাহার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী তাহার জাতীয় জীবন সংগঠন করিতে পারে। জাতীয়তাবোধ মানুষকে শিক্ষা দিয়াছে যে, জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি লোক তাহার সমষ্টিগত জাতীয় জীবনের প্রতি নির্বিচারে আনুগত্য স্বীকার করিবে, কেননা, জাতির স্বার্থের সহিত ব্যক্তির স্বার্থ অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। সুতরাং জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ ও ইহার উন্নতিবিধান প্রত্যেক মানুষের পবিত্র কর্তব্য। রাজনৈতিক জীবনে জাতীয় রাষ্ট্র গঠনই হইল প্রথম ও প্রধান অধ্যায়। সুতরাং জাতীয়তাবাদ হইল স্বদেশপ্রেম। এই স্বদেশপ্রেম উন্মেষ ও সক্রিয় হইবার ফলে একটি জাতি ইহার ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি, অর্থনৈতিক অবস্থা ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিবার সুযোগ পায়। প্রত্যেক জাতির উন্নতির ফলে আন্তর্জাতিক উন্নতি বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জাতীয়তাবোধ একটি মহান্ আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হয়। যদি ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা অপরিহার্য হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিসমষ্টির সমন্বয়ে যে জাতি গঠিত হয়, সেই সমষ্টিগত জীবনের পক্ষেও জাতীয় স্বাধীনতা অপরিহার্য। মানবসভ্যতা বিকাশের জন্যই প্রত্যেক প্রকৃত স্বতন্ত্র জাতির এই অধিকার থাকা প্রয়োজন। এই অধিকারের বলে প্রত্যেক

জাতি তাহার নিজস্ব গুণাবলী, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুষ্টিসাধন করিয়া জগৎ সভ্যতাকে উন্নততর করিতে সহায়তা করে।

রাষ্ট্রনীতিতে জাতীয়তাবাদের আবির্ভাবের ফলে বহু দেশে একনায়কত্বের অবসান হইয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জাতীয়তাবাদ জাতির মধ্যে আত্মপ্রত্যয় সঞ্চারিত করিয়া একটা মহৎ কিছু করিবার অনুপ্রেরণা দেয়।

বিকৃত জাতীয়তাবাদ—Perverted Nationalism.

কিন্তু এই জাতীয়তাবাদ যদি বিকৃত হয়, তাহা হইলে জাতির পক্ষে তাহার পরিণাম ভয়াবহ। জাতীয়তাবাদের বিকৃতি দুইটি কারণে ঘটিতে পারে। প্রথম কারণটি জাতির আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত হয়, আর দ্বিতীয়টি নির্ভর করে এক জাতির সহিত অন্য জাতির সম্পর্কের উপর। কতকগুলি ক্ষুদ্র উপজাতি বা সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে একটি পূর্ণ জাতি গঠিত হয়। মূলগত ঐক্য থাকিলেও এই সম্প্রদায়গুলি বিভিন্ন ভাষাভাষী বা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইতে পারে, বা বিভিন্ন আচার-প্রথার দ্বারা তাহাদের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে, এইরূপ এক বা একাধিক সম্প্রদায় মূল জাতি হইতে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য পৃথক্‌ভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সাম্প্রদায়িক ভাষা, ইতিহাস ও কৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া এক পৃথক্ স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিতে সচেষ্ট হয়। এই মনোভাবের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া ক্যারেন জাতি বর্মা হইতে স্বাতন্ত্র্যের দাবী করিতেছে। শ্লোভাক ও শ্লোভেনিস্ সম্প্রদায়গুলিও চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে পৃথক্ হইবার দাবী জানাইতেছে। এই মনোভাবকে বিকৃত ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বলা চলে। এই মনোভাবের ফলে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত জাতি ইহার সমষ্টিগত সংহতি ও ঐতিহ্য হারাইয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতে পারে—স্বদেশপ্রেম প্রাদেশিকতায় পর্যবসিত হয়। ভারতেও কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই স্বার্থপ্রণোদিত ভেদবুদ্ধি কিছু কার্যকরী হইয়াছে। এইরূপ মনোভাব জাতীয় জীবনের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর। সুতরাং অঙ্কুরেই ইহার বিনাশসাধন না করিলে জাতীয় জীবনে ইহা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় পরিব্যাপ্ত হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, যখন কোন জাতি স্বীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টিতে অত্যধিক আস্থাবান হইয়া অপর জাতিকে অবজ্ঞা করিতে শিখে এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ছলে-বলে-

কৌশলে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জাতির উপর চাপাইতে চায়, তখন এই জাতীয়তাবাদ আক্রমণাত্মক মূর্তি ধারণ করিয়া বিশ্বশান্তির অন্তরায় হইয়া উঠে। এইরূপ বিকৃত জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য হইল, ইহা শুধু নিজ জাতির প্রতি ভালবাসা বা আস্থারূপে প্রকাশ না পাইয়া অন্য জাতির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে পরিণত হয়। ফলে, শক্তিশালী জাতিসমূহ নিজেদের জাতীয় গর্ব ও শক্তি প্রচার করিবার মানসে দুর্বল জাতিগুলির স্বাধীনতা হরণ করে। বর্তমান যুগে এই আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ জাতির অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করিবার উদ্দেশ্যে পৃথিবী ব্যাপিয়া ইহার প্রভাব বিস্তার করিতে উদ্যত হইয়াছে। বড় বড় জাতিগুলি শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্য অতিরিক্ত মুনাফায় বিক্রয় করিবার জন্য দুর্বল রাষ্ট্রগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করে। ব্যবসা-বাণিজ্য-প্রসারের উদ্দেশ্যে অথবা খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারের অজুহাতে এক সময়ে ইয়ুরোপীয় জাতিসমূহ এশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশের বহু ক্ষুদ্র জাতির স্বাধীনতা হরণ করিয়া বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। অনেক সময় এই উপনিবেশ খুঁজিতে গিয়া দুই বা ততোধিক বৃহৎ জাতির মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ বিদ্বেষমূলক ও আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবোধের জন্য প্রত্যেক জাতীয় রাষ্ট্রকে সর্বদা প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের সহিত অথবা বিজিত জাতিগুলির সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। সেজন্য বিরাট সামরিক বাহিনী ও রণসম্ভার রাখা প্রয়োজন; কিন্তু ইহার ফলে আন্তর্জাতিক অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়ায় যে, সামান্য কোন কারণেই জাতিগুলির মধ্যে বিধ্বংসী যুদ্ধ বাধিয়া যায়। বড় বড় রাষ্ট্রগুলির সংকীর্ণ ও স্বার্থপ্রণোদিত জাতীয়তাবাদের পরিণামে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তাহাতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্ব বিপদাপন্ন হয়। স্বার্থের হানাহানির কি ভীষণ পরিণাম, বিগত দুইটি মহাসমর তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অধুনা আবার কয়েকটি বৃহৎ বিত্তশালী রাষ্ট্র অর্থসাহায্য দিয়া দুর্বল রাষ্ট্রগুলির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি যদি অর্থনৈতিক ব্যাপারে বৃহৎ রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হয়, তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত এই অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা তাহাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করিতে পারে।

জাতীয়তাবাদ একটা মহান আদর্শ। এই আদর্শে প্রত্যেক জাতিকেই প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করে। ইহার মূলনীতি হইল—আপনি বাঁচ ও অপরকে বাঁচিতে দাও। কিন্তু আদর্শভ্রষ্ট জাতীয়তাবাদ একটা সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক এবং যখন এই জাতীয়তাবাদ ইহার মহান্ আদর্শভ্রষ্ট হইয়া আক্রমণাত্মক হইয়া উঠে তখন ইহা যুদ্ধবাদে পরিণত হয় আর যুদ্ধবাদ সাম্রাজ্যবাদেরই জন্মদাতা।

আন্তর্জাতিকতা—**Internationalism.**

জাতীয়তাবাদ একটি জাতির রাজনৈতিক জীবনের প্রথম ও প্রধান অধ্যায় হইলেও শেষ অধ্যায় নহে। পৃথিবীতে অসংখ্য জাতি বাস করে এবং কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত ও ভাবগত অনৈক্যের দ্বারা একটি জাতি অপর জাতি হইতে পৃথক। জাতিগুলির মধ্যে এই পার্থক্যের ফলে অনেক সময় পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্ম লাভ করে এবং শেষ পর্যন্ত বহুক্ষেত্রে এই ঘৃণা ও বিদ্বেষ সশস্ত্র কলহে পরিণত হয় যাহার ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইলে কোন জাতিই স্বীয় উন্নতি সাধন করিয়া জগৎ সভ্যতা সমৃদ্ধ করিতে পারে না। তাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিকতার প্রয়োজন। আন্তর্জাতিকতার অর্থ হইল জাতিগুলির মধ্যে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও কলহের পরিবর্তে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও সহযোগিতা সৃষ্টি দ্বারা এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করা যে পরিবেশে জাতিগুলি নিজ নিজ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পারস্পরিক সহযোগিতার সাহায্যে জাতীয় উন্নতি সাধন করিয়া সামগ্রিক ভাবে জগৎ সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে। সুতরাং জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। জাতীয় রাষ্ট্র গঠন ও জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শন মানুষের অবশ্য কর্তব্য—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মানবজীবনের শেষ বা চরম আনুগত্য হইল মানবজাতির প্রতি। জাতীয়তাবাদের চরম পরিণতি হইল আন্তর্জাতিকতা।

আন্তর্জাতিকতা শুধু একটা রাষ্ট্রনৈতিক অনুভূতির ব্যাপার নহে, ইহার একটা আধ্যাত্মিক তাৎপর্যও আছে। এই অনুভূতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে দেশ-কাল-পাত্র প্রভৃতি ক্ষুদ্র গণ্ডির বন্ধন ছিন্ন করিয়া মানুষ বিশ্বমানবতার স্তরে

উপনীত হইতে পারে। আত্মপ্রীতি ও আত্মপ্রত্যয় মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ, কিন্তু পরবিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের মনোভাব পোষণ করা দূষণীয়। স্বার্থসম্বন্ধে তৎপর হওয়া মানুষের ধর্ম, কিন্তু স্বার্থপরতা সর্বথা পরিত্যাজ্য। ব্যক্তিগত জীবনে যদি এই নীতি প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে জাতীয় জীবনেও ইহার প্রয়োগ অস্বীকার করা যায় না। জাতীয় জীবনে এই নীতি কার্যকর হইলে আন্তর্জাতিক বিদ্বেষ ও আন্তর্জাতিক কলহের আর সম্ভাবনা থাকে না। স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব—এই মহান্ আদর্শ কোন জাতিবিশেষের জন্য রচিত হয় নাই, পরন্তু ইহা সর্বজাতির আদর্শ—এই মনোভাবের উদয় হইলে আন্তর্জাতিকতা প্রতিষ্ঠা করা সহজসাধ্য হয়। আন্তর্জাতিকতার প্রধান উদ্দেশ্য হইল, প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতিকে তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার সুযোগ দিয়া পরস্পরের মধ্যে আদর্শগত ও কৃষ্টিগত ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব করিয়া বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠা করা। প্রত্যেক জাতি যদি ইহার জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারে, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বিদ্বেষ ও বিবাদের অবসান ঘটিবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক নীতিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক আইন বর্তমান যুগে রাষ্ট্রগুলিকে নানাভাবে পরস্পরের সংস্পর্শে আনিয়া আন্তর্জাতিকতা সৃষ্টির সহায়তা করিতেছে। আন্তর্জাতিকতা-বৃদ্ধির পথে একমাত্র অন্তরায় হইল রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা। রাষ্ট্রের এই সার্বভৌম শক্তির প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে রাষ্ট্রের কতকগুলি মহান্ কর্তব্য পালনের উপর। রাষ্ট্রের এই কর্তব্য হইল আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া মানুষের সর্বাত্মক অগ্রগতিতে সাহায্য করা। যে সার্বভৌম শক্তির বলে রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলার রক্ষক বলিয়া পরিগণিত হয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধবাদের দ্বারা বিশ্বশান্তি-বিনাশে সেই সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ হইতে পারে না—মানুষ যেদিন এই সত্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবে সেদিন জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার মধ্যে কোনরূপ বিরোধ থাকিবে না—'দিবে আর নিবে, মেলাবে মিলিবে'—এই নীতির দ্বারাই জাতীয় জীবন পরিচালিত হইবে। পারস্পরিক সদিচ্ছা ও সহযোগিতার উপর আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বর্তমান জগতে এই নৈতিক মনোভাবের উদয় হইলে পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি স্থাপন করা সম্ভব নয়। জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার সমন্বয় সাধন হইল মানব সভ্যতার অগ্রগতির ভিত্তি।

চতুর্থ অধ্যায়

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

(United Nations)

সূচনা—Introduction.

মানুষ বুদ্ধিমান, যুক্তিবাদী ও সহানুভূতিশীল জীব হইলেও মানব চরিত্রের একটা অভিশাপ হইল কলহপ্রিয়তা। স্বার্থপ্রণোদিত এই কলহপ্রিয়তা মানুষকে বহুক্ষেত্রে তাহার বুদ্ধি, যুক্তি ও সহানুভূতি প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী বিসর্জন দিয়া আত্মঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত করিয়াছে। রামায়ণ মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধ ও ট্রয়নগরের যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কালের ভিয়েৎনাম যুদ্ধ পর্যন্ত পৃথিবীতে যে সংখ্যাতীত যুদ্ধ ঘটিয়াছে তাহা মানুষের কলহপ্রিয়তার অনস্বীকার্য সাক্ষ্য। এই বিধ্বংসী সংগ্রামগুলির ফলে অসংখ্য লোকক্ষয়, সম্পত্তিনাশ ও মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। তবুও মানুষ অতীতের শিক্ষা অবহেলা করিয়া পুনঃপুনঃ এই সর্বনাশা সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে ও লিপ্ত হইতেছে। কিন্তু পৃথিবীতে শান্তিকামী ও বিশ্বমানবতায় বিশ্বাসী মহাপ্রাণ লোকেরও অভাব নাই। এই শান্তিকামী মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ যুগে যুগে বিশ্বমানবতার স্বার্থে এই সর্বনাশা যুদ্ধ পরিহার করিবার সকরুণ আবেদন ও আহ্বান জানাইয়া আসিতেছেন।

কিন্তু আজ সামাজিক মানুষ ক্রমশ বুঝিয়াছেন যে, নিজে বাঁচিতে হইলে অপরকে বাঁচিতে দিতে হইবে এবং এই পারস্পরিক অধিকার সংরক্ষণের জন্যই সংগ্রামের পথ পরিহার করিয়া শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার পথ অনুসরণ করিতে হইবে। মানুষ আজ বুঝিয়াছে যে, সংগ্রামের পথ হইল ধ্বংসের পথ ও শান্তি ও সহযোগিতার পথ হইল বাঁচিবার ও সৃষ্টির পথ। তাই বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর জাতিসংঘ নামক (The League of Nations) বিশ্বসংঘ গঠিত হয়। কয়েক বৎসর আংশিক সাফল্যের সহিত কার্য করিবার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে বিশ্বের শান্তিকামী জনগণকে হতাশ করিয়া এই বিশ্বসংঘের অকাল ও লজ্জাকর মৃত্যু ঘটে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উৎপত্তি—Genesis of the United Nations.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) হত্যা ও ধ্বংসলীলা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা অতিক্রম করিল। শান্তিকামী মানুষ আবার উপলব্ধি করিল যে, জগতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে আর একটি বিশ্ব সংগঠন (World Organisation) নিতান্ত প্রয়োজন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী তদানীন্তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট কংগ্রেস সভায় যে বাণী প্রেরণ করেন, সেই বাণীতেই সর্বপ্রথম তিনি এইরূপ একটি বিশ্ব-সংগঠন প্রতিষ্ঠার আবশ্যিক প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। উক্ত সালের ১৫ই আগস্ট মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল 'অতলান্তিক সনদ' (Atlantic Charter) নামে যে যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেন সে বিবৃতিতেও প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা ও ভৌমিক অখণ্ডতা সুনিশ্চিত করিয়া বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয়।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর মার্কিন সরকার বিশ্ব-সংগঠনের একটি বাস্তব কাঠামো বৃটিশ, সোভিয়েত ও চীন সরকারের প্রতিনিধিগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করে। এই প্রস্তাব ডাম্বারটন্ ওক্স্ প্রস্তাব (Dumburton Oaks Proposals) নামে অভিহিত হয়, কিন্তু প্রতিনিধিগণের মধ্যে মতভেদের ফলে কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ইহার পর রুশিয়ার ইয়ালটা শহরে রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্টালিন এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া (ইয়ালটা সম্মেলন) বিশ্ব-সংগঠনের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে স্থির হয় যে, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্যানফ্রান্সিসকো শহরে জাতিসমূহের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে এবং এই ঘোষণা অনুযায়ী উক্ত দিবসে ৫৫টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে বহু বাক্-বিতণ্ডার পর উক্ত বৎসরের ২৫শে জুন সম্মেলনের পূর্ণ অধিবেশনে জাতিপুঞ্জের সনদ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। সদস্যরাষ্ট্রসমূহের আইনসভা কর্তৃক সনদটি (Charter of the United Nations) অনুমোদিত হইলে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ জন্মলাভ করে।

জাতিপুঞ্জের সনদ ও ইহার উদ্দেশ্য—Charter of the U. N. and its Purposes.

একটি উচ্চ আদর্শ-সম্বলিত প্রস্তাবনা (Preamble)-সহ ১১১টি ধারা লইয়া

গঠিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। প্রস্তাবনায় উল্লেখিত জাতিপুঞ্জের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

১। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে যুদ্ধের অবর্ণনীয় যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করা,

২। মৌলিক মানবিক অধিকারগুলির উপর আস্থা সুনিশ্চিত করা,

৩। আন্তর্জাতিক কর্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, এবং

৪। সামাজিক অগ্রগতি ও উচ্চতর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা।

উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যগণকে সহনশীলতা ও সৎ-প্রতিবেশী-সুলভ আচরণের অনুরোধ করা হইয়াছে।

জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য—Purposes of the U. N.

১। জগতে শান্তি ও প্রগতির প্রধান শত্রু হইল যুদ্ধ এবং যুদ্ধ-ভীতি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান উদ্দেশ্য হইল এই যুদ্ধের কারণ দূর করা। এই উদ্দেশ্যে এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক বিরোধ নিরসনের জন্য শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বন সাহায্যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করিবার প্রয়াসী।

২। দ্বিতীয়তঃ, সকল জাতির লোকের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া যাহাতে তাহারা সকলেই শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশীরূপে বাস করিতে পারে সেজন্য সচেষ্ট থাকা। ইহা ছাড়া জাতিগুলির সমানাধিকারের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধার মনোভাব বৃদ্ধি করাও এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।

৩। জাতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা হইল আন্তর্জাতিক বিরোধের একটি প্রধান কারণ। বিরোধের এই বিশেষ কারণটি দূর করিবার জন্য জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য হইল জাতিগুলির সামাজিক, কৃষ্টিমূলক ও অর্থনৈতিক জীবনে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। এই সঙ্গে জাতি-ধর্ম-ভাষা, স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকল মানুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণও এই প্রতিষ্ঠানের এক মহান উদ্দেশ্য।

৪। বিশ্ব-সংগঠন হিসাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চতুর্থ ও শেষ উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন জাতির কার্যকলাপের সমন্বয় সাধনপূর্বক জাতিগুলির মধ্যে মত-ভেদ ও বিরোধের পরিবর্তে ঐক্য ও মত-সামঞ্জস্য স্থাপন করা।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নীতিসমূহ—Principles of the U. N.

জাতিপুঞ্জের সনদে সদস্যরাষ্ট্রগুলি কর্তৃক একক ও যুক্তভাবে স্বীকৃত সাতটি নীতির ভিত্তিতে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। নীতিগুলি হইল :—

১। সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে সকল রাষ্ট্রই সমান।

২। সকল সদস্যরাষ্ট্রই তাহাদের আন্তর্জাতিক কর্তব্য নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিবে।

৩। সকল সদস্যরাষ্ট্রই এরূপ শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাহাদের পারস্পরিক মতভেদের সমাধান করিবে যাহাতে শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার বিপন্ন না হয়।

৪। কোন সদস্যরাষ্ট্রই অপর রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বা ভূখণ্ডের উপর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী বলপ্রয়োগ করিবে না বা বলপ্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন করিবে না।

৫। যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে এরূপ রাষ্ট্রের সাহায্য অন্য রাষ্ট্র করিতে পারিবে না। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বলবৎ করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা হইল সকল রাষ্ট্রের কর্তব্য।

৬। শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে জাতিপুঞ্জ সদস্য-বহির্ভূত রাষ্ট্রগুলি যাহাতে এই নীতিগুলির সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাহাদের কার্যকলাপ পরিচালনা করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সে বিষয়ও সুনিশ্চিত করিবে।

৭। জাতিপুঞ্জ কোন রাষ্ট্রের নিছক আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না কিংবা এরূপ ব্যাপার জাতিপুঞ্জের দ্বারা নিষ্পত্তির জন্য উপস্থাপিত করিতে বাধ্য করিবে না। কিন্তু শান্তিভঙ্গের অভিযোগে কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ নীতি প্রযুক্ত হইলে উপরি-উক্ত নীতি কার্যকর হইবে না।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ Membership of the U. N.

স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো সম্মেলনের সিদ্ধান্তে স্বাক্ষরদানকারী ৫২টি রাষ্ট্র লইয়া এই প্রতিষ্ঠান প্রথম গঠিত হয়। শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রগুলি যাহারা জাতিপুঞ্জে যোগদানে ইচ্ছুক ও সদস্যপদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম এইরূপ রাষ্ট্রগুলিকেই সদস্যভুক্ত করা হয়। নিরাপত্তা পরিষদের (Security Council) সুপারিশ-

ক্রমে সাধারণ সভা (General Assembly) কর্তৃক নূতন সদস্য গ্রহণ করা হয়। যে সদস্য ক্রমাগত সনদে উল্লিখিত জাতিপুঞ্জের নীতিগুলি ভঙ্গ করে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা এরূপ সদস্যকে বহিষ্কার করিতে পারে। যে সদস্যরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে সদস্যপদের সকল সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিতে পারে আবার পুনঃপ্রদানও করিতে পারে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাঠামো—Structure of the U. N.

ছয়টি বিভিন্ন সংস্থার সাহায্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ইহার উদ্দেশ্যগুলিকে কার্যে রূপায়িত করে। সংস্থাগুলি হইল :—

১। সাধারণ সভা—The General Assembly

২। নিরাপত্তা বা স্বস্তি-পরিষদ—The Security Council

৩। আন্তর্জাতিক বিচারালয়—The International Court of Justice

৪। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা—The Economic and Social Council

৫। অছি-পরিষদ —The Trusteeship Council

৬। মহাকরণ The Secretariat

১। সাধারণ সভা—The General Assembly.

(ক) সংগঠন, অধিবেশন ও ভোটদান পদ্ধতি—Organisation, Session and Voting Procedure.

সাধারণ সভাই হইল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্মতৎপরতার কেন্দ্রস্থল। এই সভায় জাতিপুঞ্জের সকল কার্য আলোচিত হয়। সকল সদস্যরাষ্ট্র হইতে পাঁচজন প্রতিনিধি লইয়া এই সভা গঠিত হইলেও কোন সদস্যরাষ্ট্রই কোন ব্যাপারে একাধিক ভোটদান করিতে পারে না। এই নিয়ম বলবৎ করিয়া ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল রাষ্ট্রের সমানাধিকার স্বীকার করা হইয়াছে।

প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ইহার অধিবেশন বসে। এই নিয়মিত অধিবেশন ব্যতীতও নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধে প্রধান কর্মসচিব সাধারণ সভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আপৎকালীন বিশেষ অধিবেশনও (Emergency

Special Session) বসিতে পারে। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে মধ্য-প্রাচ্যের গুরুতর পরিস্থিতি আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ একটি জরুরী অধিবেশন বসে। প্রতি বাৎসরিক অধিবেশনের জন্য সাধারণ সভা একজন সভাপতি (Chairman) ও একজন সহ-সভাপতি (Vice-Chairman) নির্বাচন করে। সভা ইহার কার্য-পদ্ধতি সম্পর্কে নিয়মাবলী প্রণয়ন করে।

জাতিপুঞ্জের সনদে উল্লেখিত সমুদয় ব্যাপার সম্পর্কে সাধারণ সভা আলোচনা করিতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে দুইটি ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। কোন নূতন সদস্য গ্রহণ, সাময়িকভাবে কোন সদস্যকে বহিষ্কার করা বা একেবারে বহিষ্কার করা, শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ, অছি-পরিষদ-সংক্রান্ত বিষয়, আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত প্রশ্ন প্রভৃতি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে উপস্থিত ও ভোটদানকারী দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন। অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি সাধারণ সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত হয়। সর্বসম্মত মতের পরিবর্তে সংখ্যাধিক্যের প্রাধান্য প্রবর্তিত হইবার ফলে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রভাব হ্রাস পাইয়াছে।

(খ) ক্ষমতা ও কার্যাবলী—Powers and Functions.

১। সাধারণ সভার ক্ষমতা ও কার্য সনদের ১০ ও ১৭ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। সনদের অন্তর্ভুক্ত যে-কোন প্রশ্ন বা বিষয় সম্পর্কে সাধারণ সভা আলোচনা করিতে পারে। অন্যান্য সংস্থাগুলির কার্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এই সভা সে সম্পর্কে জাতিপুঞ্জের সদস্যগণকে বা নিরাপত্তা পরিষদে অথবা উভয়ের কাছে সুপারিশ করিতে পারে।

২। কোন সদস্যরাষ্ট্র বা স্বস্তি পরিষদ অথবা জাতিপুঞ্জের সদস্য নয় এরূপ রাষ্ট্র কর্তৃক আনীত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষামূলক যে-কোন প্রশ্ন এই সভা আলোচনা করিতে পারে। কোন অবস্থায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার সম্ভাবনা ক্ষেত্রে এই সভা সে বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।

৩। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে সাধারণ সভা গবেষণামূলক অনুসন্ধান করিয়া এ বিষয়ে সুপারিশ করিতে পারে। এই সভা আন্তর্জাতিক আইনের ক্রম উন্নয়নে ও ইহাকে আইন আকারে বিধি-বদ্ধ করিতে উৎসাহ দান করিতে পারে।

৪। অছি-পরিষদ সম্পর্কিত ব্যাপারেও সাধারণ সভার কিছু ক্ষমতা আছে। জাতিপুঞ্জের প্রধান কর্ম-সচিব-প্রদত্ত অছি-পরিষদ সম্পর্কিত বিবরণী এই সভা বিবেচনা করে। অছি-পরিষদের অধীন স্বায়ত্তশাসনবিহীন জনপদ-গুলি সম্পর্কিত তথ্য ও শাসনব্যবস্থার বিচার-বিশ্লেষণ করে।

৫। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব এই সভা কর্তৃক বিবেচিত ও অনুমোদিত হয়। বাৎসরিক ব্যয়ের কি পরিমাণ কোন্ সদস্য বহন করিবেন তাহা এই সভা কর্তৃক ধার্য হয়। বিশেষীকৃত শাখাগুলির (Specialised Agencies) আয়-ব্যয়ের হিসাবও এই সভা বিবেচনা করে।

৬। এই সভা নিরাপত্তা পরিষদের দশজন অস্থায়ী সদস্য ও দুই বৎসরের জন্য তিনজন সদস্যকে প্রতি বৎসর নির্বাচন করে।

৭। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ২৭ জন সদস্য এই সভা কর্তৃক নির্বাচিত হয়।

৮। সাধারণ সভা অছি-পরিষদের সদস্যগণকে নির্বাচন করে।

৯। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে এই সভা মহাসচিবকে নিয়োগ করে।

১০। নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভা পৃথক্‌ভাবে ভোটদান করিয়া আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ১৫ জন বিচারপতিকে নির্বাচন করে। তবে একই দেশ হইতে দুইজন বিচারপতি নির্বাচন করা যায় না।

১। শান্তির উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব, ১৯৫০- Uniting for Peace Resolution, 1950.

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে উপরি-উক্ত প্রস্তাব গ্রহণের ফলে সাধারণ সভার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এতদিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান কার্য ছিল। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচজন স্থায়ী সদস্যের বিশেষ করিয়া মার্কিন ও সোভিয়েত সরকারের গুরুতর মতভেদের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইলেও শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হইত না। কারণ শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্র কোন-না-কোন বৃহৎ শক্তির আশ্রিত রাষ্ট্র বলিয়া একটি বৃহৎ রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ভিটো প্রয়োগ করিত

অর্থাৎ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিত। সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের সনদ অনুসারে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা-সম্পর্কিত ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচজন স্থায়ী সদস্যেরই সম্মতি আবশ্যিক। একজন সদস্য অসম্মতি প্রকাশ করিলেই অপর চারজনের সম্মতি অর্থশূন্য হয়। এই নিয়ম বলবৎ থাকিবার ফলে নিরাপত্তা পরিষদ ইহার প্রধান উদ্দেশ্য সাধনে অর্থাৎ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা কার্যে কার্যতঃ ব্যর্থকাম হয়।

প্রধানতঃ মার্কিন সরকারের অনুপ্রেরণায় সাধারণ সভা কর্তৃক শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, নিরাপত্তা পরিষদ ইহার স্থায়ী সদস্যগণের 'সর্বসম্মত মত' (Unanimity নীতির ফলে কোন ক্ষেত্রে যদি শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় অসমর্থ হয়, সেরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ সভা জরুরী অধিবেশনে মিলিত হইয়া পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করিবে এবং সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে শান্তিভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিবে।

এতদিন পর্যন্ত শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব নিরাপত্তা-পরিষদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা-পরিষদ ব্যর্থ হইলে সাধারণ সভাই জাতিপুঞ্জের এই প্রধান দায়িত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করে। ইহার ফলে সাধারণ সভার ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সেনাবাহিনী মিশরে প্রেরিত হয়।

সাধারণ সভার কার্য সাতটি বিভিন্ন কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হয়, যথা, ১। অস্ত্র নিয়ন্ত্রণসহ রাজনৈতিক ও নিরাপত্তামূলক, ২। অর্থনৈতিক ও রাজস্ব সম্বন্ধীয়, ৩। সামাজিক, মানবিক ও কৃষ্টিমূলক ইত্যাদি। সাধারণ সভার অন্যান্য ক্ষমতার উল্লেখ না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, সাধারণ সভার এককভাবে ইহার নিজের সদস্য গ্রহণ বা বহিষ্কার করিবার ক্ষমতা নাই। এ ব্যাপারে সভা নিরাপত্তা-পরিষদের উপর নির্ভরশীল। এই সভা পৃথিবীর বৃহত্তম প্রতিনিধিমূলক পরিষদ হইলেও জাতিপুঞ্জের কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে ইহার ভূমিকা হইল গৌণ। সাধারণ সভার এই গৌণ ভূমিকার কারণও সুস্পষ্ট। গ্রেট্ বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র হইল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিজেতা এবং বিজেতা এই ত্রি-শক্তি হইল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের

সৃষ্টিকর্তা। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৃষ্টিকর্তাগণ ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাষ্ট্র নিরপেক্ষভাবে সমানাধিকারের ভিত্তিতে পরিকল্পিত ও গঠিত সাধারণ সভার হস্তে প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত করিবার বিরোধী ছিলেন—কারণ এরূপ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও স্বল্প শক্তিবিশিষ্ট রাষ্ট্রগুলি একজোট হইয়া বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজেদের সিদ্ধান্ত বলবৎ করিতে পারে। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিজেতাগণ নিজেদের প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া গঠন করেন।

২। নিরাপত্তা পরিষদ – The Security Council

(ক) সংগঠন, অধিবেশন ও ভোটদান পদ্ধতি – Composition, Session and Voting Procedure.

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ১১ জন সদস্য লইয়া নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত ছিল। এই বৎসর হইতে ইহার সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ১৫ করা হয়। ৫ জন স্থায়ী সদস্য (Permanent Members) এবং ১০ জন অস্থায়ী সদস্য (Non-permanent) লইয়া এই পরিষদ গঠিত। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী চীন এই পরিষদের স্থায়ী সদস্য ছিল। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে সাম্যবাদী চীনের জাতিপুঞ্জের সদস্যপদভুক্তির ফলে ফরমোজায় নির্বাসিত জাতীয়তাবাদী চীন এই পরিষদ হইতে বহিষ্কৃত হয় এবং সাম্যবাদী চীন সেই শূন্যস্থান পূরণ করে। বর্তমানে ৫ জন স্থায়ী সদস্য হইল—১। গ্রেট ব্রিটেন, ২। ফরাসীদেশ, ৩। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ৪। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও ৫। সাম্যবাদী চীন। অবশিষ্ট ১০ জন অস্থায়ী সদস্য সাধারণ সভার ⅔ সংখ্যাধিক্য ভোটে দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। অস্থায়ী সদস্যগণের কার্যকাল শেষ হইলে সহসা তাঁহারা আর পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন না। সদস্য নির্বাচন ব্যাপারে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে সদস্যগণের অবদান ও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের যথাযথ ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করা হয়। নিরাপত্তা পরিষদে প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবে। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নয় জাতিপুঞ্জের এরূপ কোন সদস্যরাষ্ট্রের বিশেষ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারের আলোচনাকালে এরূপ রাষ্ট্রের একজন প্রতিনিধি নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থিত থাকিয়া তাহার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট আলোচনায় যোগদান

করিতে পারেন কিন্তু ভোটদান করিতে পারেন না। নিরাপত্তা পরিষদও বিরোধ মীমাংসা ক্ষেত্রে এরূপ রাষ্ট্রকে বিরোধ বিষয় আলোচনা কালে নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থিত থাকিবার জন্য আহ্বান করিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ ইহার কার্য পরিচালনার জন্য নিয়ম প্রণয়ন করে এবং প্রতি মাসের জন্য ইংরেজী বর্ণমালা অনুসারে পর্যায়ক্রমে একজন সদস্যকে সভাপতিপদে নির্বাচন করে। নিরাপত্তা পরিষদ ইচ্ছা করিলে ইহার প্রধান কর্মস্থল নিউইয়র্ক ব্যতীতও অন্যত্র ইহার অধিবেশন বসাইতে পারে।

সাধারণতঃ একপক্ষকালের মধ্যে ইহার একটি অধিবেশন বসে। প্রয়োজন ক্ষেত্রে আরও সচরাচর ইহার অধিবেশন বসিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ প্রয়োজন হইলে যাহাতে বিরামহীনভাবে অধিবেশন চালাইতে পারে তদুদ্দেশ্যে প্রত্যেক সদস্যেরই ইহার প্রধান কর্মকেন্দ্রে সকল সময়ের জন্য একজন স্থায়ী প্রতিনিধি নিযুক্ত রাখিতে হয়।

নিরাপত্তা পরিষদের প্রত্যেক সদস্যেরই একটি করিয়া ভোটদান করিবার অধিকার আছে। কার্যপদ্ধতি সম্পর্কিত ব্যাপারে (Procedural matters) ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ৯ জন সদস্যের সম্মতি আবশ্যিক। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (Substantive matters) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে স্থায়ী ৫ জন সদস্যসহ ৯ জন সদস্যের সম্মতি একান্ত প্রয়োজন অর্থাৎ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে ৫ জন স্থায়ী সদস্য একমত না হইলে সিদ্ধান্তটি কার্যকর হয় না। একজন সদস্য অসম্মতি প্রকাশ করিলে অপর ৪ জন স্থায়ী সদস্য ও ৫ জন অস্থায়ী সদস্যের সম্মতি বিফল হয়। এই একজন সদস্যের অসম্মতিই বৃহৎ শক্তিবর্গের নাকচ করিবার ক্ষমতা (Veto Power) নামে কুখ্যাত। বৃহৎ শক্তিবর্গের এই অস্বাভাবিক ক্ষমতা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার পথে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভোট-দানে কোন সদস্যও বিরতও থাকিতে পারেন। এই বিরতি ভিটো প্রয়োগ বলিয়া পরিগণিত হয় না।

ভিটো ক্ষমতার ইতিহাস হইল যে, স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো সম্মেলনে যখন ভবিষ্যৎ জাতিপুঞ্জের সংগঠন কাঠামো উপস্থাপিত হয় তখন উপস্থিত অধিকাংশ রাষ্ট্রই ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগের বিরোধিতা করে। বৃহৎ শক্তিবর্গ বিশেষ করিয়া

মার্কিন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রদ্বয় তাঁহাদের এই বিশেষ ক্ষমতার দাবি সম্পর্কে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ ছিল। এই দাবির সমর্থনে তাঁহাদের যুক্তি হইল যে, যেহেতু তাঁহারাই অক্ষ শক্তিকে (Axis Power) পরাজিত করিয়া জগতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন সেইহেতু ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে তাঁহাদের ভূমিকা হইবে মুখ্য। যদি তাঁহাদের এই বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া না হয় তাহা হইলে তাঁহারা জাতিপুঞ্জ সংগঠনে যোগদান করিবেন না। বৃহৎ শক্তিবর্গের এই ভীতি প্রদর্শনের ফলে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি সমানাধিকার নীতি বিসর্জন দিয়া বৃহৎ পঞ্চশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু বৃহৎ পঞ্চশক্তি বিশেষ করিয়া মার্কিন ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রদ্বয় তখন বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহাদের যুদ্ধকালীন ঐক্য ও সংহতি চিরস্থায়ী নাও হইতে পারে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার স্বল্পকাল মধ্যেই ঐ উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যের স্থলে অনৈক্য ও সংহতির পরিবর্তে তীব্র বিরোধ আবির্ভূত হইয়া জাতিপুঞ্জের প্রধান উদ্দেশ্য শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে প্রায় অনতিক্রমণীয় বাধা সৃষ্টি করে। যখনই কোন বৃহৎ শক্তি বা ইহার আশ্রয়পুষ্ট কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শান্তিভঙ্গের অভিযোগে নিরাপত্তা পরিষদ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যত হয় তখনই সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ইহার ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া নিরাপত্তা পরিষদকে ক্ষমতাহীন করে। স্বস্তিপরিষদের এই দুর্বলতার কারণেই ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে শান্তির প্রস্তাব উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া বিধিটি সাধারণ সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

(খ) নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী—Powers and Functions of the Security Council.

নিরাপত্তা পরিষদের নামকরণে ইহার কার্যের ইংগিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রাথমিক কর্তব্য ও দায়িত্ব হইল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। সনদ অনুসারে প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের কর্তব্য হইল পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি মানিয়া লওয়া ও কার্যকর করা।

কোন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাভঙ্গ প্রত্যাসন্ন হইলে নিরাপত্তা পরিষদ স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে পারে অথবা

জাতিপুঞ্জের যে-কোন সদস্য শান্তিভঙ্গের আশংকা ঘটিলে এ বিষয়ে পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে বা জাতিপুঞ্জের প্রধান কর্মসচিবও শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা ক্ষেত্রে বিষয়টি পরিষদের গোচরীভূত করিতে পারেন। জাতিপুঞ্জের সদস্য নয় এরূপ রাষ্ট্রও কোন বিরোধে জড়িত হইলে বিষয়টি পরিষদকে জানাইতে পারে।

১। উপরি-উক্ত উপায়ে কোন আন্তর্জাতিক বিরোধ সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হইলে নিরাপত্তা পরিষদ শান্তিমূলক পদ্ধতিতে অর্থাৎ আপস, শালিসী, পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা, বিচারালয়ের সাহায্য বা কাহারও মধ্যবর্তিতার সাহায্যে বিরোধের অবসান ঘটাইবার জন্য বিরোধী পক্ষগুলিকে আহ্বান জানাইতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের এই আহ্বান উপেক্ষিত হইলে, পরিষদ বিবদমান পক্ষগুলিকে অস্ত্র সংবরণ ও সৈন্য অপসারণ করিবার অনুরোধ জানাইতে পারে। এই অনুরোধ ব্যর্থ হইলে পরিষদ শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের পরিবর্তে অন্য উপায়ে চাপ সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে। পরিষদ জাতিপুঞ্জের সদস্যগণকে শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের সহিত সকল সম্পর্ক ও সংযোগ—রেল, পোষ্ট-টেলিগ্রাফ, জলপথ, আকাশপথ, বেতার প্রভৃতি ছিন্ন করিবার সুপারিশ করিতে পারে। এমন কি কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিবার সুপারিশও করিতে পারে।

২। শান্তি ও নিরাপত্তা পুনঃস্থাপনে উপরি-উক্ত শান্তিপূর্ণ উপায়গুলি বিফল হইলে নিরাপত্তা পরিষদ বলপ্রয়োগ উপায় অবলম্বন করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে পরিষদ শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী নিযুক্ত করিয়া শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক বলপ্রয়োগ নীতি প্রযুক্ত হইলে সদস্যগণের কর্তব্য হইল সৈন্য ও সমরসম্ভার দ্বারা পরিষদের কার্যে সাহায্য করা।

এস্থলে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদি কোন রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহা হইলে নিরাপত্তা পরিষদ যতদিন পর্যন্ত আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করে ততদিন পর্যন্ত আক্রান্ত রাষ্ট্রটির একক বা যৌথভাবে আত্মরক্ষা করিবার পূর্ণ অধিকার আছে। এই আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদকে আক্রান্ত রাষ্ট্রের পূর্ণ বিবরণ দান করিতে

হইবে। আক্রান্ত রাষ্ট্র আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেও নিরাপত্তা পরিষদের বিরোধ মীমাংসা করিবার ক্ষমতা কোন মতেই ক্ষুণ্ণ হয় না।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ সভার সহিত যুক্তভাবে স্বতন্ত্র ভোটদান পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ১৫ জন বিচারপতি নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হন। জাতিপুঞ্জের মহা-সচিব পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা কর্তৃক নিযুক্ত হন।

সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদের মধ্যে সম্পর্ক—Relation between the General Assembly and the Security Council.

রাষ্ট্রগুলিও আইনসভার ন্যায় জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা হইল বহু সদস্য লইয়া গঠিত একটি আলোচনা ও বিতর্ক সভা। অপর পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদ হইল কমসংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত জাতিপুঞ্জের শাসন কর্তৃপক্ষ।

সাধারণ সভা সম্মিলিতজাতিপুঞ্জের ক্ষমতাভুক্ত যে-কোন বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে। অপর পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান কর্তব্য হইল জগতের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। সনদ অনুসারে যে সমস্ত বিরোধের বিষয় নিরাপত্তা পরিষদের নিকট আনীত হয়, পরিষদ একমাত্র সেই সমস্ত বিরোধগুলির মীমাংসা করিতে পারে। অপর পক্ষে সাধারণ সভা নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক উপস্থাপিত বাৎসরিক বা বিশেষ বিবরণীগুলি পরীক্ষা করিতে পারিলেও নিরাপত্তা পরিষদ যে বিষয়গুলি সম্পর্কে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে, তাহার উপর সাধারণ সভার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। নিরাপত্তা পরিষদ অনুরোধ না করিলে যে বিরোধ মীমাংসা করিবার ভার নিরাপত্তা পরিষদ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে, সে বিরোধ সম্পর্কে সাধারণ সভা কোন সুপারিশ করিতে পারে না।

শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা নিরাপত্তা পরিষদের প্রাথমিক দায়িত্ব হইলেও সনদের ১২ ধারা অনুসারে সাধারণ সভারও কিছু দায়িত্ব আছে। কোন বিরোধ সম্পর্কে সাধারণ সভা আলাপ-আলোচনা করিয়া বিবরণী প্রস্তুত করিতে পারে। সনদের এই ধারার বলে সাধারণ সভা কোরিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করে।

কয়েকটি ক্ষেত্রে এই উভয়ের সহযোগিতাও দেখা যায়। নূতন সদস্য গ্রহণ,

সদস্য বহিষ্কার, মহা-সচিবের নিয়োগ, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতিগণের নিয়োগ ও জাতিপুঞ্জ সনদের সংশোধন প্রভৃতি ব্যাপার উভয়ের সম্মতি-সাপেক্ষ।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব হইল নিরাপত্তা পরিষদের আর এ বিষয়ে সাধারণ সভার দায়িত্ব হইল গৌণ। কিন্তু বৃহৎ পঞ্চশক্তির ভিটো প্রয়োগ ক্ষমতা দ্বারা পরিষদের প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করা প্রায় অসম্ভব হইয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদের এই দুর্বলতা ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে সাধারণ সভা কর্তৃক গৃহীত শান্তির প্রস্তাব উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া (Uniting for Peace Resolution) কার্যক্রমটি দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে। শান্তি ও নিরপত্তা রক্ষাকল্পে উভয়ের সহযোগিতা অপরিহার্য।

নিরাপত্তা পরিষদের মূল্যায়ন—Appraisal of the Security Council.

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শক্তিশালী ও সক্রিয় অঙ্গ হইল-নিরাপত্তা পরিষদ। এই পরিষদের প্রথম দায়িত্ব হইল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। এ ক্ষেত্রে পরিষদের দায়িত্ব বলিতে কার্যতঃ নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচজন স্থায়ী সদস্যের দায়িত্ব বুঝায়—কারণ আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসা ক্ষেত্রে কোন কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করিতে হইলে বৃহৎ পঞ্চশক্তির এ বিষয়ে একমত হইতে হইবে। কোন এক সদস্য ভিটো প্রয়োগ করিলে অর্থাৎ প্রস্তাবিত পন্থা অবলম্বনে অসম্মতি প্রকাশ করিলে নিরাপত্তা পরিষদ কোন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে না।

৩। আন্তর্জাতিক বিচারালয়—The International Court of justice.

আন্তর্জাতিক বিচারালয় হইল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিচার-বিভাগীয় অঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে এই বিচারালয় হইল অধুনালুপ্ত জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যে আন্তর্জাতিক বিচারালয় গঠিত হইয়াছিল তাহারই উত্তরাধিকারী। পূর্বতন আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের উত্তরাধিকারী হইলেও এই বিচারালয় পূর্বতন বিচারালয়ের

ন্যায় একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠান নহে। ইহা জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জাতিপুঞ্জের সনদে লিখিত বিধি-উপবিধিগুলির দ্বারা এই নূতন বিচারালয়ের কার্যাবলী পরিচালিত হয়।

(ক) সংগঠন, যোগ্যতা ও কার্যকাল - Organisation, Qualifications and Duration.

পনের জন বিচারপতি লইয়া এই বিচারালয় গঠিত। সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদ পৃথক্ ভাবে ভোটদান করিয়া নিরংকুশ সংখ্যাধিক্যের ভোটে বিচারপতিগণকে নির্বাচিত করেন। বিচারপতিগণের গুণ ও যোগ্যতা আদৌ জাতিভিত্তিক নহে। বিচারপতিরূপে নির্বাচিত হইতে গেলে বিচার-পতিপদপ্রার্থীর উচ্চ মানের নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া চাই এবং তাহার স্বদেশের উচ্চতম বিচারলয়ের বিচারপতি হওয়ার যোগ্যতা থাকা চাই অথবা অবধারিত আন্তর্জাতিক আইনবিশেষজ্ঞ হওয়া চাই, তবে নির্বাচন-কালে নির্বাচকমণ্ডলীকে মনে রাখিতে হইবে বিচারপতি নির্বাচন ব্যাপারে যেন পৃথিবীর প্রধান প্রধান সভ্যতাগুলি ও প্রধান প্রধান আইন ব্যবস্থাগুলির প্রতিনিধিত্ব প্রতিফলিত হয়। একই দেশের দুইজন বিচারপতি যাহাতে এক সঙ্গে নির্বাচিত না হইতে পারেন সেদিকেও নির্বাচকমণ্ডলীর লক্ষ্য রাখিতে হয়।

বিচারপতিগণ নয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। কার্যকাল অবসানের পূর্বে কোন বিচারপতির পদ কোন কারণে শূন্য হইলে কার্যকালের অবশিষ্টাংশের জন্য নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচজন বিচারপতির পদ প্রতি তিন বৎসর অন্তে পূরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক বিচারালয় তিন বৎসরের জন্য একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করে এবং এই উভয়েই পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। বিচারালয় একজন কর্মসচিব (Registrar) অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করে। বিচারবিভাগীয় অবকাশ ব্যতীত অন্য সকল সময়ের বিচারালয়ের অধিবেশন চলে। বিচারালয়ের কার্য যাহাতে দ্রুত পরিচালিত হয় তদুদ্দেশ্যে পাঁচজন বিচারপতি লইয়া এক বৎসরের জন্য একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয়। নয়জন বিচারপতি উপস্থিত থাকিলেই বিচার কার্য পরিচালিত হইতে পারে। দুইটি

দেশের বিরোধের বিচারক্ষেত্রে যদি একটি দেশের একজন বিচারপতি থাকেন তাহা হইলে অপর বিরোধী দেশও বিচারকালে একজন নিজ বিচারপতি দিতে পারে।

(খ) বিচারপতিগণের সুযোগ-সুবিধা—**Privileges of Judges.**

কোন বিচারপতিকেই অন্য সমুদয় বিচারপতির সর্বসম্মত মত ব্যতীত পদচ্যুত করা যায় না। বিচারপতিগণ কূটনৈতিক সুবিধা ও নিষ্কৃতি পাইয়া থাকেন। বিচারালয়ের বিচারপতিগণ বেতনভুক ও সভাপতি ও সহ-সভাপতি অতিরিক্ত দৈনিক ও বাৎসরিক ভাতা পাইয়া থাকেন। তবে কোন বিচার-পতি কোন রাজনৈতিক ও শাসন-সংক্রান্ত কার্যে লিপ্ত হইতে পারেন না বা কোন বিচারক্ষেত্রে আইনজীবী অথবা পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করিতে পারেন না।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের এক্তিয়ার ও ক্ষমতা—Jurisdiction and Competence of the International Court of Justice.

জাতিপুঞ্জের সকল সদস্য এই বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হইতে পারেন। তবে জাতিপুঞ্জে যোগদান করিলেও যেহেতু রাষ্ট্রগুলি তাহাদের সার্বভৌমিকতা ক্ষুণ্ণ হইতে দেয় নাই, সেইহেতু কোন সদস্যরাষ্ট্রকে ইহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই বিচারালয়ের এক্তিয়ারভুক্ত করা সম্ভব নয়। অভিযুক্ত রাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই বিচারালয় কোন রাষ্ট্র কর্তৃক আনীত অভিযোগের বিচার করিতে পারে না। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভার অনুমোদন সদস্য-পদ-বিহীন রাষ্ট্রও এই বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হইতে পারে। সুতরাং এই বিচারালয়ের কোন বাধ্যতামূলক এক্তিয়ার (Compulsory jurisdiction) নাই।

বিবদমান সদস্যরাষ্ট্রগুলি এই বিচারালয়ের বাধ্যতামূলক এক্তিয়ারভুক্ত হইতে সম্মত হইলে আন্তর্জাতিক বিচারালয় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিচার করিতে পারে।

(১) কোন চুক্তির ব্যাখ্যা,

(২) আন্তর্জাতিক আইন-সম্পর্কিত প্রশ্ন,

(৩) যে তথ্য প্রমাণিত হইলে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের কর্তব্য ভঙ্গ হয়,

(৪) দায়িত্ব পালনে কর্তব্য ভঙ্গের ক্ষতিপূরণের প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারণ।

যে সকল সদস্যরাষ্ট্র বিচারালয়ের বাধ্যতামূলক এক্তিয়ারভুক্ত হয় তাহারা শর্তহীনভাবে অথবা একাধিক রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে স্থায়িভাবে অথবা সাময়িকভাবে এই বিচারালয়ের এক্তিয়ারভুক্ত হইতে পারে।

(ক) বিচারালয়ের পরামর্শদানকার্য—Advisory Functions.

সাধারণ সভা অথবা নিরাপত্তা পরিষদ অনুরোধ করিলে এই বিচারালয় আইন সম্পর্কিত ব্যাপারে পরামর্শ দান করিতে পারে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশেষীকৃত শাখাগুলিও বিচারালয়ের পরামর্শ চাহিতে পারে।

হল্যাণ্ড দেশের হেগ শহরে এই বিচারালয় অবস্থিত। কিন্তু অন্যত্রও ইহার অধিবেশন বসিতে পারে।

৪। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ - The Economic and Social Council.

১। সংগঠন, অধিবেশন ও কার্যকাল—Organisation, Session and Duration.

বর্তমানে ২৭ জন সদস্য লইয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গঠিত। সদস্যগণ সাধারণ সভা কর্তৃক তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। কার্যকাল শেষ হইলে ইঁহারা পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। এই পরিষদের ৯ জন সদস্য প্রতি বৎসর নির্বাচিত হন।

পরিষদ একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করে এবং ইহার নিজস্ব কার্যপদ্ধতি প্রণয়ন করে। বৎসরে এই পরিষদের দুইটি নিয়মিত অধিবেশন বসে। প্রয়োজনক্ষেত্রে বিশেষ অধিবেশনও আহ্বান করা যায়। প্রত্যেক সদস্য একটি করিয়া ভোটদান করিতে পারে এবং পরিষদের সিদ্ধান্তগুলি উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যগণের সংখ্যাধিক্যে গৃহীত হয়।

২। পরিষদের উদ্দেশ্য—Purpose of the Council.

নিরাপত্তা পরিষদের উদ্দেশ্য হইল জগৎবাসীকে যুদ্ধের আতংক হইতে মুক্ত করা আর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উদ্দেশ্য হইল মানব জাতিকে অভাব-অনটনের ভয়মুক্ত করা। দেশের অভ্যন্তরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক

বৈষম্য যেরূপ বিপ্লবের কারণ হয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও জাতিগুলির মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য তদ্রূপ আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের কারণ হয়। এই কারণ দূর করিবার উদ্দেশ্যেই জাতিপুঞ্জ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, কৃষ্টিমূলক ও মানবিক সমস্যাগুলি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সাহায্যে সমাধানকল্পে এই পরিষদ গঠন করিয়াছে। মানবিক অধিকার ও মূল স্বাধীনতাগুলির প্রতি যাহাতে সকল জাতিই শ্রদ্ধাবান হয়, সেইজন্যও এই পরিষদ প্রচেষ্টা করে।

৩। পরিষদের ক্ষমতা ও কার্য—Powers and Functions of the Council.

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুসারে পরিষদের উপর নিম্নলিখিত কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে :—

(ক) জীবিকার মান উন্নয়ন, পূর্ণ কর্মসংস্থান ব্যবস্থা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন,

(খ) আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ও সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির সমাধান এবং কৃষ্টি ও শিক্ষামূলক বিষয়ে সহযোগিতার ব্যবস্থা,

(গ) জাতি-ধর্ম-ভাষা-স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে মানবিক অধিকারগুলি ও মূল স্বাধীনতাগুলির প্রতি সর্বব্যাপী শ্রদ্ধা ও ইহাদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা।

উপরি-উক্ত কার্যগুলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পরিষদ নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিয়াছেন।

(ক) পরিষদ প্রত্যক্ষভাবে অথবা বিশেষজ্ঞ সাহায্যে ইহার কর্তব্য সম্পর্কিত ব্যাপারের তথ্য আহরণ করে এবং বিবরণী প্রস্তুত করে।

(খ) বিবরণী প্রস্তুত হইলে পরিষদ সমস্যা সম্পর্কে সাধারণ সভার নিকট বা সদস্যরাষ্ট্রের নিকট বা বিশেষীকৃত শাখাগুলির নিকট সমস্যা সম্পর্কে সুপারিশ করে।

(গ) পরিষদ পূর্বে সাধারণ সভা কর্তৃক ইহার সুপারিশগুলি অনুমোদিত করাইয়া সুপারিশগুলি যাহাতে গৃহীত ও বলবৎ করা হয় তজ্জন্য সদস্যরাষ্ট্রগুলির নিকট পাঠাইতে পারে।

(ঘ) সদস্যরাষ্ট্রগুলি পরিষদের সুপারিশ কার্যকর করিবার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে তৎসম্পর্কে পরিষদ সদস্যরাষ্ট্রগুলির নিকট হইতে একটি

বিবরণী দাবী করিতে পারে। সদস্যরাষ্ট্র কর্তৃক প্রেরিত বিবরণী পরিষদ ইহার মন্তব্যসহ সাধারণ সভার নিকট প্রেরণ করে।

(ঙ) নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে পরিষদকে নিরাপত্তা পরিষদেও তথ্য সরবরাহ করিতে হয়।

৪। পরিষদের বিভিন্ন সংস্থা—Commissions of the Council.

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ইহার কার্যগুলি দুই জাতীয় সংস্থার মাধ্যমে সম্পাদন করে, যথা, (১) কার্য সম্বন্ধীয় সংস্থা (Functional Commissions) ও (২) আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক সংস্থা (Regional Commissions)। কার্য সম্বন্ধীয় সংস্থাগুলি হইল—অর্থ নৈতিক ও কর্ম-সংস্থান সংস্থা, মানবিক অধিকার সংস্থা, স্ত্রীলোকের সামাজিক পদমর্যাদা সংস্থা। অপর পক্ষে ইউরোপের জন্য অর্থ নৈতিক সংস্থা, এসিয়া ও পূর্ব প্রাচ্যের জন্য অর্থ নৈতিক সংস্থা, ইত্যাদি হইল আঞ্চলিক সংস্থা। এতদ্ব্যতীত স্থায়ী কেন্দ্রীয় অহিফেন্ বোর্ড, আন্তর্জাতিক শিশুদের জন্য আকস্মিক তহবিল প্রভৃতি কতিপয় স্থায়ী সংস্থাও আছে।

৫। পরিষদের মূল্যায়ন—Appraisal of the Council.

অভাব-অনটন ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করিয়া পরোক্ষভাবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা হইল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সফল হইলে জাতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতা স্থাপিত হইয়া যুদ্ধের একটি মূল কারণ দূরীভূত হইবে। সুতরাং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে এরূপ একটি পরিষদের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই পরিষদের সংগঠন ও কার্য-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, এই পরিষদ নানাজাতীয় বহু শাখা ও উপ-শাখা লইয়া গঠিত। তথ্য আহরণ, গবেষণা, বিবরণী প্রণয়ন ও বিবরণী আলোচনা প্রভৃতি কার্যে ইহার সময় অতিবাহিত হয়। শেষ পর্যন্ত এই পরিষদের ক্ষমতা পরামর্শ দানে সীমাবদ্ধ।

৫। **অছি-পরিষদ—The Trusteeship Council.**

পূর্বতন জাতিসংঘের অধীনে ক্ষুদ্র ও অনগ্রসর দেশগুলির উপর কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধান করিবার জন্য কতিপয় রাষ্ট্রকে ভার দেওয়া হয়। বর্তমান সম্মিলিত

জাতিপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত অছি-পরিষদ হইল সেই পূর্বতন ব্যবস্থার একটি পরিবর্তিত রূপ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানী, তুরস্ক প্রভৃতি বিজিত শক্তিবর্গের উপনিবেশগুলির শাসনভার জাতিসংঘ স্বয়ং গ্রহণ করে। কিন্তু কার্যতঃ এই শাসনভার জাতিসংঘ পুনরায় ইংলণ্ড, ফরাসীদেশ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বিজেতা শক্তিবর্গের হস্তে ন্যস্ত করে। জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার সময় এই কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানকারী রাষ্ট্রগুলির সদস্য লইয়া অছি-পরিষদ নামে নূতন একটি সংস্থা গঠিত হয়। অছি-পরিষদের হস্তে তিন জাতীয় স্থানের কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানভার জাতিপুঞ্জ কর্তৃক ন্যস্ত করা হয়। ১। পূর্বতন ব্যবস্থার অবশিষ্টাংশ, ২। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজিত দেশগুলির কিছু উপনিবেশ ও ৩। যে সমস্ত অঞ্চল স্বেচ্ছায় এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইল।

১। সংগঠন ও কার্য-পদ্ধতি—Organisation and Procedure.

নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যগণ, অছি-শাসনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলি ও সাধারণ সভা কর্তৃক তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত অছি-শাসনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলির সমান সংখ্যক সদস্য লইয়া এই পরিষদ গঠিত।

অছি-পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের একটি ভোটদান ক্ষমতা আছে। উপস্থিত ও ভোটদানকারী সংখ্যাধিক্যের সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরিষদ একজন সভাপতি নির্বাচন করে এবং ইহার কার্য-পদ্ধতি সম্পর্কে নিয়মাবলী রচনা করে। বৎসরে এই পরিষদের দুইটি অধিবেশন বসে।

২। কার্য ও ক্ষমতা—Powers and Functions.

সাধারণ সভার অধীনে পরিষদ নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পাদন করিতে পারে :—

(ক) অছি-শাসনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্র কর্তৃক উপস্থাপিত বিবরণী বিবেচনা করা।

(খ) আবেদনপত্র গ্রহণ করা ও অছি-শাসনের ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া আবেদনপত্র বিবেচনা করা।

(গ) অছি-শাসন কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মধ্যে অছি-শাসনভুক্ত স্থানগুলি পরিদর্শন করা।

(ঘ) অছি ব্যবস্থার নিয়মানুযায়ী আরও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

অছি-শাসনের অধীন ১১টি দেশের মধ্যে ৯টি স্বাধীনতা লাভ করিতে

সমর্থ হইয়াছে। অবশিষ্ট দুইটির ভাগ্যও শীঘ্রই নির্ধারিত হইবে। ইহার ফলে বর্তমানে বৃটেন, ফরাসী দেশের অধীনে কোন অছি-শাসন নাই। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীন দুইটি অছি-শাসন বর্তমান। সুতরাং নিরাপত্তা পরিষদের যে পাঁচজন স্থায়ী সদস্য অছি-পরিষদের সদস্য আছেন তন্মধ্যে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইল অছি-শাসনের ভারপ্রাপ্ত। অপর চারিটি রাষ্ট্র অছি-শাসন-বিহীন। সুতরাং একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপর দিকে অন্য চতুঃশক্তির মধ্যে ভারসাম্যের অভাবে ভবিষ্যতে বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

৬। আন্তর্জাতিক মহাকরণ—The Secretariat.

মহাসচিবের নেতৃত্বে এই আন্তর্জাতিক মহাকরণ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন করে। প্রায় সাড়ে ছয় হাজার কর্মচারী লইয়া এই মহাকরণ গঠিত। মহাসচিব ব্যতীত আরও চব্বিশ জন অতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে এই বিশাল মহাকরণের কার্য পরিচালিত হয়। সাধারণ সভা কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী মহাসচিব এই সমুদয় কর্মচারী নিয়োগ করেন। সদস্যরাষ্ট্রগুলির নাগরিকগণই এই মহাকরণে নিযুক্ত হইতে পারেন। তবে এই মহাকরণে মার্কিন নাগরিকগণের সংখ্যাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। অতি উচ্চমানের যোগ্যতা ও সততাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকেই নিযুক্ত করা হয়। কর্মচারিবৃন্দের আন্তর্জাতিক মনোভাবাপন্ন হইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতি প্রধান আনুগত্য প্রকাশ করিতে হয়।

মহাকরণের কার্য সাতটি পৃথক্ বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়। বিভাগগুলি হইল :—

১। নিরাপত্তা পরিষদ বিষয়-সংক্রান্ত বিভাগ।

২। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বিষয়-সংক্রান্ত বিভাগ।

৩। অছি-পরিষদ ও স্বায়ত্তশাসন-বিহীন অঞ্চলগুলির তথ্য-সংক্রান্ত বিভাগ।

৪। আইন সম্বন্ধীয় বিভাগ।

৫। সম্মেলন ও সাধারণ কার্য বিভাগ।

৬। শাসন ও অর্থ-সংক্রান্ত বিভাগ।

৭। তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ বিভাগ।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে অসংখ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেই সভাগুলির ব্যবস্থা মহাকরণের কর্মচারিবৃন্দ করে। সভায় উপস্থিত থাকিয়া সভার বিবরণী লিপিবদ্ধ করা, অনুবাদ করা ও রাষ্ট্রীয় সরকারগুলির সহিত সংযোগ স্থাপন এই কর্মচারিবৃন্দকেই করিতে হয়। ইহা ছাড়া, নানাজাতীয় তথ্য, সংবাদ, দলিল প্রভৃতি প্রকাশ করা, সম্পাদিত চুক্তিগুলি বিধিবদ্ধ করা, আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করা এবং জাতিপুঞ্জের অন্যান্য শাখাগুলি কর্তৃক ন্যস্ত কার্য সম্পাদন করাও এই কর্মচারিবৃন্দের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

মহাসচিব—The Secretary-General.

মহাসচিব হইলেন মহাকরণের অধিকর্তা। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ ক্রমে সাধারণ সভা কর্তৃক তিনি নিযুক্ত হন। তাঁহার কার্যকাল পাঁচ বৎসর। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্থাপনের পর বর্তমানে চতুর্থ মহাসচিব নিযুক্ত আছেন। জাতিপুঞ্জ মহাসচিবের কার্যকাল বৃদ্ধি করিতে পারে।

মহাসচিবের প্রধান কার্য হইল :—

১। নিরাপত্তা পরিষদ, সাধারণ সভা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি-পরিষদ কর্তৃক যে যে কার্যভার মহাসচিবের উপর অর্পণ করিবে, মহাসচিব পরিষদগুলির সভায় সেই সেই কার্যগুলি সম্পাদন করিবেন।

২। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্য সম্পর্কে তিনি সাধারণ সভায় বাৎসরিক বিবরণী প্রদান করেন।

৩। তিনি যদি মনে করেন যে, কোন কারণে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার আশংকা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইলে এ বিষয়ে তিনি নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন।

৪। নিরাপত্তা পরিষদের সংখ্যাধিক্য সদস্যগণের অনুরোধে তিনি সাধারণ সভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন।

৫। মহাসচিবের প্রধান দায়িত্ব হইল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যে রূপদান করা এবং বলা যায় যে, মহাসচিবের নিরপেক্ষতা, ন্যায়-নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতার উপর জাতিপুঞ্জের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশেষীকৃত শাখাসমূহ— The Specialised Agencies of the United Nations.

বিশ্ব-মানবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষীকৃত শাখা-সমূহ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই শাখাগুলি সম্পর্কে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অংগও নহে, অধীনও নহে। ইহার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনশীল এবং নিজস্ব সনদ দ্বারা প্রত্যেকটি শাখার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যগণ এই শাখাগুলির সদস্য নাও হইতে পারেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে এই শাখাগুলির উল্লেখ থাকিলেও এইগুলি রাষ্ট্রীয় সরকারগুলির সম্মতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তবে এই বিশেষীকৃত শাখাগুলি জাতিপুঞ্জের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং জাতিপুঞ্জের সহিত একযোগে কাজ করে।

বিশেষীকৃত শাখাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

১। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কৃষ্টিমূলক সংস্থা— United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (U. N. E. S. C. O.)

উদ্দেশ্য—Purpose

ফরাসী ও বৃটিশ সরকারের অনুপ্রেরণায় এই সংস্থা গঠিত হয় এবং ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর হইতে ইহার গঠনতন্ত্র কার্যকর হয়। এই সংস্থার প্রস্তাবনায় ইহার উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, যেহেতু মানুষের মনেই প্রথম দ্বন্দ্বের সূচনা হয়, সেইহেতু মানুষের মনেই শান্তি প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গড়িতে হইবে ("That since war begins in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed.")। জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক পরিচয়ের অজ্ঞতাই হইল পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহের কারণ। সন্দেহ ও অবিশ্বাস হইল বিদ্বেষের জন্মদাতা এবং শেষ পর্যন্ত এই অজ্ঞতা-প্রসূত বিদ্বেষ জাতিগুলির মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ বিস্তার করে। সুতরাং যুদ্ধের কারণ দূর করিতে হইলে মানুষের মন হইতে সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করিতে হইবে। জাতিগুলির মধ্যে শিক্ষামূলক,

কৃষ্টিমূলক ও বিজ্ঞান-বিষয়ক আদান-প্রদান সাহায্যে সহযোগিতা সৃষ্টি দ্বারা পারস্পরিক অবিশ্বাসের মনোভাব দূর করিতে পারিলে শান্তির পরিবেশ সম্ভব হয়।

সংগঠন—Organisation

জাতিপুঞ্জের সকল সদস্যেরই এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হইবার অধিকার আছে। জাতিপুঞ্জের সদস্য নহে এরূপ রাষ্ট্রও এই সংস্থার কার্যকরী বোর্ডের (Executive Board) সুপারিশক্রমে ইহার সাধারণ সম্মেলনের (General Conferenee) ⅔ সংখ্যাধিক্য ভোটে সদস্য নির্বাচিত হইতে পারে।

সাধারণ সম্মেলন, কার্যকরী বোর্ড ও মহাকরণ—এই তিনটি বিভাগ দ্বারা এই সংস্থার কার্য পরিচালিত হয়।

কার্যকলাপ—Function

(ক) জাতিগুলির মধ্যে চুক্তি সম্পাদন সাহায্যে গণসংযোগ বৃদ্ধি করিয়া ভাবের ও আদর্শের বিনিময়ের ব্যবস্থা করা। এই ব্যবস্থার দ্বারা পারস্পরিক পরিচয় ও বুঝাপড়া সম্ভব করা।

(খ) সদস্যগণের অনুরোধে সদস্যগণের সহযোগিতার ভিত্তিতে শিক্ষা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে জনশিক্ষা ও কৃষ্টি প্রসার করা, সকল জাতির স্ত্রী-পুরুষের জন্য সমান শিক্ষার সুযোগ দান করা এবং জগতের শিশুগণ যাহাতে তাহাদের স্বাধীনতার দায়িত্ব বহন করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব করা।

(গ) অর্জিত জ্ঞান রক্ষা করা, বৃদ্ধি করা ও প্রচার করা।

২। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা—International Labour Organisation (I. L. O.)

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এই সংস্থা গঠিত হয় এবং জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহা জাতিসংঘের সহিত সম্পর্কিত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে-কোন সদস্য এই সংস্থার শর্ত মানিয়া লইলে ইহার সদস্য হইতে পারে। জাতিপুঞ্জের সদস্য নয় এরূপ রাষ্ট্রও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার সাধারণ সম্মেলনের অনুমোদনে ইহার সদস্য হইতে পারে।

উদ্দেশ্য – Purpose

পৃথিবীর সকল শ্রমিকের উচ্চ মানের জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করা এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। সমান সুযোগ ও সম্মানের ভিত্তিতে কাজ করিয়া যাহাতে সকল শ্রমিকই তাহার অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হয়, সেই পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করা এই সংস্থার মুখ্য কাজ। এই উদ্দেশ্য সাধনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সংস্থা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতিগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করে এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে এ সম্পর্কে সুপারিশ করে।

কার্য – Functions

(ক) পূর্ণ কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

(খ) যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী শ্রমিকগণকে উপযুক্ত কাজে নিয়োগ দ্বারা শ্রমের পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা সুনিশ্চিত করা।

(গ) শ্রমিকের শিক্ষার উন্নতি ও গতিশীলতা বৃদ্ধির সাহায্যে উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করা।

(ঘ) পারিশ্রমিকের পরিমাণ, কার্যকালের সময় প্রভৃতি নির্ধারণ সাহায্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের ন্যূনতম পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা।

(ঙ) শ্রমিকগণের যৌথভাবে দর কষাকষি (Collective Bargaining) করিবার অধিকার ও সর্ববিষয়ে শ্রমিক-মালিক সহযোগিতা স্থাপনে সাহায্য করা।

(চ) সকল প্রকার কাজে শ্রমিকদের জীবনের ও স্বাস্থ্যের উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা।

(ছ) শিশুমঙ্গল ও মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠা করা এবং পুষ্টিকর খাদ্য, উপযুক্ত বাসস্থান ও অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা করা।

(জ) সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুনিশ্চিত করা।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার তিনটি বিভাগ আছে। প্রথমটি হইল আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন। ইহা শ্রমিক, মালিক ও সদস্যরাষ্ট্রগুলির সরকারের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। দ্বিতীয়টি হইল আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার পরিচালকমণ্ডলী আর তৃতীয়টি হইল আন্তর্জাতিক শ্রমিক কার্যালয়।

৩। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা—World Health Organisation (W. H. O.)

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার জন্ম হয় এবং প্রতি বৎসর এই দিনটি বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস বলিয়া পালিত হয়। জাতিপুঞ্জ সদস্য ব্যতীতও অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরিষদের সংখ্যাধিক্যের ভোটে সদস্য হইতে পারে। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রকেই সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত উন্নয়নকার্য এবং এই সংস্থার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সুপারিশগুলি বলবৎ করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়াছে, সে সম্পর্কে বার্ষিক বিবরণী বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থায় উপস্থাপিত করিতে হয়।

উদ্দেশ্য—Purpose

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যের অর্থ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, স্বাস্থ্যের অর্থ শুধু ব্যাধিমুক্তি বা দুর্বলতার অভাব নহে। স্বাস্থ্যের অর্থ হইল পূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণ। সকল মানুষেরই নির্বিচারে সর্বোচ্চ মানের স্বাস্থ্যের অধিকারী হইবার দাবি আছে। শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মৌলিক উপাদান হইল সকল মানুষের স্বাস্থ্য অর্থাৎ সকলের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণ। সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণেই বিরোধের অবসান ঘটে। শিশুস্বাস্থ্যের উন্নয়ন হইল প্রাথমিক গুরুত্বসম্পন্ন কর্তব্য। জনগণের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন হইল সরকারের পবিত্র কর্তব্য এবং এই উদ্দেশ্যে সরকারের উপযুক্ত সামাজিক ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণ অবশ্য করণীয়।

কার্য—Functions

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নানাবিধ কার্য সম্পাদন করিতে হয়। এই কার্যগুলি সম্পাদনের জন্য ইহার জাতিপুঞ্জ ও অন্যান্য বিশেষীকৃত শাখাগুলি, রাষ্ট্রীয় সরকার এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত সংস্থাগুলির সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে হয়।

(ক) আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত কাজ নিয়ন্ত্রণ করা ও কাজগুলির মধ্যে সংযোগ সাধন করা।

(খ) কোন সরকার অনুরোধ করিলে স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত ব্যবস্থা শক্তিশালী করিতে সাহায্য করা এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে,

(গ) সরকারগুলির অনুরোধে স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞান, কলা-কৌশল ও অন্য প্রকারে সাহায্য দান করা।

(ঘ) সর্বপ্রকারের ব্যাধি নির্মূল করিবার প্রচেষ্টায় উৎসাহ ও সাহায্য দান করা।

(ঙ প্রয়োজনক্ষেত্রে অন্যান্য সংগঠনের সহযোগিতায় পুষ্টি, স্বাস্থ্য, বাস-গৃহ, অবসর বিনোদন প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

(চ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য-বিষয়ক শাস্ত্রের শিক্ষার মান উন্নয়ন করা।

(ছ) মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও সামগ্রিক কল্যাণ বৃদ্ধি করা এবং পরিবর্তন-শীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার শক্তি অর্জনে উৎসাহ দান করা।

অন্যান্য বিশেষীকৃত শাখাগুলির মত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কাজও তিনটি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়।

৪। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা Food and Agricultural Organisation (F. A. O.)

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে এই সংস্থাটি গঠিত হয় এবং পরবর্তী বৎসরে জাতিপুঞ্জের সহিত সম্পর্কিত হয়। ৪৪ জন সদস্য লইয়া এই সংস্থা প্রথম গঠিত হয়। এই সংস্থার সম্মেলনের ⅔ সংখ্যাধিক্য ভোটে নূতন সদস্য গ্রহণ করা যায়। রোম শহরে ইহার প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।

উদ্দেশ্য—Purpose

(ক) প্রত্যেক রাষ্ট্রের অধীন জনসমূহের পুষ্টি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

(খ) খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা।

(গ) পল্লীবাসিগণের অবস্থার উন্নতি সাধন করা।

কার্যাবলী—Functions

(ক) মৎস্য, অন্যান্য জলজাত দ্রব্য, বনসম্পদসহ কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে তথ্য ও সংবাদ আহরণ, বিশ্লেষণ ও প্রচার করা।

(খ) খাদ্য, কৃষি ও পুষ্টি বিষয়ে সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ধরণের গবেষণা পরিচালনা করা।

(গ) প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঘ) বিক্রয় ও বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।

(ঙ) উপযুক্ত পরিমাণ কৃষি ঋণদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণ।

(চ) রাষ্ট্রীয় সরকারগুলি অনুরোধ করিলে খাদ্য, কৃষি ও পুষ্টি সম্পর্কে সরকারগুলিকে সর্বপ্রকার সাহায্যদান।

এ সংস্থার কাজও তিনটি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়।

৫। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল — International Monetary Fund (I. M. F.)

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এই সংস্থাটি গঠিত হয়। বর্তমানে শতাধিক রাষ্ট্র এই সংস্থার সদস্যভুক্ত। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের একজন প্রতিনিধি লইয়া এই সংস্থার সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পরিচালক সভা (Poard of Governors) গঠিত। ২০ জন সদস্য লইয়া ইহার একটি কার্যকরী অধিকর্তামণ্ডলী (Executive Directors) আছে। অধিকর্তামণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত একজন কর্মকর্তা পদাধিকারবলে (Managing Director) এই সংস্থার দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করেন।

এই সংস্থার উদ্দেশ্য হইল আন্তর্জাতিক আর্থিক সমস্যা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুষম প্রসার ও বৃদ্ধির সাহায্যে অধিক পরিমাণ কর্মসংস্থান ও প্রকৃত আয় বৃদ্ধি করা। আন্তর্জাতিক বিনিময় হার স্থিরীকরণ দ্বারা মূল্যমান অপরিবর্তিত রাখিতে এই সংস্থা সাহায্য করে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে দেনা-পাওনার অসাম্য দূর করিবার জন্য এই সংস্থা সদস্যগণকে ঋণ দান করে।

৬। পুনর্গঠন ও উন্নয়নমূলক আন্তর্জাতিক ব্যাংক (বিশ্বব্যাংক) —International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর ২৮টি রাষ্ট্রের চুক্তির ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংক

প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ইহা জাতিপুঞ্জের একটি বিশেষীকৃত শাখা-ভুক্ত হয়।

৬৮টি সদস্যরাষ্ট্র লইয়া এই ব্যাংক গঠিত হয় ও পরবর্তী কালে ইহার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া শতাধিক হইয়াছে। এই ব্যাংকের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ২২,৪২০ মিলিয়ন পাউণ্ড এবং ইহার প্রতিটি শেয়ারের মূল্য হইল ১০০,০০০ ডলার। ওয়াশিংটন নগরে এই ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।

উদ্দেশ্য—Purpose

সদস্যগণের যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলির পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য সাহায্য করা বিশ্বব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য। দীর্ঘমিয়াদী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুষম বৃদ্ধি দ্বারা আন্তর্জাতিক লেন-দেনের সমতা রক্ষা করিবার জন্যও এই ব্যাংক সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য দান করে।

পুনর্গঠন ও উন্নয়ন কার্যের জন্য ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক ১০০টি রাষ্ট্রকে প্রায় ৯,৩১২ মিলিয়ন পাউণ্ড ধার দেয়। এসিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিকে এই ব্যাংক রেল, জাহাজ-পরিবহন, বন্দর নির্মাণ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বহু পরিমাণে সাহায্য দান করিয়াছে। ভারতকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাংক একটি বিশেষ সমিতি (Aid India Consortium) গঠন করে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধুনদীর জল বণ্টন-ব্যবস্থা বিশ্বব্যাংক কর্তৃক মীমাংসিত হয়।

৭। আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা—International Finance Corporation.

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে এই সংস্থাটি গঠিত হয় এবং ইহা বিশ্বব্যাংকের অধীনে কাজ করে। বিনা জামিনে এই সংস্থা বে-সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত শিল্প-ব্যবসায়ে ঋণদান করে। লৌহ-ইস্পাত, বয়ন, কাগজ প্রভৃতি শিল্প-উন্নয়নের জন্য এই সংস্থা ৩৮টি দেশের শতাধিক প্রতিষ্ঠানে ১৯২'৪ মিলিয়ন পাউণ্ড ঋণদান করিয়াছে।

উপরি-উক্ত সংস্থাগুলি ব্যতীতও জাতিপুঞ্জের সহিত সম্পর্কিত আরও

কতিপয় সংস্থা আছে। যথা, (৮) আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা, (৯) আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, (১০) আন্তর্জাতিক বে-সামরিক বিমান চলাচল সংস্থা, (১১ বিশ্ব আবহবিদ্যা সংস্থা প্রভৃতি।

জাতিপুঞ্জ সনদের সংশোধন—Amendment of the Charter of the U. N.

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে সনদ সংশোধন করিবার নিম্নলিখিত পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে।

১। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সকল সদস্যের একটি সাধারণ সম্মেলন নিরাপত্তা পরিষদের যে-কোন সাতজন সদস্য ও সাধারণ সভার ⅔ সংখ্যাধিক্য দ্বারা নির্ধারিত দিনে ও নির্ধারিত স্থলে আহুত হইয়া সনদ পরিবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে।

২। সাধারণ সম্মেলন কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব সম্মেলনের ⅔ সংখ্যাধিক্য দ্বারা অনুমোদিত হইলে উক্ত সংশোধনী প্রস্তাব যদি নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচজন স্থায়ী সদস্যসহ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ⅔ সংখ্যক সদস্যের সম্মতি লাভ করে একমাত্র তাহা হইতেই উত্থাপিত প্রস্তাব কার্যকর হয়।

৩। সনদ বলবৎ হইবার পর সাধারণ সভার দশম বার্ষিক অধিবেশনের মধ্যে যদি এরূপ সম্মেলন অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে সম্মেলন আহ্বান করিবার প্রস্তাব সাধারণ সভার অধিবেশনের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া সভায় পুনরায় উপস্থাপিত করিতে হইবে। যদি সম্মেলন আহ্বান করিবার প্রস্তাব সাধারণ সভার সংখ্যাধিক্য ভোটে ও নিরাপত্তা পরিষদের যে-কোন সাত জন সদস্যের দ্বারা অনুমোদিত হয় তাহা হইলে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, জাতিপুঞ্জের সনদ সহজ-পরিবর্তনীয় নহে। সনদের ২৩, ২৭ ও ৬. ধারা তিনটি সংশোধিত হইয়া ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩১ আগষ্ট হইতে কার্যকর হয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আওতায় যৌথ নিরাপত্তা—Collective Security under the U. N.

শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা হইল জাতিপুঞ্জের প্রধান কার্য। শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইলে অথবা শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার আশংকা

ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ বিবদমান পক্ষগুলিকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের অবসান ঘটাইবার অনুরোধ করিতে পারে। এই অনুরোধ রক্ষিত না হইলে নিরাপত্তা পরিষদ অনুরোধ প্রত্যাখ্যানকারী রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্র-গুলিকে সকল প্রকার আদান-প্রদান ও যোগাযোগ ছিন্ন করিতে সুপারিশ করিতে পারে। এই উপায়ও ব্যর্থ হইলে নিরাপত্তা পরিষদ বলপ্রয়োগ নীতি গ্রহণ করিয়া স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর দ্বারা অবাধ্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করিয়া ইহাকে বিরোধের অবসান ঘটাইতে বাধ্য করিতে পারে। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিজস্ব কোন সশস্ত্রবাহিনী নাই। অবাধ্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে সৈন্য ও সমর-সম্ভার দ্বারা জাতিপুঞ্জকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করে।

সুতরাং দেখা যায় যে, জাতিপুঞ্জের সদস্যগণ যদি নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে অবাধ্য রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ছেদ না করে অথবা ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় সাহায্য না করে তাহা হইলে জাতিপুঞ্জ কর্তৃক শান্তি ও নিরা-পত্তা রক্ষা প্রহসনে পর্যবসিত হয় এবং অধিকাংশ বিরোধের ক্ষেত্রেই যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর হইতে পারে নাই।

মানবিক অধিকারের সার্বিক ঘোষণ—Universal Declaration of Human Rights

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যতম দায়িত্ব হইল স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল জাতির মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করা। এই উদ্দেশ্যে মার্কিন রাষ্ট্রপতির পত্নী মিসেস্ রুজভেল্টকে সভাপতি করিয়া মানবিক অধিকার আযোগ (Human Rights Committee) গঠিত হয়। এই আযোগ মানবিক অধিকার ঘোষণাটি প্রণয়ন করে এবং ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এই ঘোষণাটি সাধারণ সভা কর্তৃক গৃহীত হয়। এই ঘোষণাটির প্রথম অংশে বাক্-স্বাধীনতা, ধর্মমতের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, সাম্যের অধিকার প্রভৃতি মানুষের পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ঘোষণার দ্বিতীয় অংশে মানুষের অর্থ-নৈতিক ও কৃষ্টিগত স্বাধীনতার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সাড়ম্বরে ঘোষিত এই অধিকারগুলি জাতিপুঞ্জের কোন সদস্য রাষ্ট্রই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে নাই বা কার্যকর করিবার চেষ্টা করে নাই।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল্যায়ন—Appraisal of the U. N.

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমুদয় সদস্য একযোগে অংগীকারাবদ্ধ যে, তাহারা সমবেতভাবে জগতে শান্তি, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, পারস্পরিক বোঝাপড়া, সমৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার স্বার্থে কাজ করিবেন এবং যুদ্ধ ও আক্রমণাত্মক কার্য, দাসত্ব, অসহিষ্ণুতা, দারিদ্র্য, রোগ এবং অজ্ঞতার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিবেন। এই উদ্দেশ্যগুলি সফল করিবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কয়েকটি বিভাগ আছে। ইহা ছাড়াও, কতিপয় শাখা সমিতি আছে যেগুলিও জাতি-পুঞ্জের উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করে। জাতিপুঞ্জের এই বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা সমিতিগুলির কার্য পূর্বেই সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে।

যুদ্ধ ও আক্রমণাত্মক কার্য বন্ধ করিয়া জগতে স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করিতে জাতিপুঞ্জ যে ব্যর্থকাম হইয়াছে একথা বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। পাক-ভারত বিরোধ, আরব-ইস্রায়েল বিরোধ, কোরিয়ার যুদ্ধ, ভিয়েৎ-নামের যুদ্ধ এই বিশ্ব সংগঠনের ব্যর্থতার জলন্ত সাক্ষ্য। কিন্তু বিরোধ-নিষ্পত্তি ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা বহুলাংশে ব্যর্থকাম হইলেও এই প্রতিষ্ঠান বিবদমান পক্ষগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিয়া পারস্পরিক আলোচনা ও অন্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। দ্বিতীয়তঃ, একমাত্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলির উপর নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি সমবেতভাবে নৈতিক চাপ সৃষ্টি করিয়া বিবাদের অবসান ঘটাইবার প্রচেষ্টা চালাইতে পারে। এই প্রচেষ্টা এককভাবে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হইল একটি বিশ্বসভা যে সভায় বিশ্বমানবের কল্যাণের বিষয় আলোচিত হয়। এই আলোচনায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গী ও ন্যায়-অন্যায় বোধ প্রতিফলিত হয় এবং এই প্রতিফলনের ফলে ধীরে ধীরে একটি বিশ্বজনমত গঠিত হয়। এই বিশ্বজনমতের প্রভাবে বহু রাষ্ট্র অন্যায় কার্য হইতে বিরত হইয়াছে। চতুর্থতঃ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই বিশ্ব সংগঠনের অবদান আদৌ উপেক্ষণীয় নহে।

এই বিশ্বসংস্থা নানা উপায়ে রাষ্ট্রগুলিকে পারস্পরিক সংস্পর্শে আনিয়া রাষ্ট্রগুলির মতভেদ ও সন্দেহের কারণ দূর করিয়া গঠনমূলক সহযোগিতা সৃষ্টি করে। সহযোগিতা স্থাপিত হইলে বিরোধের কারণও দূর হয়। পঞ্চমতঃ, এই বিশ্বসংস্থা অবহেলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে বিশ্বের দরবারে তাহাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করিবার সুযোগ দান করিয়া তাহাদের স্বাধীন ও সার্বভৌম অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ষষ্ঠতঃ, বিশ্বসংস্থা ইহার সংশ্লিষ্ট নানাজাতীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিমূলক বিশেষীকৃত শাখাসমূহের সাহায্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির দ্বারা বিশ্বমানবের বিশেষ করিয়া অনগ্রসর দেশগুলির উন্নতি সাধনে বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছে।

শান্তিরক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মহামানবের এক মহামিলনক্ষেত্র। এই মহামিলনক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতিগুলি মিলিত হইয়া বস্তুগত ও ভাবগত আদান-প্রদান সাহায্যে শান্তপূর্ণ উপায়ে তাহাদের পারস্পরিক বিরোধের মীমাংসা করিতে পারে। বিশ্বসংস্থা শান্তির পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। এ পথে চলার দায়িত্ব হইল রাষ্ট্রগুলির।

পঞ্চম অধ্যায়

আইন

(Law)

আইনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি—Definition and Nature of Law.

'আইন' শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সমাজ-জীবনে মানুষকে অনেক বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। এই বিধি-নিষেধগুলিকে সাধারণতঃ সামাজিক আইন বলা হয়। সভ্য জীবনযাপনের জন্য মানুষকে যে নৈতিক বিধি মানিয়া চলিতে হয়, তাহাকে নৈতিক আইন বলা হয়। বিজ্ঞানবিষয়ক শাস্ত্রগুলিতে আইন শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানে কার্যকারণের সম্পর্ক বুঝাইতে 'আইন' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'আইন' সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আইনের সংজ্ঞানির্দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লেখকগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। জন অষ্টিন্ ও তাঁহার অনুগামীদের মতে আইন হইল সার্বভৌমের নির্দেশ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অধস্তন ব্যক্তিরা আইন বলিয়া মান্য করিতে বাধ্য। আইন যেরূপেই প্রচারিত হউক না কেন, ইহার একমাত্র উৎস হইল সার্বভৌম শক্তি। সুতরাং এই মত অনুসারে ধরা হয় যে, আইন একটা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রচিত হয় ও আইন বলবৎ করিবার জন্য এক সার্বভৌম শক্তির প্রয়োজন অপরিহার্য। এই মতবাদের সমালোচনা করিয়া হেন্‌রি মেইন্ বলেন যে, আইন শুধুমাত্র সার্বভৌমের আদেশ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। প্রত্যেক দেশে আইনানুগ সার্বভৌম-রচিত আইন ছাড়াও নানারূপ প্রচলিত প্রথা, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি আইন বলিয়া অভিহিত হয়। মেইনের মতে সার্বভৌমের নির্দেশ আইনের একমাত্র উৎস নহে। সামাজিক নানাপ্রকার শক্তির দ্বারা আইন প্রভাবিত হয়। প্রথা, আচার, ধর্মীয় বিধি-নিষেধ, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি নানাপ্রকার সামাজিক শক্তি আইনের পরিবর্ধনে সহায়তা করে। সুতরাং আইনকে

একটা স্থিতিশীল শক্তি না বলিয়া গতিশীল শক্তিরূপে পরিগণিত করা উচিত।

উপরি-উক্ত সমালোচনার সহিত সামঞ্জস্য বিধানকল্পে অষ্টিনের অনুগামিগণ অষ্টিন্-প্রদত্ত আইনের সংজ্ঞার কিছু পরিবর্তন করেন। তাঁহারা নিম্নলিখিতরূপে আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ করেন : আইন হইল সমাজে মানুষের প্রচলিত চিন্তা-ধারা ও অভ্যাসের সেই অংশ, যে অংশ কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মের আকারে সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হয় ও যে নিয়মগুলি শাসন-কর্তৃপক্ষ তাহাদের শক্তি ও প্রভাব দ্বারা বলবৎ করে।

হল্যাণ্ড-প্রদত্ত আইনের সংজ্ঞাই আইনের শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা বলিয়া পরিগণিত হয়। তিনি বলেন আইন হইল মানুষের বহির্জীবন-সম্পর্কিত কতকগুলি বিধি-নিষেধ, যাহা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক বলবৎ করা হয়। সুতরাং অষ্টিনের অনুগামিগণ দুই দিক্ দিয়া অষ্টিন্-প্রদত্ত সংজ্ঞার পরিবর্তন করেন। প্রথমতঃ, আইন শুধু সার্বভৌমের নির্দেশ নয়, স্বভাবজাত প্রথা, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতির সমাবেশে আইনের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আইনের স্রষ্টা নয়, এই কর্তৃপক্ষ আইন বলবৎ করে মাত্র। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও আইন মানিতে বাধ্য। তাহারা আইনের আওতার বাহিরে নয়।

বর্তমানে আইনের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। আধুনিক লেখকগণ বলেন, আইন হইল বহির্জীবন-নিয়ন্ত্রণের কতকগুলি বিধি-নিষেধ, যাহা জন-সাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে আইন জনসাধারণের সমর্থনপুষ্ট নয়, সে আইন কখনও লববৎ করা যায় না। আইনের বাধ্যবাধকতা নির্ভর করে আইনের প্রকৃতির উপর। আইন মান্য করিলে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সমষ্টিগত স্বার্থ সংরক্ষিত হয়—এই বিবেচনা দ্বারা চালিত হইয়া সাধারণতঃ লোকে আইন মান্য করে। যে আইন ব্যক্তির বা সমষ্টির পক্ষে কল্যাণকর নয়, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোকে মানিতে চায় না। সুতরাং আইন মান্য করা বা না-করা জনসাধারণের আইনের প্রকৃতিসম্বন্ধে ধারণার উপর নির্ভর করে—রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না। আর রাষ্ট্র শুধু এই সার্বভৌম ক্ষমতার ধারক মাত্র। এই ক্ষমতা জনসাধারণই রাষ্ট্রকে প্রদান করিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্র জনসাধারণের সম্মতি অনুসারেই এই ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে পারে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, আইন যদি জনসাধারণের সম্মতির অভিব্যক্তি হয় তাহা হইলে আইন মান্য করাইবার জন্য বলপ্রয়োগের কি প্রয়োজন? একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাইতে পারে। রাষ্ট্রীয় আইনের বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই আইনগুলি ব্যক্তিনির্বিচারে প্রযোজ্য। সকলেই সব সময় আইন মানিতে বাধ্য। উডরো উইলসন্ এই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, আইন মানুষের চিন্তাধারার দর্পণস্বরূপ। ইহা একটি সক্রিয় শক্তি। ইহা শারীরিক ও নৈতিক শক্তির মাধ্যমে কার্যকর হয়। মানুষের চিন্তাধারার অগ্রগতির সঙ্গে আইনেরও পরিবর্তন ঘটে। চিন্তাধারার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ আইনে প্রতিফলিত হয়। একটা দেশের আইন বিশ্লেষণ করিলে সে দেশের তৎকালীন সামাজিক চিন্তাধারার গতি ও প্রকৃতি জানা যায়। যেহেতু আইন মানুষকে একটা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহার জীবনযাত্রা পরিচালিত করিতে বাধ্য করে, সেইহেতু ইহাকে সক্রিয় শক্তি বলা হইয়াছে। আইনের অবর্তমানে মানুষ তাহার খুশিমত জীপন যাপন করিতে পারে। আইন ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করে। কিন্তু প্রত্যেক সমাজে নানা স্তরের লোক থাকে। একদল নৈতিক বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া কর্তব্যবোধে আইন মান্য করে। নৈতিক জ্ঞানই তাহাদের আইন মানিতে বাধ্য করে। কিন্তু সমাজে এমন অনেক লোক থাকে যাহারা স্বার্থপ্রণোদিত বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া আইন মান্য করে। তাই যখন কোন আইন এই সমস্ত লোকের স্বার্থবিরোধী হয় তখন তাহারা আইন মান্য করিতে দ্বিধা করে। এই শেষোক্ত দলের জন্যই শক্তিপ্রয়োগের প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় আইন সকলের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য। যখন নৈতিক শক্তি আইন মান্য করাইতে ব্যর্থ হয়, তখন শারীরিক শক্তির প্রয়োগে আইন বলবৎ করা অপরিহার্য হইয়া উঠে।

আইনের সমর্থন—Sanction behind Law.

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আইনের সমর্থন ইহার বৈধতা ও নৈতিক মূল্যের (Validity and Value) উপর নির্ভর করে। আইনের বৈধতা রাষ্ট্রের শক্তির দ্বারা বলবৎ করা হয়। আইনের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা সকলেই মান্য করিবে। যে আইন সকলে মান্য করে না, সে আইনকে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক আইন বলা যায় না—আর যে আইন

ইহার সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক বৈশিষ্ট্যবিহীন হয়, সে আইন প্রকৃত আইন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু আইনের এই সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রকৃতি শুধুমাত্র রাষ্ট্রশক্তির উপর নির্ভর করে না। রাষ্ট্রশক্তি আইনকে বৈধ করিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত আইনের যদি কোন নৈতিক মূল্য না থাকে তাহা হইলে রাষ্ট্র শুধু বলপ্রয়োগ দ্বারা আইন বলবৎ করিতে পারে না। শুধুমাত্র শক্তিমান রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত বলিয়াই লোকে আইন মান্য করে না—আইন ন্যায়বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত—আইন সার্বজনীন স্বার্থের ধারক ও রক্ষক— এই ধারণার দ্বারা পরিচালিত হইয়াই লোকে আইন মানে। সুতরাং যে আইন যত পরিমাণে নীতিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, সে আইন ততই সার্বজনীন ও ব্যধ্যতামূলক হইবে। আইনের বৈধতা নীতিজ্ঞান-নিরপেক্ষ নহে। আইনের নৈতিক মূল্যই ইহাকে বৈধ করিতে সাহায্য করে। সুতরাং আইনের সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রকৃতি অর্থাৎ সমর্থন ইহার বৈধতা ও নৈতিক মূল্যের উপর একান্তভাবে নির্ভর করে।

আইনের উৎস—Sources of Law.

আইনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, কোন দেশেরই প্রচলিত আইন শুধু রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। নানাবিধ সামাজিক শক্তি আইন-গঠনে কার্যকরী হইয়াছে। কিন্তু আইনের উৎস যাহা হউক না কেন, প্রত্যেকটি আইন রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রচারিত, স্বীকৃত ও কার্যকর হওয়া চাই। আইন-গঠনে নিম্নলিখিত শক্তিগুলি কার্যকরী হইয়াছে :

১। প্রথা—Custom.

প্রত্যেক দেশের প্রচলিত আইনগুলির মধ্যে কতকগুলির প্রথাগত বিধি-নিষেধ দেখা যায়। এই প্রথাগুলি আইনানুগ সার্বভৌম কর্তৃক রচিত হয় না। ইহারা আপনা হইতেই প্রয়োজনের তাগিদে গড়িয়া উঠে। রাষ্ট্র-উদ্ভবের পূর্ব হইতে এগুলি ধীরে ধীরে প্রবর্তিত হইয়া মানুষের সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। রাষ্ট্র-উদ্ভবের পরবর্তী কালে এই প্রচলিত প্রথার অনেকগুলি রাষ্ট্র

কর্তৃক স্বীকৃত হয়। এই স্বীকৃতির ফলেই প্রথাগুলি আইনের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়।

২। ধর্ম—Religion.

প্রথার মতই ধর্মীয় আইনগুলিও আইন-সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে। এই অনুশাসনগুলি সমাজ-জীবন নানাভাবে সুসংবদ্ধ করিয়া সমষ্টিগত জীবনে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা দিয়াছে। এই অনুশাসনগুলি রাষ্ট্রীয় ব্যাপার পরিচালনার কার্যে সহায়ক বলিয়া রাষ্ট্র এগুলিকে সমর্থন করিয়া আইনের মর্যাদা দিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের আইনের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

৩। বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত—Adjudication.

বিচারালয়ের আইনসম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলিও নূতন আইনের সৃষ্টিকার্যে অনেক সাহায্য করিয়াছে। বিচারকেরা শুধু আইনের প্রয়োগ করেন না, তাঁহারা প্রয়োজনমত আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। আইনের অর্থ যদি সুস্পষ্ট না হয় তাহা হইলে বিচারকেরা ব্যাখ্যা করিয়া আইনের যে সিদ্ধান্ত করেন তাহাই সঠিক আইন বলিয়া পরিগণিত হয়। একজন বিচারক কর্তৃক ব্যাখ্যাত আইনের সিদ্ধান্ত যখন অনান্য বিচারকগণ কর্তৃক অনুসৃত হয়, তখন এই নূতন সিদ্ধান্ত আইনে পরিণত হয়।

৪। ন্যায়পরতা—Equity.

আইনের অসম্পূর্ণতার জন্য অনেক সময় বিচারকদের নিজেদের ন্যায় ও বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া বিচারকার্য পরিচালনা করিতে হয়। বিচারকার্য যাহাতে ন্যায়ধর্ম অনুসারে পরিচালিত হয় সেজন্য বিচারকেরা এই নীতি অনুসরণ করিয়া থাকেন। এই ন্যায়ধর্মের ভিত্তিতেও অনেক আইনের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং বিচারকগণ দুই প্রকারে আইন সৃষ্টিতে সহায়তা করেন। প্রথমতঃ, আইনের ব্যাখ্যা দ্বারা ও দ্বিতীয়তঃ, আইন-প্রয়োগে ন্যায়ধর্মের অনুসরণ করিয়া।

৫। আইনবিদ্‌গণের আলোচনা—Scientific discussion.

অভিজ্ঞ আইনবিদ্‌গণ তাঁহাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা অনেক সময় নূতন

আইনের সৃষ্টি ও প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের সহায়তা করেন। সমষ্টিগত জীবনে কোন্‌টি আইনরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত ও কোন্‌টি বর্জনীয় এ বিষয়ে আইনবিদ্‌ পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত প্রায় সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হয়। রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ও সমর্থন লাভ করিয়া এই সিদ্ধান্তগুলি আইনে পরিণত হয়।

৬। **আইন-প্রণয়ন—Legislation.**

আধুনা আইন-পরিষদ্‌ই আইনের প্রধান উৎস বলিয়া বিবেচিত হয়। আইন-পরিষদ নির্ধারিত পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ন করিয়া রাষ্ট্রপরিচালনার কার্য সহজ করিয়াছে।

ওপেনহাইম, হল্‌ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আইনবিদ্‌ পণ্ডিতগণ উপরি-উক্ত বিষয়গুলিকে আইনের বিভিন্ন উৎস বলিয়া গণ্য করিতে আপত্তি করেন। তাঁহাদের মতে জনসাধারণের সমবেত ইচ্ছাই হইল আইনের প্রধান উৎস। এই সমবেত ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ নানা প্রণালীতে হইতে পারে। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাবিহীন মানব-সমাজে এই সমবেত ইচ্ছা প্রথা বা ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সমাজ যখন রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এই সমবেত ইচ্ছা প্রতিনিধিমূলক আইন-পরিষদের মাধ্যমে আইনরূপে প্রকাশিত হয়। সুতরাং উক্ত পণ্ডিতগণের মতে প্রথা, ধর্মীয় অনুশাসন, বিচারকের সিদ্ধান্ত প্রভৃতিকে আইনের উৎস না বলাই যুক্তিসম্মত।

রাষ্ট্রীয় আইন ও অন্যান্য আইন

প্রাকৃতিক আইন—Law of Nature.

সামাজিক চুক্তি মতবাদ আলোচনাকালে দেখা গিয়াছে যে, অনেক লেখক রাষ্ট্র-জন্মের পূর্বে মানুষ যে পরিবেশে বাস করিত তাহাকে প্রাকৃতিক পরিবেশ অথবা প্রকৃতির রাজ্য বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ যে সমস্ত আইন মান্য করিত সেগুলিকে প্রাকৃতিক আইন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

গ্রীক দার্শনিকদের লেখার মধ্যে এই প্রাকৃতিক নিয়মের প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। তাঁহাদের মতে প্রকৃতির রাজ্যে যে নিয়মানুবর্তিতা ও সামঞ্জস্য বিদ্যমান,

মানবসমাজের নিয়মগুলি ঐ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। মনুষ্যকৃত আইনগুলি প্রাকৃতিক নিয়মগুলির অনুরূপ হইলে সেগুলিকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলা হইত। প্লেটো ও অ্যারিষ্টট্‌ল্‌ উভয়েই প্রাকৃতিক আইনের নজির দেখাইয়া তাঁহাদের অনেক মতবাদ সমর্থনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ষ্টোয়িক দার্শনিক-গণ প্রাকৃতিক নিয়মগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করেন। তাঁহাদের মতে প্রকৃতির রাজ্যে যে সামঞ্জস্য-সমন্বিত নিয়ম বিদ্যমান, মানুষের বিবেকবুদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা সেগুলির ব্যাখ্যা করিয়া সমাজোপযোগী করিতে হয়। বিবেকবুদ্ধি দ্বারা ব্যাখ্যাত প্রাকৃতিক নিয়মগুলি এইরূপে আইনের মর্যাদা পায়। রোমকগণ এই প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তিতে তাঁহাদের আন্তর্জাতিক আইন (*Jus gentium*) সৃষ্টি করেন। উহা বর্তমান যুগে পূর্ণ আন্তর্জাতিক আইনরূপে গণ্য হয়।

প্রাকৃতিক নিয়মের বিপক্ষে এই যুক্তি দেখান হয় যে, ইহার পশ্চাতে কোন আইনের অনুমোদন নাই। শুধুমাত্র নৈতিক অনুমোদনের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই নিয়মগুলি কার্যকর করা যায় না। প্রাকৃতিক নিয়মগুলি একটা নৈতিক আদর্শের মান স্থির করে। কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপে এই নৈতিক মান বলবৎ করা সম্ভবপর নয়।

প্রাকৃতিক নিয়মের এই ত্রুটিসত্ত্বেও বাস্তব রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এই নিয়মগুলির প্রভাব প্রভূত পরিমাণে অনুভূত হয়। জুরির দ্বারা বিচারপদ্ধতি, বিচারকালে বিচারকদের ন্যায় ও ধর্মনীতি অনুসরণ, আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রভৃতিকে প্রাকৃতিক নিয়মেরই পরোক্ষ প্রয়োগ বলা যাইতে পারে।

সামাজিক আইন— Social Law.

সামাজিক আইনগুলি মানুষের সমষ্টিগত জীবনের কার্যকলাপের একটা মান স্থির করিয়া দেয়। প্রত্যেক সমাজেই এইরূপ কতকগুলি নিয়ম থাকে যাহা সমাজভুক্ত ব্যক্তি মাত্রই সাধারণতঃ মানিয়া চলে। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে কতকগুলি নিয়ম প্রত্যেক সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন এগুলি সম্পর্কে সাধারণতঃ নিরপেক্ষ। কিন্তু বর্তমান যুগে প্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলি বহু ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করিয়া মানুষের পূর্বতন সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতেছে। মানুষের সামাজিকতাবোধের উপরই প্রধানতঃ ইহার অনুমোদন নির্ভর করে।

ধর্মীয় আইন—Religious Law.

ধর্মীয় আইন বলিতে ধর্মের কতকগুলি অনুশাসন বুঝায়। প্রত্যেক ধর্মের বিভিন্ন অনুশাসন থাকে। এই অনুশাসনগুলি সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট ধর্মানুসরণকারিগণ মানিয়া চলেন। কেহ যদি এই অনুশাসনগুলি অমান্য করেন তাহা হইলে তিনি নিন্দনীয় হইবেন, অথবা সংশ্লিষ্ট ধর্মানুসরণকারিদের দ্বারা সমাজচ্যুত হইবেন। কিন্তু এজন্য রাষ্ট্র তাঁহাকে কোনরূপ দৈহিক শাস্তি প্রদান করিবে না। ধর্মীয় অনুশাসন পালন করা বা না-করা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে ধর্মের বন্ধন সকল সমাজেই শিথিল হইয়া পড়িতেছে।

নৈতিক আইন—Moral or Ethical Law.

সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হইলে প্রত্যেক মানুষের অপরাপর লোকের সংস্পর্শে আসিতে হয়। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের এই পারস্পরিক সম্পর্ক কতকগুলি বাস্তব কার্যকর নিয়মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বাস্তব নিয়মগুলি ছাড়া আরও অনেকগুলি নিয়মের কল্পনা করা যায়, যে নিয়মগুলি দ্বারা মানুষের এই পারস্পরিক সম্পর্ক একটা আদর্শ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। শেষোক্ত এই নিয়মগুলি মানুষের ঔচিত্যবোধ ও নীতিজ্ঞানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। শুধুমাত্র জীবনধারণ করা মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়। মানুষ চায় যাহাতে তাহার নৈতিক জীবনেরও উৎকর্ষ সাধিত হয়। নৈতিক জীবনে উৎকর্ষ লাভ করিতে হইলে মানুষের নীতিসম্মত জীবন যাপন করিতে হইবে। এইজন্য প্রত্যেক সমাজে মানুষের ঔচিত্যবোধকে ভিত্তি করিয়া কতকগুলি বিধি-নিষেধ সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিধি-নিষেধগুলি মানুষের চিন্তাধারা ও কার্যকলাপের আদর্শ মান স্থির করিয়া দেয়। নীতিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এইগুলিকে নৈতিক আইন বলা হয়।

রাষ্ট্রীয় আইন ও নৈতিক নিয়মের সম্পর্ক—Relation between Law and Morality.

রাষ্ট্রপ্রবর্তিত আইন ও নৈতিক আইনের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। আইন শুধু মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, অপর পক্ষে মানুষের নৈতিক ধারণা

তাহার সমগ্র জীবনকে—চিন্তাধারা, কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ও বাস্তব কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং নৈতিক আইনের কার্যক্ষেত্র ব্যাপকতর। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপ্রবর্তিত আইন শক্তিপ্রয়োগে বলবৎ করা হয়। আইনভঙ্গকারী শাস্তি পায়, কিন্তু নৈতিক অপরাধ রাষ্ট্র কর্তৃক দণ্ডনীয় নয়। নৈতিক অপরাধীকে শুধু বিবেকদংশন অথবা লোকনিন্দা সহ্য করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপ্রবর্তিত আইন সুসংবদ্ধ ও সুস্পষ্ট এবং ব্যক্তিনির্বিচারে সব সময়ে প্রযোজ্য, কিন্তু নৈতিক নিয়মগুলি সুসংবদ্ধ ও সুস্পষ্ট নয় এবং দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে এগুলি সম্বন্ধে মানুষের ধারণার পরিবর্তন ঘটে ও প্রয়োগেরও ব্যতিক্রম হয়। চতুর্থতঃ, নৈতিক নিয়মগুলি মানুষের ঔচিত্য, অনৌচিত্য, ন্যায় ও অন্যায়বোধের একটা নির্দিষ্ট মান দ্বারা নির্ধারিত হয়। রাষ্ট্রীয় আইনের ক্ষেত্রে এরূপ কোন নির্দিষ্ট মান নাই। সাধারণের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিয়া রাষ্ট্রীয় আইন প্রবর্তিত হয়। রাষ্ট্রীয় আইন নৈতিক জ্ঞানের উপর সব সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় না। অকৃতজ্ঞতা, বিদ্বেষবুদ্ধি প্রভৃতি নৈতিক অপরাধ, কিন্তু এগুলি দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয় না। রাত্রিকালে বাতি না জ্বালিয়া দ্বিচক্রযান চালনা করা নৈতিক অপরাধ না হইলেও বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত। যুদ্ধকালে গৃহের অভ্যন্তরস্থিত আলোক অনাচ্ছাদিত রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ, কিন্তু শান্তির সময়ে উহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। সুতরাং দেখা যায় যে, নীতিবিগর্হিত বলিয়াই যে মানুষের আচরণ বে-আইনী ঘোষিত হয় সব সময়ে তাহা সত্য নহে। জনস্বার্থসংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র মানুষের অনেক আচরণকে বে-আইনী ঘোষণা করিতে পারে।

অনেক লেখক বলেন যে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষাকল্পে রাষ্ট্র যে কোন আইন এমন কি নীতিজ্ঞানবিরোধী আইনও প্রবর্তিত করিতে পারে। ("The safety of the state is its first law and to realise this end it must be above morality.") কিন্তু এই মতবাদ বিনা শর্তে গ্রহণ করা যায় না। ব্যক্তির ন্যায় রাষ্ট্রেরও নিজ অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে মানিয়া লইলেও রাষ্ট্রকে অবাধ ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অস্তিত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত রাষ্ট্র সাময়িকভাবে নীতিজ্ঞানবিরোধী আইন প্রবর্তন করিতে পারে। কারণ, ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষক হইল রাষ্ট্র ও সেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যদি বিপদাপন্ন হয়

তাহা হইলে ব্যক্তি-স্বাধীনতারও অবসান ঘটিতে পারে ; এইরূপ বিবেচনা করিয়া রাষ্ট্রকে আপৎকালে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। সেইজন্য অন্তর্বিপ্লব অথবা যুদ্ধকালীন অবস্থায় রাষ্ট্র অনেক নীতিজ্ঞানবিরোধী আইনের বলে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম হয়। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবাধ অধিকার বা বিদ্যালয়গৃহকে আস্তাবলে পরিণত করিবার অধিকার প্রভৃতি নীতিজ্ঞানবিরোধী আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রকে দেওয়া যাইতে পারে না। এইরূপ অবাধ ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র স্বৈরাচারী হইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমাধি রচনা করিতে পারে। সুতরাং নীতিজ্ঞানবিরোধী আইন করিবার অধিকার শর্তসাপেক্ষ।

এতগুলি পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, নৈতিক নিয়ম ও আইনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। উভয় নিয়মই মানুষের ধর্মগত ধারণা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। মানুষের নৈতিক জ্ঞান রাষ্ট্রপ্রবর্তিত আইনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। রাষ্ট্রপ্রবর্তিত কোন আইন যদি প্রচলিত নীতিজ্ঞানবিরোধী হয় অথবা প্রচলিত নীতিজ্ঞান হইতে বেশী অগ্রবর্তী বা পশ্চাদ্‌পদ হয়, তাহা হইলে সে আইন লোকে মান্য করে না। সুতরাং প্রচলিত নীতিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া রাষ্ট্রের আইন প্রবর্তন করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হইল মানুষের নৈতিক উৎকর্ষসাধনে সহায়তা করিয়া সু-নাগরিক সৃষ্টি করা। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল এমন আইন সৃষ্টি করা যেগুলি মানুষের নৈতিক জীবনের উন্নতিসাধন করিয়া তাহাদের মধ্যে বিচারবুদ্ধি সঞ্চারিত করিতে পারে। এইজন্য অনেক সময় রাষ্ট্রকে পুরাতন আইন বা সামাজিক আচার-প্রথার সংস্কার অথবা বিলোপসাধন করিয়া নূতন আইন প্রবর্তন করিতে হয়। নূতন আইনের দ্বারা রাষ্ট্র মানুষের ঔচিত্যবোধ বৃদ্ধি করাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে লর্ড উইলিয়াম্ বেন্টিঙ্ক তৎকালে প্রচলিত সতীদাহ-প্রথা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাহার বিলোপসাধন করেন। আইনের দ্বারা এই কু-প্রথার বিলোপসাধন হওয়াতে কালক্রমে লোকের নৈতিক বুদ্ধিও পরিবর্তিত হইতে থাকে। সতীদাহ-প্রথা শুধু বে-আইনী হওয়ায় পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া বর্তমান কালের লোকে বিবেচনা করে না তাহারা মনে করে এই প্রথা নীতিবিগর্হিত, তাই পরিত্যক্ত

হইয়াছে। সুতরাং আইনের মাধ্যমে লোকের নীতিজ্ঞান বৃদ্ধি করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। নৈতিক নিয়ম ও রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে সীমারেখা সর্বত্র সুস্পষ্ট নহে।

আন্তর্জাতিক আইন International Law.

ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যেক মানুষের যেমন অপরাপর লোকের সংস্পর্শে আসিতে হয়, বর্তমান যুগে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরও তদ্রূপ অপরাপর রাষ্ট্রের সংস্পর্শে আসিতে হয়। তাহার কারণ হইল কোন রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এক রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা কারণে অপরাপর রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিতে হয়। অধুনা যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি হওয়ার ফলে সভ্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অনেক যোগসূত্র স্থাপিত হইয়া নানাবিধ আদান-প্রদান সম্ভব হইয়াছে। এইরূপ আদান-প্রদানের ফলে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, আর এই পারস্পরিক সম্পর্ক স্থিরীকৃত হয় কতকগুলি সর্ববাদিসম্মত নিয়মে। এই নিয়মগুলিকে আন্তর্জাতিক আইন বলা হয়।

রাষ্ট্রীয় আইনের অনুরূপ প্রথায় আন্তর্জাতিক আইনের সৃষ্টি হইয়াছে। আন্তর্জাতিক প্রথা, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, আন্তর্জাতিক পরামর্শ-সভার সিদ্ধান্ত ও খ্যাতনামা আইনবিদ্ পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা আন্তর্জাতিক আইন পরিপুষ্ট হইয়াছে। আন্তর্জাতিক বিচারালয় সৃষ্ট আইন অনুসারে নিম্নলিখিত উৎসগুলি আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃত উৎস বলিয়া পরিগণিত হয়। (ক) আন্তর্জাতিক প্রথাগত বিধান (conventions), (খ) আন্তর্জাতিক প্রথা, (গ) সভ্য জাতিসমূহ কর্তৃক স্বীকৃত আইনের নীতি, (ঘ) বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত ও বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন আন্তর্জাতিক আইনবিদের অভিমত। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিচারালয় বিচারপ্রার্থী পক্ষগুলির সম্মতিক্রমে উপরি-উক্ত উৎসগুলি নিরপেক্ষভাবে ইহার ন্যায়বোধ (equity) প্রয়োগ করিয়া বিচার করিতে পারে। এই আইন এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের শান্তির সময়ে, যুদ্ধকালে বা নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বনকালে কি সম্পর্ক হইবে তাহা স্থির করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা করে। আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করিবার জন্য কোন নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ নাই। রাষ্ট্রগুলির সম্মতিই হইল ইহার প্রধান অনুমোদন। রাষ্ট্রগুলি এই আইনানু-সারে তাহাদের কার্যকলাপ পরিচালিত করিয়া পরোক্ষভাবে এই আইনের

সমর্থন করে। আবার অনেক সময় এই আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পারস্পরিক চুক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে ইহার সমর্থন করে।

আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃত আইন বলা হইবে, কি কতকগুলি নৈতিক নিয়মের সমষ্টি বলা হইবে, এ বিষয়ে গুরুতর মতভেদ দেখা যায়। অষ্টিন্ আইনের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছিলেন, সে সংজ্ঞা অনুসারে আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃত আইন বলিয়া অভিহিত করা যায় না। প্রত্যেক আইনের পশ্চাতে একটি সার্বভৌম শক্তির উপস্থিতি অপরিহার্য বলিয়া মনে করিলে এই আইনকে আইন আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ আন্তর্জাতিক আইন বলবৎ করিবার মত কোন সার্বভৌম শক্তি ইহার পশ্চাতে নাই। আইন অমান্য করা দণ্ডনীয় অপরাধ, কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনভঙ্গকারী রাষ্ট্রকে দণ্ড দিবার উপযুক্ত কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত অবর্তমান। রাষ্ট্রগুলি বহু ক্ষেত্রে এই আইন মান্য করে না। সুতরাং যে আইন মান্য করা বা না-করা আইনভঙ্গকারীদের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, সে আইনকে প্রকৃত আইন বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

আন্তর্জাতিক আইন অনেক সময় রাষ্ট্রগুলি মান্য করে না—এই যুক্তিতে ইহাকে প্রকৃত আইন বলিতে আপত্তি করা হয়। রাষ্ট্রীয় আইনও বহু ক্ষেত্রে ভঙ্গ হয়। রাষ্ট্রীয় আইন ক্ষেত্রবিশেষে ভঙ্গ হইলেও যদি সেগুলিকে আইন আখ্যা দিতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক আইন সময় বিশেষে ভঙ্গ হয় বলিয়া ইহাকে আইন বলিয়া স্বীকার না করা অযৌক্তিক। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণতঃ রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক আইনের বিধি অনুসারে তাহাদের কার্যকলাপ পরিচালিত করিয়া থাকে। ইচ্ছাপূর্বক আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করিয়াছে বলিয়া কোন রাষ্ট্রই স্বীকার করে না। আন্তর্জাতিক আইনভঙ্গকারী বলিয়া যখনই কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হয় তখনই অভিযুক্ত রাষ্ট্র তাহার প্রতিবাদ করিয়া দোষ-ক্ষালনের নিমিত্ত সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিয়া সে যে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে নাই ইহা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পায়। রাষ্ট্রের এই আচরণের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও ঐ আইন অনুসারে তাহার কার্য পরিচালিত করিতে যত্নবান। তৃতীয়তঃ, কোন সভ্য রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইন-বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করে না। অধিকন্তু ইংলণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি

দেশ আন্তর্জাতিক আইনকে জাতীয় আইনের একটি অংশ বলিয়া বিবেচনা করে।

চতুর্থতঃ, অনেক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনভঙ্গকারী রাষ্ট্রকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। কোরিয়ার যুদ্ধকালে ও ইংরাজ-ফরাসী কর্তৃক ইজিপ্ট আক্রমণকালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক অর্থনৈতিক চাপসৃষ্টি ও সশস্ত্র হস্তক্ষেপ আন্তর্জাতিক বিরোধ দূর করিতে ফলপ্রসূ হয়। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃত আইন বলা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত বলা হয় যে, আইন হইল কতকগুলি নিয়মের সমষ্টি যাহা সর্বসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সার্বভৌম শক্তির প্রয়োজন হয় আইনকে বলবৎ করিবার নিমিত্ত, আইনের অস্তিত্বের নিমিত্ত সার্বভৌম ক্ষমতা অপরিহার্য নহে। বিখ্যাত আন্তর্জাতিক আইনবিশারদ পণ্ডিত হল্ ও ওপেনহাইম্ এই আইনকে প্রকৃত আইন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় আইনের ন্যায় আন্তর্জাতিক আইনের পশ্চাতেও আন্তর্জাতিক জনমতের অনুমোদন ও সমর্থন আছে। জনমতের এই অনুমোদন ও সমর্থন যত বেশী শক্তিশালী হইয়া উঠিবে আন্তর্জাতিক আইন অনুরূপভাবে তত শক্তিশালী হইবে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক জনমত অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলিয়া আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনকে এখনও পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় আইনের মত সকল ক্ষেত্রে কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলি অধিকতররূপে সঙ্ঘবদ্ধ হইলে আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতা আরও বৃদ্ধি পাইবে। জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণের নিমিত্ত এবং বিশ্বশান্তি ও মৈত্রী বজায় রাখিবার নিমিত্ত আন্তর্জাতিক আইনকে বাধ্যতামূলক করিয়া আইনের মর্যাদা দেওয়া বর্তমান যুগে অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

আইনের শ্রেণীবিভাগ—Classification of Law.

দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে আইনের শ্রেণী ভাগ করা হয়। প্রথমতঃ, যে কর্তৃপক্ষের দ্বারা আইন রচিত হয়, সেই কর্তৃপক্ষের পার্থক্যের ভিত্তিতে; দ্বিতীয়তঃ, আইন কাহাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত তাহা দেখিয়া ইহার শ্রেণী ভাগ করা হয়।

প্রথম পদ্ধতি অনুসারে আইনের নিম্নলিখিত শ্রেণী ভাগ করা হয় ; যথা—

১। আইন-পরিষদ রচিত লিখিত আইন—Statutes.

এই আইনগুলি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইন-পরিষদ্ কর্তৃক রচিত হয়। বর্তমানে সব দেশেই এইরূপ আইনের প্রাধান্য দেখা যায়।

২। শাসনবিভাগীয় নির্দেশ—Ordinances.

এইগুলি শাসনবিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশেষ অবস্থায় প্রবর্তিত হয় বলিয়া উহাদিগকে শাসনবিভাগীয় নির্দেশ বলা হয়। এই নির্দেশগুলি বিশেষক্ষেত্রে স্বল্পস্থায়িভাবে প্রয়োগ করা হয়।

৩। সচরাচরিক আইন—Common Law.

এই নিয়মগুলি লোকাচার হইতে উদ্ভূত হইলেও বিচারালয় কর্তৃক প্রযুক্ত ও বলবৎ করা হয়।

৪। শাসনতান্ত্রিক আইন—Constitutional Law.

এই আইনগুলি রাষ্ট্রের কার্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। যে দেশের শাসনতন্ত্র অনমনীয়, সেই দেশেই শুধু শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে পার্থক্য করা হয়।

৫। আন্তর্জাতিক আইন—International Law.

এই আইন সভ্য রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্প্রীতি ও বিশ্বশান্তি-সংরক্ষণে সহায়তা করে।

দ্বিতীয়তঃ, আইনকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয় ; যথা—

১। রাষ্ট্রীয় আইন Municipal Law ও ২। আন্তর্জাতিক আইন—International Law. রাষ্ট্রীয় আইন রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত ও বলবৎ হয়। রাষ্ট্রের বাহিরে অন্য রাষ্ট্রে ইহার প্রয়োগ হয় না। আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগ হয় সকল সদস্যরাষ্ট্রের উপর। রাষ্ট্রীয় আইনকে পুনরায় দুইটি ভাগে ভাগ করা হয় ; যথা—(ক) ব্যক্তি-সম্পর্কিত আইন—Private Law ও (খ) সাধারণ-সম্পর্কিত আইন—Public Law. ব্যক্তি-সম্পর্কিত আইন জনসাধারণের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করে। সাধারণ-সম্পর্কিত আইন ব্যক্তির সহিত সরকারের সম্পর্ক স্থির করিয়া শাসন-ব্যবস্থা দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেই ব্যবস্থা করে। সরকার-সম্পর্কিত আইনকে আবার দুই শ্রেণীতে

ভাগ করা হয়; যথা—(১) শাসনতান্ত্রিক আইন—Constitutional Law ও (২) শাসনবিভাগীয় আইন Administrative Law. শাসনতান্ত্রিক আইন সরকারের কার্যসমূহ স্থির করিয়া তাহাদের সীমারেখা টানিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্র স্থির করে। শাসনবিভাগীয় আইনগুলি সরকারী কার্যে নিযুক্ত কর্মচারীদের কর্তব্য নির্ধারণ করে।

আইন

- জাতীয় (National)
  - শাসনতান্ত্রিক (Constitutional)
  - সাধারণ (Ordinary)
    - সাধারণ-সম্পর্কিত (Public)
      - শাসন-সংক্রান্ত (Administrative)
      - সাধারণ (General)
    - ব্যক্তি সম্পর্কিত (Private)
- আন্তর্জাতিক (International)

স্বাধীনতা—Liberty.

ব্যক্তির স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতাকেই সাধারণতঃ স্বাধীনতা বলা হয়। কিন্তু এই শব্দটি এত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে যে, এই শব্দটি সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট ধারণা করা প্রয়োজন। 'স্বাধীনতা' শব্দটিকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। রাষ্ট্র-জন্মের পূর্বে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত স্বাধীনতার অধিকারী **ছিল**, সেই স্বাধীনতাকে **প্রাকৃতিক স্বাধীনতা** (Natural Liberty) বলা হয়। প্রকৃতির রাজ্যে স্বাধীনতা সুনিয়ন্ত্রিত করিবার বা স্বাধীনতা রক্ষা করিবার কোন কর্তৃপক্ষ ছিল না। সুতরাং প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বলিতে সবলের স্বেচ্ছাচারিতা ব্যতীত আর কিছু বুঝায় না।

দ্বিতীয়তঃ, **পৌর স্বাধীনতা** (Civil Liberty) অর্থে এই শব্দটিকে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপারে কতকগুলি অধিকার ভোগ করা ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। এই স্বাধীনতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের সহায়ক বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রই ইহার নাগরিকগণকে এই পৌর স্বাধীনতা ভোগ করিবার সম্পূর্ণ সুবিধা প্রদান

করিয়া থাকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা, বাক-স্বাধীনতা, ধর্মমতের স্বাধীনতা প্রভৃতি কতকগুলি অধিকারের সমষ্টিকে পৌর স্বাধীনতা বলা হয়।

তৃতীয়তা, স্বাধীনতা বলিতে **রাজনৈতিক স্বাধীনতাও** (Political Liberty) বুঝায়। রাজনৈতিকক্ষেত্রে শাসনপরিচালনা-ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার সমষ্টিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আখ্যা দেওয়া হয়। প্রত্যেক বয়স্ক ও যোগ্য ব্যক্তির ভোট দিবার ও ভোট পাইবার ক্ষমতা, যোগ্যতাসম্পন্ন হইলে রাজকার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার ও সরকারের অনুসৃত নীতির নিরপেক্ষ সমালোচনা করিবার অধিকারগুলিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়।

চতুর্থতঃ, স্বাধীনতা বলিতে বর্তমান যুগে **অর্থ নৈতিক স্বাধীনতাও** (Economic Liberty) বুঝায়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হইল যে, প্রত্যেক মানুষকে তাহার নিজের শিক্ষা ও সামর্থ্যানুযায়ী কার্য করিয়া জীবিকা অর্জনের সম্পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। অনশনের ভয় বা বেকার হইবার ভয় থাকিলে মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া যায়। পৌর স্বাধীনতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা একদিকে যেমন মানুষকে তাহার অধিকার সম্বন্ধে আত্মসচেতন করে, অপর দিকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সেইরূপ মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তাহার অন্যবিধ স্বাধীনতাকে সার্থক করিয়া তুলে। কাজ করিয়া জীবিকা-অর্জনের অধিকার, নির্দিষ্ট সময় কাজ করিয়া উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অধিকার, অসুস্থ বা বেকার অবস্থায় ভাতা পাইবার অধিকার প্রভৃতিকে সাধারণতঃ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়। প্রায় প্রত্যেক সভ্য দেশের শাসনতন্ত্রে এই অধিকারগুলি স্থান পাইয়াছে।

পঞ্চমতঃ, স্বাধীনতা শব্দটিকে **জাতীয় স্বাধীতা** (National Liberty) অর্থেও ব্যবহার করা হইয়া থাকে। জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ হইল ভিন্ন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা করিবার অধিকার। এই স্বাধীনতার অবর্তমানে কোন জাতিই পৌর স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রভৃতির অধিকারী হইতে পারে না। যে স্বাধীনতা অপরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে, সে স্বাধীনতা কখনও পূর্ণ স্বাধীনতা হইতে পারে না। বৃটিশশাসিত ভারতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সব দিক দিয়াই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। দেশ স্বধীন হইবার পর ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।

স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য ও আইনের সহিত ইহার সম্পর্ক—True Liberty and its relation to Law and Authority.

সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় মানুষের নিজ ইচ্ছানুসারে কার্য করিবার অবাধ ক্ষমতা। ব্যক্তির এই অবাধ ক্ষমতাপ্রয়োগের ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সবল ব্যক্তির স্বাধীনতা দুর্বল ব্যক্তির স্বাধীনতাকে হরণ করিতে পারে। অধিক বলশালী রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে। এইরূপ অবাধ স্বাধীনতার ফলে সমাজে মুষ্টিমেয় অধিকতর শক্তিশালী বা চতুর ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারী হইবে; অপরপক্ষে দুর্বল ও নিরীহ প্রকৃতির লোকদের কোন স্বাধীনতা থাকিবে না। স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত হইবে। একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বাধীনতা শুধু ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের একচেটিয়া অধিকারের বস্তু নয়। সমাজের প্রত্যেক নাগরিকই এই স্বাধীনতার সমান অধিকারী। প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে নিরঙ্কুশভাবে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া তাহার ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশের সুযোগ পায়, সেইজন্যই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের অভিভাবক হিসাবে এই স্বাধীনতা ভোগ করিবার মত অবস্থা সমাজে সৃষ্টি করে। একজনের স্বাধীন ইচ্ছা-প্রয়োগের ফলে যাহাতে অপরের স্বাধীনতা নষ্ট না হয়, সেজন্য রাষ্ট্র ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা প্রয়োগকে কতকগুলি বিধি-নিষেধ সৃষ্টি দ্বারা সীমাবদ্ধ করে। এই বিধি-নিষেধগুলিকে আইন বলা হয়, আর আইনের উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেক ব্যক্তিকে অপরের স্বাধীনতা হানি না করিয়া নিজ স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ দেওয়া। রাষ্ট্র যদি এই বিধি-নিষেধগুলি দ্বারা সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রিত না করিত, তাহা হইলে মানব-সমাজের অবস্থা হবস্-বর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবেশের 'জোর যার মুল্লুক তার' অবস্থার অনুরূপ হইত। সুতরাং প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার স্বাধীন ইচ্ছা এইরূপভাবে প্রয়োগ করিবে যাহাতে সমাজের অন্য লোকের অনুরূপ স্বাধীনতা কোনরূপে ক্ষুণ্ণ না হয়। স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিয়া পারস্পরিক সুবিধা-অসুবিধা-বোধের ভিত্তির উপর প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে রাষ্ট্র সাহায্য করে। আর এইজন্যই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রয়োজন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকারী হইতে হইলে এই

সার্বভৌম শক্তিকে মানিয়া লইতে হইবে। নতুবা একজনের স্বাধীনতা অধিকতর বলশালী বা চতুর ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। সুতরাং সার্বভৌম শক্তি ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা পরস্পর-বিরোধী নয় (Sovereignty and Liberty are not contradictory)। আইন হইল রাষ্ট্রের প্রধান অস্ত্র, যাহার দ্বারা রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিয়া সমাজে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করে যে পরিবেশে প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রনির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে নিজ ইচ্ছামত কার্য করিতে পারে। সমষ্টিগত জীবনের কল্যাণ-সাধনের জন্যই রাষ্ট্র আইনের দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার সীমারেখা নির্ধারণ করে। আইনের দ্বারা রাষ্ট্র তিন প্রকারে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্র প্রসারিত করে। প্রথমতঃ, ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতা যদি অন্য ব্যক্তির অধিকতর শক্তির জন্য ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা হইলে আইন তাহাকে রক্ষা করে। দ্বিতীয়তঃ, শাসকসম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারিতায় যাহাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিনষ্ট না হইতে পারে, সেজন্যও রাষ্ট্র বিশেষ ধরণের আইন-প্রণয়ন ও প্রয়োজনমত প্রয়োগ করিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, আইনের দ্বারা রাষ্ট্র সমাজে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করে, যে-পরিবেশে প্রত্যেক ব্যক্তি এই স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ পাইয়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সাধন করিতে পারে। এই সুযোগ-সৃষ্টির জন্যই বর্তমান রাষ্ট্রগুলি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুপালন ও শিশুরক্ষা, মাদকদ্রব্য-বর্জন প্রভৃতি বিষয়ক জনহিতকর আইন প্রবর্তন করিতেছে। সুতরাং আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে কোনরূপ বিরোধ থাকিতে পারে না। একে অন্যের পরিপূরক। এইজন্যই বলা হয় যে, আইন হইল প্রকৃত স্বাধীনতার নির্ধারক ও রক্ষক (Law is the condition of Liberty)।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিবার বিভিন্ন উপায়—Safeguards of Liberty.

স্বাধীনতা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অপরিহার্য সহায়ক বলিয়া সর্বদেশে বিবেচিত হয়। সেইজন্য সকল দেশেই এই ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশে একটি সুনির্দিষ্ট লিখিত শাসনতন্ত্রের সাহায্যে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলির রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। শাসনতন্ত্রে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলি সুসংবদ্ধভাবে

লিখিত হইয়াছে। এই অধিকারগুলির কোনটি যদি শাসন-কর্তৃপক্ষের কার্য দ্বারা ব্যাহত হয়, তাহা হইলে নাগরিকগণ সুপ্রীম কোর্টে ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে ও এই আদালতের নির্দেশ অনুসারে শাসন-কর্তৃপক্ষকে কার্য পরিচালনা করিতে হইবে। সুতরাং অনেক দেশে লিখিত শাসনতন্ত্র ও উচ্চ বিচারালয় ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে।

কিন্তু ইংলণ্ডে কোন লিখিত শাসনতন্ত্র নাই বা সেখানকার উচ্চ বিচারালয়ের শাসন-কর্তৃপক্ষ বা আইনসভার কার্যের বৈধতা বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। ইংলণ্ডে কতিপয় অ-লিখিত আইন ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা নাগরিক অধিকারগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহায্য করে। ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় আইনের প্রাধান্য ও আইনের নিরপেক্ষতা নীতি (Rule of Law) বিশেষ কার্যকরী হইয়া নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত করিয়াছে। যদি কোন নাগরিক বিনা বিচারে শাসন-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বন্দী হয়, তাহা হইলে বন্দী ব্যক্তির আবেদনক্রমে বিচারালয় ঐ ব্যক্তির বিচার করিবার জন্য তাহাকে আদালতে উপস্থিত করিবার আদেশ দিতে পারে। বিনা বিচারে কাহারও ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট হইতে পারে না। ইংলণ্ডে আইনের চক্ষে সকল নাগরিকই সমান।

ক্ষমতার বিভাগ করিয়া (Separation of powers) অনেক সময় ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু ক্ষমতার এই বিভাগ ব্যক্তি-স্বাধীনতার একটি অপরিহার্য উপকরণ বলিয়া সর্বক্ষেত্রে গণ্য হইতে পারে না। গ্রেট বৃটেনে ক্ষমতার বিশেষ কোন বিভাগ নাই, তাহা সত্ত্বেও গ্রেট বৃটেনবাসী স্বাধীন।

নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থার দ্বারা (Independence of the Judiciary) ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব বলিয়া অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। বিচারালয়গুলি যদি শাসনবিভাগ ও আইনসভার নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হয়, তাহা হইলে ন্যায়বিচার সম্ভব হয়। ন্যায়বিচারের দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা যে অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রাখা যায় ইহা অনস্বীকার্য।

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় (Democracy) ব্যক্তি-স্বাধীনতা সর্বতোভাবে রক্ষিত হয়। এই শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি সাম্যের অধিকারী হইয়া স্বীয় অধিকার সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ থাকে। স্বাধীনতা কোন দিক দিয়া একটু বিপন্ন হইলে নিজেই তাহা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়। এই-জন্যই বলা হয় যে, নাগরিকগণের আত্মমনচেতনতাই হইল তাহাদের স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ।

ষষ্ঠ অধ্যায়
নাগরিকতা
(Citizenship)

নাগরিক সংজ্ঞা—Definition of a Citizen.

সাধারণ অর্থে নগরের অধিবাসীকে নাগরিক বলা হয়। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে যাহারা বাস করে তাহাদের ঐ শহরের নাগরিক বলা হয় ও নাগরিক হিসাবে তাহারা কতকগুলি সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়। কিন্তু বর্তমান যুগে 'নাগরিক' শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। নাগরিক শব্দটির একটি প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ নাগরিক শব্দটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রে বাস করিতেন। এই নগর-রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইত না। যে সমস্ত অধিবাসীর প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে যোগদান করিবার যোগ্যতা ও অপর্যাপ্ত সময় ছিল, তাহাদিগকেই নাগরিক আখ্যা দেওয়া হইত। সমাজের অবশিষ্টাংশ, যথা, ক্রীতদাস, মজুরশ্রেণী, স্ত্রীলোক প্রভৃতি যাহারা পরনির্ভরশীল বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহাদিগকে নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হইত না। এই জাতীয় নিম্নস্তরের লোকগুলিকে সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা হইত না ও সেইজন্য তাহারা নাগরিক অধিকার হইতেও বঞ্চিত থাকিত। সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রপরিচালনাকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার যোগ্যতাই ছিল নাগরিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বর্তমানকালে নাগরিক শব্দের ব্যবহার আর ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নাই। বর্তমান রাষ্ট্রগুলি প্রাচীন নগর-রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা আয়তনে ও জনসংখ্যায় বহুগুণ বৃহত্তর। নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইতে গেলে আর পূর্বের মতন কোন ব্যক্তির বিশেষ কোন যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। কোন রাষ্ট্রের সদস্য হইলেই তাহাকে বর্তমানে নাগরিক বলা হয়। যে লোক একটি রাষ্ট্রে স্থায়িভাবে বাস করিয়া সেই রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছে তাহাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলা হয়। নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইলে প্রত্যেক

ব্যক্তিই রাষ্ট্রের সদস্যরূপে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয় এবং অন্য-দিকে তাহাকে কতকগুলি কর্তব্য সম্পাদন করিতে হয়। সুতরাং বর্তমান রাষ্ট্র ইহার নাগরিকদের নিকট হইতে সক্রিয়ভাবে কোন কর্তব্যপালনের দাবী করে না। কিন্তু তাই বলিয়া যদি একথা মনে করা যায় যে, বর্তমান নাগরিকগণ শুধু কতকগুলি সুযোগ-সুবিধার অধিকারী, রাষ্ট্রসম্পর্কে তাহাদের কোনরূপ কর্তব্যসম্পাদনের বাধ্যবাধকতা নাই তাহা হইলে মারাত্মক ভুল হইবে। জনসমষ্টি লইয়াই রাষ্ট্র গঠিত হয়। প্রত্যেকটি লোক রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং রাষ্ট্রের উন্নতিসাধন করিয়া উন্নততর সমাজ-জীবন প্রবর্তনের জন্য প্রত্যেক নাগরিকেরই তৎপর হওয়া প্রয়োজন। সমষ্টিগত জীবন যাহাতে রাষ্ট্রের মাধ্যমে একটা আদর্শ স্তরে উন্নীত হইতে পারে সেইজন্য প্রত্যেক নাগরিকই এরূপ-ভাবে তাহার ব্যক্তিগত কার্যকলাপ পরিচালিত করিবে যাহাতে ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়েরই মঙ্গল সাধিত হয়। সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপে যোগদান না করিলেও প্রত্যেক নাগরিকেরই কিছু পরিমাণে ক্রিয়াশীল থাকা চাই। প্রত্যেক নাগরিকই তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিয়া সমষ্টিগত জীবনকে উন্নততর করিবার জন্য যত্নবান্ হইবে। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নাগরিকতা হইল ব্যক্তির মধ্যে কতকগুলি গুণের সমাবেশ—যে সমাবেশে সমাজ-জীবন সহজ ও সুগম হয়। এইজন্য অধ্যাপক ল্যাস্কি নাগরিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, নাগরিকতার সারমর্ম হইল—সাধারণের হিতার্থে ব্যক্তির শিক্ষা-দ্বারা-প্রাপ্ত মার্জিত বুদ্ধির প্রয়োগ। (Citizenship "is the contribution of one's instructed judgment to public good.") সমাজের প্রত্যেক নাগরিক এরূপভাবে তাঁহার চিন্তাধারা ও কার্যাবলী পরিচালিত করিবে যাহাতে জনকল্যাণ সাধিত হয়। এইজন্য অবশ্য প্রত্যেক নাগরিকেরই উপযুক্ত শিক্ষা পাওয়া চাই।

নাগরিক ও বিদেশী—Ctizen and Alien.

নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। বিদেশী ভিন্নদেশবাসী ও ভিন্ন রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে। যে দেশে বিদেশী কার্যব্যপদেশে সাময়িকভাবে বাস করে, সে দেশের সাধারণ বিধি-নিষেধ তাহাকে মানিতে হয় ও সেই দেশের প্রবর্তিত করও তাহাকে দিতে হয়। বিদেশী কতকগুলি পৌর অধিকার

ভোগ করিলেও তাহার কোন রাজনৈতিক অধিকার জন্মে না বা সে দাবী করিতে পারে না। বিদেশীকে অসদাচরণের জন্য দেশ হইতে বহিষ্কার করা যায়। কিন্তু বিদেশীকে বলপূর্বক যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য করা যায় না। বিদেশী সাময়িকভাবে যে দেশে বাস করে সে দেশ পরিত্যাগ করিলে তাহার জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা সম্বন্ধে সে রাষ্ট্রের আর কোন দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু নাগরিক জীবন সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়। নাগরিক স্বদেশেই থাকুক আর বিদেশেই থাকুক, সর্বত্রই তাহার নিজ রাষ্ট্র তাহার নিরাপত্তা রক্ষা করে। নাগরিক পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করে ও নাগরিক জীবনের সমস্ত দায়িত্ব—এমন কি প্রয়োজন হইলে যুদ্ধে যোগদান—তাহাকে পালন করিতেই হইবে।

পূর্ণ নাগরিক ও অসম্পূর্ণ নাগরিক—Citizen and National.

অনেক সময় ভোটদান-ক্ষমতাকে নাগরিকত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে করা হয়। যাহাদের এই ক্ষমতা আছে তাহাদিগকে নাগরিক বলা হয় আর যাহারা এই ক্ষমতার অধিকারী নয় তাহাদিগকে নাগরিক বলা হয় না। কিন্তু এ কথা সব সময় সত্য নয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রে একটা নির্দিষ্ট বয়সের জনগণ ভোটদানের অধিকারী হয়। ভারতবর্ষে একুশ বৎসর বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের ভোটাধিকার জন্মে। একুশ বৎসর বয়সের কম কোন স্ত্রী-পুরুষের এই ভোটদানের অধিকার নাই, সুতরাং উপরি-উক্ত মত অনুসারে তাহারা নাগরিক নহে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্থায়ী অধিবাসী প্রত্যেকেই এই রাষ্ট্রের নাগরিক। একুশ বৎসরের কম বলিয়া তাহাদিগকে অপ্রাপ্তবয়স্ক বলা হয়। তাহারা পূর্ণ নাগরিক না হইলেও নাগরিক পদবাচ্য। এইরূপ অপ্রাপ্তবয়স্ক ভোটদান-ক্ষমতা-বিহীন নাগরিককে অসম্পূর্ণ নাগরিক (National) বলা হয়।

নাগরিক ও নির্বাচক—Citizen and Elector.

অনেক রাষ্ট্র বিদেশীকে কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ভোটদান-ক্ষমতা প্রদান করে। বিদেশী ভোটদান করিতে পারে বলিয়া তাহাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলা চলে না, আর অপ্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক ভোটদান ক্ষমতাবিহীন বলিয়া তাহাকে নাগরিক বলিয়া গণ্য না করা কোন মতে সমীচীন নয়। যাহার ভোটদান ক্ষমতা আছে, তাহাকে নির্বাচক বলা হয়।

নাগরিক ও প্রজা—Citizen and Subject.

নাগরিক ও প্রজা উভয়েই রাষ্ট্রের অধিবাসী। কিন্তু নাগরিক শব্দটির সহিত একটা পদমর্যাদা ও কতকগুলি ন্যায়সঙ্গত অধিকারের দাবী ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে, কিন্তু প্রজাপদবাচ্য লোকের সেইরূপ কোন মর্যাদা বা অধিকারের দাবী স্বীকৃত হয় না। স্বৈরাচারী শাসনে জনগণের উপর শাসক তাহার নিজ ইচ্ছাকে বলপূর্বক কার্যকরী করে। স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থায় শাসিতের ইচ্ছার কোন স্থান নাই। শাসিত শাসকের সম্পূর্ণ পদানত। এই ব্যবস্থায় শাসিতের কোন অধিকার থাকে না আর অধিকার থাকিলেও সেগুলি শাসকের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার অন্তর্গত জনসাধারণকে সাধারণতঃ প্রজা আখ্যা দেওয়া হয়। ইংরাজ শাসনকালে ভারতীয়েরা বৃটিশ রাজ্যের প্রজা বলিয়া অভিহিত হইত। বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এইরূপ নিকৃষ্ট পদবাচ্য প্রজা শব্দটি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি—Modes of acquisition of Citizenship.

নাগরিক অধিকার দুই উপায়ে পাওয়া যায়—প্রথম, জন্মাধিকারে এবং দ্বিতীয়, অর্জনের দ্বারা। জন্মাধিকার দুই প্রকার—একটি হইল রক্তগত অধিকার (*Jus Sanguinis*), অপরটি হইল জন্মভূমিগত অধিকার (*Jus Soli*)। প্রথমোক্ত নীতি অনুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্মকালে তাহার পিতা যে দেশের নাগরিক ছিল সে সেই দেশের নাগরিক হইবে, তাহার জন্মস্থান যে-কোন দেশেই হউক না কেন। ভারতীয় পিতামাতার সন্তান পৃথিবীর যে-কোন দেশে জন্মগ্রহণ করুক না কেন ভারতীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। দ্বিতীয় নিয়মানুসারে যদি কোন ভারতীয় পিতামাতার সন্তান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে সে সন্তান তাহার পিতামাতা ভারতীয় হওয়া সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই নিয়মে জন্মভূমি বিচার করিয়া নাগরিকত্ব স্থির হয়।

যদি কোন রাষ্ট্র একই সঙ্গে এই দুইটি নীতি প্রয়োগ করিয়া নাগরিকত্ব স্থির করে, তাহা হইলে একই ব্যক্তি একই সময়ে দুইটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া কথা উঠিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পিতামাতার সন্তান

পৃথিবীর যে-কোন দেশে জাত হউক না কেন রক্তগত অধিকারের ভিত্তিতে তাহাকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হয়। অপর পক্ষে ভিন্ন দেশের পিতামাতার সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাত হইলে ভূমিগত অধিকারের বলে তাহাকেও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া দাবী করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে নাগরিক সাবালক হইয়া এক দেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করিয়া নিজ ইচ্ছানুসারে অন্য দেশের নাগরিক হইতে পারে।

স্ত্রীলোকগণ বিবাহের দ্বারা তাহাদের স্বামীর নাগরিকত্ব পায়। বৈবাহিক সম্বন্ধ ছাড়াও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারের অধীনে চাকুরী লইয়া, বহুদিন অপর রাষ্ট্রে বসবাস করিয়া বা ভিন্ন রাষ্ট্রে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া ও সামরিক বাহিনীতে যোগদান করিয়া নূতন নাগরিকের অধিকার পাওয়া যায়।

সকল রাষ্ট্রই বিদেশীর উপর নাগরিকত্ব অর্পণ করে। এইরূপে কোন দেশের জন্মগত নাগরিক যদি ভিন্ন রাষ্ট্রের অর্পিত নাগরিকত্ব অর্জন করে, তাহা হইলে তাহাকে অর্জিত নাগরিকত্ব (**Naturalized citizenship**) বলা হয়। বিবাহ, সম্পত্তি-ক্রয় বা সেনাবিভাগে যোগদান—সবগুলি উপায়ই হইল নাগরিক অধিকার অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি, কিন্তু এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে অর্পিত নাগরিকত্ব একটি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিতে হইলে বিদেশীকে কতকগুলি শর্ত পালন করিতে হয়। বিদেশী যে রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে ইচ্ছুক সে রাষ্ট্রের নিয়মানুযায়ী বিদেশীর সে দেশে একটি নির্দিষ্ট সময় বসবাস করিতে হয় ও তাহাকে সৎস্বভাবাপন্ন বলিয়া প্রমাণিত করিতে হয়। সে দেশের ভাষাভাষী হওয়ারও অনেক সময় প্রয়োজন হয়। এই শর্তগুলি পূরণ হইলে রাষ্ট্র ইহার ইচ্ছামত বিদেশীর উপর নাগরিকত্ব প্রদান করিতে পারে। এইরূপে নাগরিকত্ব অর্জন করিতে হইলে বিদেশীকে আবেদন করিতে হইবে এবং কোন বিচারালয় বা শাসন-বিভাগীয় উচ্চতর কর্তৃপক্ষ ঐ আবেদন বিচার করিয়া নাগরিকত্ব প্রদান সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করে।

এইরূপে নাগরিকত্ব অর্জিত হইলে বিদেশীও সেই দেশের জাত নাগরিকদের সমপর্যায়ভুক্ত হইয়া নাগরিক অধিকার ও বাধ্যবাধকতার দ্বারা আবদ্ধ হয়। সাধারণতঃ এই দুই শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি কয়েকটি দেশ কোন বিদেশী যুক্তরাষ্ট্রের

নাগরিকত্ব অর্জন করিলেও তাহাকেও সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করে না। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির পদ জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব প্রাপ্ত নাগরিক ব্যতীত অন্য কোন নাগরিক পাইতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নাগরিকত্ব—Citizenship in a Federal State.

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দ্বিবিধ শাসনযন্ত্রের—কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় অস্তিত্ব বর্তমান। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণকে যুগপৎ কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। নাগরিকগণ উভয় সরকার-প্রণীত আইন দ্বারা বাধ্য থাকে এবং উভয় সরকার প্রবর্তিত কর তাহাদিগকে প্রদান করিতে হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণের এইরূপ দ্বিবিধ নাগরিকত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা যে রাজ্যে বাস করে সেই রাজ্যের অধিবাসী হিসাবে তাহারা সেই রাজ্যের নাগরিক বলিয়া পরিচিত হয় এবং সেই রাজ্য-সম্পর্কিত নির্ধারিত অধিকার ও কর্তব্য দ্বারা তাহাদের পরিচালিত হইতে হয়। এতদ্ব্যতীত তাহারা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হয়। এখন প্রশ্ন হইলে যে, এই দ্বিবিধ নাগরিকত্বের কোন্‌টি মৌলিক ও শ্রেষ্ঠতর? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের চতুর্দশ সংশোধন আইন এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছে। এই সংশোধন আইন অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকত্বে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইয়াছে। নাগরিকগণ প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে এবং তাহারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়াই যে রাজ্যে বসবাস করে, সেই রাজ্যের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হয়। নাগরিক-গণ এক রাজ্যবিশেষের নাগরিকত্ব বর্জন করিয়া অন্য রাজ্যের নাগরিক হইতে পারে। শুধুমাত্র বাসস্থান দ্বারাই রাজ্যবিশেষের নাগরিকত্ব স্থির হয়। যুক্ত-রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন বা বর্জন করিতে হইলে নির্ধারিত আইনানুযায়ী পদ্ধতিতে তাহা সম্পন্ন করিতে হয়, কিন্তু কোন রাজ্যবিশেষের নাগরিকত্ব অর্জন বা বর্জন করিতে কোনরূপ আইনানুমোদিত পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। শুধুমাত্র বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া এক রাজ্যের নাগরিকত্ব বর্জন করিয়া অন্য রাজ্যের নাগরিকত্ব অর্জন করা হয়।

সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হইতে হইলে প্রথমে কোন ক্যাণ্টনের নাগরিক হইতে হয়। ক্যাণ্টনের নাগরিক হইলেই স্বভাবতঃই সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক

বলিয়া গণ্য হওয়া যায়। সুতরাং সুইস্ যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাণ্টনের নাগরিকত্ব হইল মুখ্য আর যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব হইল গৌণ।

জার্মানীতে ওয়াইমার শাসনতন্ত্র অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব মৌলিক ও প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইত।

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও সমগ্র ভারতে মাত্র একদফা ভারতীয় নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে যেখানে দ্বিবিধ নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হয়, সে সমস্ত দেশে ভোটাধিকার ও সরকারী কার্যে লোকনিয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারে প্রত্যেক রাজ্য নিজ নিজ নাগরিকগণের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে। কিন্তু ভারতে এক-নাগরিকত্ব স্বীকৃত হওয়ার ফলে নাগরিকগণের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেও নাগরিকগণকে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ সোভিয়েত নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হয়।

নাগরিক অধিকারের অবসান—Loss of Citizenship.

নূতন নাগরিকত্ব অর্জন করিলে পূর্ব নাগরিকত্বের অবসান ঘটে। বিবাহের দ্বারা স্ত্রীলোকের পূর্ব নাগরিকত্ব নষ্ট হয়। অপর দেশে জমি খরিদ বা বিদেশী সরকারের অধীনে চাকুরীগ্রহণ, দীর্ঘকাল স্বদেশে অনুপস্থিতি বা গুরুতর অপরাধে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার প্রভৃতি কারণে নাগরিক অধিকারের বিলুপ্তি ঘটিতে পারে।

পূর্ণ নাগরিক জীবনের অন্তরায়—Hindrances to good Citizenship.

নাগরিক জীবনের চরম সার্থকতা নির্ভর করে ব্যক্তিগত জীবনে কতকগুলি গুণের সমাবেশে। যে গুণগুলি থাকিলে সু-নাগরিক হওয়া যায় সেগুলি হইল বুদ্ধিমত্তা, আত্মসংযম, বিচারবুদ্ধি ও সমাজচেতনা। নাগরিককে সকল সময়ে নিজের অধিকার ও কর্তব্যসম্বন্ধে সমানভাবে সজাগ থাকিতে হইবে। অধিকার-সম্বন্ধে অত্যধিক উৎসাহী আর কর্তব্যসম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হইলে নাগরিক জীবন কখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। সু-নাগরিক নিজের অধিকার সম্বন্ধে যেরূপ সচেতন, অন্যের অধিকার সম্বন্ধেও তাহার অনুরূপ শ্রদ্ধাবান্

হওয়া উচিত। এইরূপ পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সম-সুখদুঃখবোধের দ্বারাই নাগরিক জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহার অভাবে নাগরিক জীবন আদর্শচ্যুত হইয়া ক্ষুদ্র দলাদলি ও কলহে লিপ্ত হইয়া উঠে। পূর্ণ-নাগরিক জীবনের যে সকল অন্তরায় আছে তন্মধ্যে উদাসীনতা (Indolence) হইল প্রধান। উদাসীনতার কারণ হইল কর্তব্যবোধের অভাব। নাগরিক জীবন যে শুধু কতকগুলি অধিকারের সমষ্টি নয়, একথা প্রত্যেক নাগরিকেরই স্মরণে রাখিতে হইবে। কি সাধারণ নাগরিক, কি সরকারী কর্মচারী প্রত্যেকেরই স্বীয় কর্তব্য-সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকিতে হইবে। সাধারণ নাগরিকের হয়ত অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বৃহৎ ও জটিল সমস্যাগুলির সমাধানে অংশ গ্রহণ করিবার যোগ্যতা না থাকিতে পারে; কিন্তু নিরপেক্ষভাবে ভোটদান করা, রাষ্ট্রের সাধারণ সমস্যাগুলির সমাধানে স্বাধীন মত ব্যক্ত করিয়া অংশ গ্রহণ করা, বা যুদ্ধের সময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সাহায্য করা বিষয়ে কোন নাগরিকেরই উদাসীন থাকা উচিত নয়। নাগরিকেরা যদি তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়া রাষ্ট্রপরিচালনা-কার্যে সাহায্য না করে, তাহা হইলে গণতন্ত্র একনায়কত্বে পরিণত হইয়া নাগরিক অধিকার পর্যন্ত ক্ষুণ্ণ করিতে পারে। আধুনিক গণতন্ত্র জনমত ও জনসহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জনগণ যদি এই সহযোগিতা-প্রদানে কার্পণ্য করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হওয়া স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ, নাগরিকগণ যদি অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হইয়া স্বার্থান্বেষণে ব্যস্ত থাকে তাহা হইলে এই স্বার্থপরতা (Private Self-interest) তাহাদের আদর্শ নাগরিক জীবনের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে। সমাজ-জীবনের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থকে বলি দিতে হইবে। নাগরিকগণ অনেক সময় যোগ্যতা বিচার না করিয়া আত্মীয়তা বন্ধনের জন্য অথবা অর্থলোভে অযোগ্য লোককে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। সরকারী চাকুরীতেও অনেক সময়ে যোগ্য ব্যক্তির নিয়োগ না হইয়া ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য অযোগ্য লোককে নিয়োগ করা হয়। এরূপ স্বার্থপ্রণোদিত কার্যের দ্বারা দেশের ও দশের অনিষ্ট করা হয়। এতদ্ব্যতীত দলগত রাজনীতি প্রবর্তিত হওয়ার ফলে দলীয় স্বার্থও (Party spirit) নাগরিক জীবনের এক অভিশাপরূপে দেখা দিয়াছে। দলীয় স্বার্থ যখন প্রবল হইয়া দেখা

দেয় তখন জাতীয় স্বার্থ নষ্ট হয়। দলীয় স্বার্থের হানাহানিতে অনেক দেশে বৃহত্তর জনকল্যাণের পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়াছে। এই দলীয় স্বার্থের প্রাবল্যে আয়ারল্যাণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশ দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে।

অন্তরায়গুলির প্রতিকার - Remedies.

পূর্ণ নাগরিক জীবনের অন্তরায়গুলিকে দূর করিতে পারিলে আদর্শ নাগরিক হওয়া যায়। লর্ড ব্রাইস্ এই সম্পর্কে দুইটি উপায়ের কথা বলিয়াছেন। প্রথম হইল, শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষসাধন এবং দ্বিতীয় হইল জনসাধারণের জীবনযাত্রার নৈতিক মানের উন্নয়ন। শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন বলিতে আমরা বুঝি প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভোটদানে বাধ্য করা, নাগরিকগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন করা, অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রতিনিধি নির্বাচন, অবিশ্বস্ত বা অযোগ্য সরকারী কর্মচারীদের শাস্তিবিধান, ইত্যাদি। শাসন-ব্যবস্থায় এই গুলি বলবৎ করা হইলে লোকের উদাসীনতা, দলীয় মনোভাব ও স্বার্থপরতা অনেক পরিমাণে দূর হইয়া তাহাদিগকে রাষ্ট্রের কার্যপরিচালনায় সক্রিয় করিয়া তুলিবে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অধিকতর প্রয়োজন হইল লোক-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করা। মানুষের মনে কর্তব্যবোধ জাগরিত করিতে হইবে। কর্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষ যখন কাজ করে তখন তাহার দ্বারা মহৎ অনেক কিছু সম্ভব হয়। মানুষের মধ্যে কর্তব্যবোধ সঞ্চারিত করিবার জন্য চাই শিক্ষার প্রসার। এই শিক্ষার ফলে নাগরিকগণ সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠিয়া সমাজ-জীবনকে উন্নততর করিতে পারে। প্রকৃত শিক্ষা ফলপ্রসূ হইতে হয়ত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষার বীজ সমাজদেহে একবার প্রোথিত হইলে আজই হউক আর কালই হউক রাজনৈতিক জীবনে সোনার ফসল ফলাইবে। ভারতীয় জনগণের নৈতিক মান যে আজ এত নীচু হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ হইল প্রকৃত শিক্ষার অভাব।

নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য—Rights and Duties of Citizenship.

সাধারণ অর্থে নাগরিক অধিকার বলিতে আমরা বুঝি নাগরিকের স্ব-ইচ্ছায় কিছু করিবার বা না-করিবার অবাধ ক্ষমতা। এই ক্ষমতা যাহাতে কার্যকরী হইতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা রাষ্ট্রের কর্তব্য। সাধারণ অর্থে

ব্যবহৃত এই নাগরিক অধিকার আর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। তস্কর মনে করে চৌর্যবৃত্তিতে তাহার অধিকার আছে। কিন্তু সমাজ যদি তস্করের এই অধিকার স্বীকার করিয়া লয়, তাহা হইলে সমাজ-জীবন অচল হইয়া উঠিবে। তাই রাষ্ট্রব্যবস্থায় তস্করের এই অধিকার অনধিকার বলা হয়। রাষ্ট্র তস্করের এই অধিকার স্বীকার করা দূরে থাকুক তাহা খর্ব করিয়া দেয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল আইনের দ্বারা সমাজে এরূপ পরিবেশের সৃষ্টি করা যে-পরিবেশে ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব করিয়া সমষ্টিগত জীবনের উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সকল অধিকার প্রয়োজন, সেগুলিকে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলা হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন, অধিকার হইল মানুষের সামাজিক জীবনের সেই সকল ক্ষমতা যেগুলির অভাবে মানুষ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং যে ক্ষমতাগুলি ব্যক্তির পূর্ণতাপ্রাপ্তির সহায়ক সেইগুলি প্রকৃত অধিকার, আর যেগুলি পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথে অন্তরায় সেগুলিকে অধিকার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। মানুষ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে এই অধিকারের দাবীতে। রাষ্ট্র এই অধিকারগুলি অক্ষুণ্ণ রাখে ও পরিবর্তে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে।

অধিকার ও কর্তব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক—Correlation of Rights and Duties.

কোন নাগরিক অধিকারই অবাধ বা অসীম নয়। সমাজ-জীবনে প্রত্যেকটি অধিকার একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে প্রয়োগ করিতে হয়, আর এই গণ্ডির সীমারেখা স্থির হয় অন্য লোকের অধিকারের দ্বারা। নাগরিকের যেমন কতকগুলি অধিকার আছে, সেইরূপ কতকগুলি কর্তব্য ও দায়িত্বও আছে। অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। আমার যেমন বাঁচিয়া থাকিবার, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার ও ধনসম্পত্তির নিরাপত্তার অধিকার আছে, অন্যেরও সেইরূপ অধিকার আছে। আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাই বলিয়া অন্যের বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারি না। আমার যেমন অধিকার আছে, সমাজের অন্য সকলেরও সেইরূপ অধিকার আছে এবং অন্যের সেই সকল অধিকারে হস্তক্ষেপ না করিবার দায়িত্ব আমার রহিয়াছে। আমার অধিকার রক্ষা করা যেমন অন্যের কর্তব্য, অন্যের

অধিকারে হস্তক্ষেপ না-করা তেমনি আমার কর্তব্য। তাই অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়া অপরটি থাকিতে পারে না। শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায়, অধিকার ও কর্তব্য একই আদর্শের দুইটি বিভিন্ন রূপ। প্রথমতঃ, বলা যায়, আমার যেটি অধিকার অন্যের পক্ষে তাহা কর্তব্য। আমার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে, এ কথার অর্থ হইল যে, অপর সকলের কর্তব্য হইল আমার জীবননাশ না-করা। দ্বিতীয়তঃ, অন্যের যাহা অধিকার আমার তাহা কর্তব্য। অন্য লোকের জীবনের অধিকার ক্ষুণ্ণ না-করা আমার কর্তব্য। তৃতীয়তঃ, আমার ও অন্য লোকের অধিকারগুলিকে রক্ষা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। সুতরাং ব্যক্তিগত অধিকারগুলি রক্ষা করা রাষ্ট্রের পক্ষে কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। চতুর্থতঃ, যেহেতু রাষ্ট্রই আমাদের অধিকারগুলির স্রষ্টা ও রক্ষক সেই হেতু আমাদের সকলের কর্তব্য হইল রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, সময়মত কর দেওয়া ও সর্বতোভাবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা। ব্যক্তির পক্ষে যাহা কর্তব্য রাষ্ট্রের পক্ষে সেগুলি অধিকার। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার অধিকারগুলি এরূপভাবে প্রয়োগ করিবে যাহাতে অন্যের অধিকার কোনমতে ক্ষুণ্ণ না হয়। অধিকারের এইরূপ প্রয়োগই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ করিয়া সামাজিক জীবনের অগ্রগতির পথ সুগম করিয়া দেয়।

নাগরিক অধিকারের প্রকারভেদ—Classification of Rights.

যে অধিকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় ও যেগুলি রাষ্ট্র আইন দ্বারা রক্ষা করে, সেইগুলিকে আইনগত অধিকার (Legal Rights) বলা হয়। এই আইনগত অধিকার ছাড়াও মানুষের কতকগুলি নৈতিক অধিকারের কথাও বলা হইয়া থাকে, যেমন বৃদ্ধ ও অক্ষম পিতামাতা পুত্রের দ্বারা পালিত হইবেন —এই অধিকার তাঁহারা দাবী করিতে পারেন। কিন্তু এই অধিকার নীতি-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা ভঙ্গ করিলে আইনতঃ কেহ শাস্তি পায় না। সেইজন্য এইগুলিকে নৈতিক অধিকার (Moral Rights বলা হয়।

প্রাকৃতিক অধিকার Natural Rights.

এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি অধিকারের উল্লেখ করা হয়, যেগুলি সাধারণতঃ প্রাকৃতিক বা মানুষের স্বভাবজাত অধিকার বলিয়া পরিচিত।

প্রাকৃতিক অধিকার মতবাদের সমর্থকগণ বলেন যে, প্রত্যেক মানুষই কতকগুলি সহজাত, চিরন্তন ও অপরিত্যাজ্য অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং এই অধিকারগুলি সে সমাজ বা রাষ্ট্র-নিরপেক্ষভাবে উপভোগ করে। মানুষের গাত্রচর্মের বর্ণ ও মানুষের চলৎশক্তি যেরূপ তাহার অবিচ্ছেদ্য অংশ প্রাকৃতিক অধিকারগুলিও তদ্রূপ মানুষের প্রকৃতির অংশ (They are as much a part of his nature as the colour of his skin and the power of locomotion.") মানুষের এই সহজাত ও অপরিত্যাজ্য অধিকার-গুলির মধ্যে 'জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার ও সুখের অনুসরণ করিবার অধিকার' উল্লেখযোগ্য।

গ্রীক দার্শনিকগণের লেখার মধ্যে এই মতবাদের উল্লেখ থাকিলেও এই মতবাদ চুক্তিবাদী দার্শনিক হব্‌স্‌, লক্‌ ও রুশো কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয়। উপরি-উক্ত তিনজন লেখক রাষ্ট্রজন্মের পূর্বে এক প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে মানব-জীবনের সূত্রপাত করেন। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের যে অধিকার ছিল, তাহাকে ইঁহারা প্রাকৃতিক বা স্বভাবজাত অধিকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু হব্‌স্‌ মানুষের যে অধিকারের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কোন দিক্‌ দিয়াই গ্রহণযোগ্য নহে। তাঁহার মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের যে অধিকার ছিল তাহা শুধু শ্রেষ্ঠতর শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং স্বীয় স্বার্থসাধনের নিমিত্ত মানুষ এই অধিকারগুলির প্রয়োগ করিত। হবস্‌-বর্ণিত প্রাকৃতিক স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র।

লকের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ পূর্ণ সাম্য ও স্বাধীনতার অধিকারী ছিল এবং এই স্বাধীনতা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাকৃতিক অধিকার-গুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার যে অসুবিধা ছিল তাহা দূর করিবার নিমিত্তই মানুষ চুক্তিবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্র গঠন করিল। তাহারা অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলিকে—যথা, জীবন, ধন ও স্বাধীনতা—সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের অবশিষ্ট অধিকারগুলি সমর্পণ করিল।

রুশোর মতেও প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ যে পূর্ণ সাম্য ও স্বাধীনতার অধিকারী ছিল চুক্তি দ্বারা তাহারা সেই অধিকারগুলি সমষ্টিগত ইচ্ছায় (General will) সমর্পণ করিয়া সমষ্টির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে প্রত্যেকে

পুনঃপ্রাপ্ত হইল। রুশোর মতে প্রাকৃতিক অধিকারগুলি অপরিত্যাজ্য নহে। সমষ্টিই হইল সকল অধিকারের উৎস।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও ফরাসী দেশের স্বাধীনতার ঘোষণায় এই প্রাকৃতিক অধিকার একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। মার্কিন দেশের স্বাধীনতার ঘোষণায় সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছিল যে, স্রষ্টা কর্তৃক মানুষের উপর কতকগুলি অপরিত্যাজ্য অধিকার অর্পিত হইয়াছে ("endowed by their creator with certain inalienable rights")। ফরাসী দেশে স্বাধীনতার ঘোষণার প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে, সকল মানুষই স্বাধীন ও সমান হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য হইল মানুষের এই জন্মগত সাম্য ও সমানাধিকার সংরক্ষণ করা। এই অধিকারগুলির মধ্যে স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তি ও নিরাপত্তার অধিকার এবং অত্যাচার প্রতিরোধ করিবার অধিকার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক কালের সমাজ-বিজ্ঞানিগণ এই মতবাদের এক নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সমাজ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে গিডিংস (Giddings) বলেন যে, প্রাকৃতিক অধিকার হইল সেই সমস্ত অধিকার যে অধিকারগুলি সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম দ্বারা প্রযুক্ত সমাজের পক্ষে প্রয়োজনের অধিকার এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, আইনানুমোদিত অধিকারগুলি যদি উপরি-ব্যাখ্যাত প্রাকৃতিক অধিকারগুলির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে তাহারা স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে না। সুতরাং গিডিংসের মতে প্রাকৃতিক অধিকারগুলি সহজাত, চিরন্তন বা অপরিত্যাজ্য হইতে পারে না। সমাজে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কনির্ণয়ের ক্ষেত্রেই একমাত্র এইগুলি প্রযোজ্য। সমাজনীতির সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া এই অধিকারগুলি উপভোগ করা যায়।

সমালোচনা—Criticism.

প্রাকৃতিক অধিকারগুলির বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা উপস্থাপিত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, 'প্রাকৃতিক' শব্দটির কোন সর্বজনগ্রাহ্য বা সর্ববাদিসম্মত সংজ্ঞা নাই। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, 'প্রাকৃতিক' শব্দটির একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞার অবর্তমানে কোন্ কোন্ অধিকারগুলি মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার-পর্যায়ভুক্ত তাহা নির্ধারণ করা অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বর্তমান বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত স্ত্রী ও পুরুষের সমানাধিকারের দাবী সম্পর্কে গুরুতর মতভেদ দেখা যায়। তৃতীয়তঃ, চুক্তিবাদী লেখকগণ রাষ্ট্রজন্মের পূর্বে যে অধিকারগুলির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র। সত্য বটে যে, মানুষ জন্মের সময় হইতে কতকগুলি অধিকার লইয়া ভূমিষ্ট হয়, কিন্তু এই অধিকারগুলিকে প্রকৃত অধিকার না বলিয়া শক্তিসম্ভূত কতকগুলি ক্ষমতা বলা অধিকতর সমীচীন। মানুষের এই সহজাত ক্ষমতাগুলি সমাজ-জীবনের প্রয়োজনে অধিকারে রূপান্তরিত হয়। মানুষ সামাজিক পরিবেশে তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে সমর্থ হয়। মানুষের সহজাত ক্ষমতাগুলি সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত ও সমর্থিত হইয়া অধিকারে পর্যবসিত হয় এবং এই অধিকারগুলি যুগপৎ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের উৎকর্ষসাধনে সহায়ক হয়। মানুষের সমাজ-জীবনের ধারা পরিবর্তনশীল—সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অধিকারগুলির পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। পূর্বে যাহা অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হইত বর্তমানে তাহা শুধু অনধিকার বলিয়া বিবেচিত হয় না—বর্তমানে সেগুলি দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। পূর্বে ভূম্যধিকারিগণের কৃষিভৃত্য রাখিবার অধিকার সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল, কিন্তু বর্তমান যুগে ভূম্যধিকারিগণের এই অধিকার অন্যায় ও অপরাধজনক বলিয়া বিবেচিত হয়।

উপরি-উক্ত সমালোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সমাজ-নিরপেক্ষ কোন অবাধ বা চিরন্তন অধিকার মানুষের থাকিতে পারে না। সমাজ হইল সকল অধিকারের উৎস ও রক্ষক। যে সামাজিক পরিবেশে মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশসাধনে সক্ষম হয়, সেই পরিবেশের সৃষ্টি ও সংরক্ষণ হইল রাষ্ট্রের কর্তব্য। সুতরাং প্রাকৃতিক অধিকার হইল সেই অধিকারগুলি, যে অধিকারগুলির সাহায্যে একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থায় সমষ্টির কল্যাণের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ব্যক্তিগত কল্যাণসাধন করা সম্ভব হয়।

পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার

আইনগত অধিকারগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা হয়; যথা—পৌর অধিকার (Civil Rights) ও রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights)। পৌর অধিকারগুলি মানুষের সভ্য জীবন যাপন করিবার পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এগুলির অভাবে মানুষ তাহার চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে সমর্থ হয় না। রাজনৈতিক অধিকারের দ্বারা মানুষ দেশের শাসন-পরিচালনা কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

পৌর অধিকার—Civil Rights.

নাগরিকগণের যে-সমস্ত পৌর অধিকারের দাবী স্বীকৃত হইয়াছে, সেগুলির তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :

১। জীবন রক্ষার অধিকার (The Right to Life). ২। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার অধিকার (The Right to personal Freedom). ৩। কাজ করিবার অধিকার (The Right to Work). ৪। সম্পত্তির অধিকার (The Right to Property). ৫। স্বাধীনভাবে আইনসঙ্গত চুক্তি করিবার অধিকার (The Right to Contract). ৬। বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও জমায়েৎ হইবার স্বাধীনতা (The Right to Speech, Press and Assembly), ৭। ধর্মাচরণের অধিকার (The Right to Religion and Conscience). ৮। বিবাহ করিয়া পরিবার গঠনের অধিকার (The Right to Marriage and Family life). ৯। শিক্ষার অধিকার (The Right to Education).

১। জীবন রক্ষার অধিকার—বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারই হইল মানুষের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান অধিকার। অন্যান্য অধিকারগুলির ভোগ এই অধিকারটির উপর নির্ভর করে। এই কারণে আত্মহত্যা করা সর্বদেশে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয়। আত্মরক্ষা করিবার অধিকারও জীবন ধারণের অধিকারের একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। কোন স্ত্রীলোক যদি নিজের সম্মান রক্ষার জন্য কোন আততায়ীর জীবন নাশ করে, তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোক হত্যাকারী বলিয়া বিবেচিত হয় না। মানবজাতির অস্তিত্ব যাহাতে বজায় থাকে, সেজন্য বিবাহ করিয়া বংশ বিস্তার করাও জীবন রক্ষার

অধিকারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু যে সমস্ত লোক পৈতৃক বা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত, রাষ্ট্র সে সমস্ত লোকের বিবাহ করিয়া বংশ বিস্তার করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে।

২। **ব্যক্তিগত অধিকার**—এই অধিকারটির তাৎপর্য হইল স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা ও দৈনন্দিন জীবনের কার্যসূচী স্থির করিবার অধিকার। মানুষের যদি এই অধিকারটি না থাকে তাহা হইলে তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটিতে পারে না। এই অধিকারটির মর্ম হইল যে, কোন ব্যক্তিকে আইনসম্মত পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোনভাবে গ্রেপ্তার বা আটক রাখা চলিবে না। শাসনকর্তৃপক্ষ যদি বে-আইনীভাবে কাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে বিচারালয়ের সাহায্যে (Writ of Habeas Corpus) শাসনকর্তৃপক্ষের কাজে বাধা দিবার ব্যবস্থা থাকে। তবে আপৎকালে বিচারালয়ের সাহায্য গ্রহণ আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকিতে পারে।

৩। **কাজ করিবার অধিকার**—কাজ করিয়া জীবিকা অর্জনের অধিকার জীবন রক্ষার অধিকারের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সমর্থ বেকার লোক সমাজের গলগ্রহস্বরূপ। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সমস্ত সমর্থ লোকের হিতকর কর্মসংস্থান সাহায্যে সকলকেই বাঁচিয়া থাকিবার এই প্রাথমিক অধিকারটি দান করা। যে রাষ্ট্র নাগরিকগণকে এই অধিকার দানে অক্ষম সে রাষ্ট্র নাগরিকগণের আনুগত্য দাবী করিতে পারে না। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এরূপভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক বিন্যস্ত হওয়া উচিত, যে ব্যবস্থায় ধনী ও দরিদ্রের ব্যাপক পার্থক্য দূর হইয়া সকলেরই গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা সম্ভব হয়। শ্রমিকের কর্মদক্ষতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার অনুকূল পরিবেশে নির্ধারিত সময় কাজ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ মজুরি পাইবার অধিকারও কাজ করিবার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। বহু দেশে বেকার সমস্যা সমাধানকল্পে নানা উপায় অবলম্বিত হইলেও এক সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কোন দেশে কাজ করিবার অধিকার আইনসঙ্গত অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

৪। **সম্পত্তির অধিকার**—এই অধিকারের বলে লোকে তাহার আয়ত্তাধীন দ্রব্যসমূহ স্বাধীনভাবে ভোগ-ব্যবহার করিতে পারে। সম্পত্তির

ভোগ-দখল ব্যতীতও লোকের নিজ সম্পত্তি দান, বিক্রয় ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতাও এই অধিকারটির অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান যুগে এই অধিকারটি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, যেহেতু এই অধিকারটি সমাজে অসাম্য সৃষ্টি করিয়া শ্রমবিমুখ এক নিষ্কর্মা সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থ চিরস্থায়ী করে, সেইহেতু এই অধিকারটির কোন নৈতিক সমর্থন থাকিতে পারে না। কিন্তু এই যুক্তির প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, অসদ্ উপায়ে অর্জিত সম্পত্তি সমর্থন-যোগ্য না হইলেও সমাজহিতকর কার্য সম্পাদনের পারিশ্রমিকরূপে যে সম্পত্তি অর্জিত হয়, তাহা সর্বক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য। সদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তির ভোগ-দখলের অধিকার স্বীকৃত না হইলে লোকের কাজের অনুপ্রেরণা নষ্ট হইবে এবং গঠনমূলক কার্যের মধ্য দিয়া বিভিন্ন লোকের বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের সম্ভাবনা রহিত হইবে। সুতরাং ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন না করিয়া সম্পত্তির ন্যায্য বণ্টন ও ভোগ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এমন কি, সাম্যবাদী সোভিয়েত দেশেও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। তবে এই অধিকারও অবাধ নহে। সরকার কর ধার্য করিয়া সম্পত্তির অংশ গ্রহণ করিতে পারে। সম্পত্তির মালিকানা ও ভোগ-দখল সরকার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। জাতীয় সংকটকালে সরকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি সাময়িকভাবে ব্যবহার করিতে পারে।

৫। **চুক্তি করিবার অধিকার**—এই অধিকারের ভিত্তিতে লোকে অপরের সহিত সমানভাবে ন্যায়সঙ্গত চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারে। এই অধিকারটি হইল আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি এবং এই অধিকার সাহায্যেই একটি জাতি অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী হইতে পারে কিন্তু উৎকোচ গ্রহণ বা দাস-ব্যবসায় প্রভৃতি বে-আইনী চুক্তি করিবার অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় না।

৬। **বাক্-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা** - বাক্-স্বাধীনতা সর্বদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক অধিকার বলিয়া পরিগণিত হয়, কারণ, এই অধিকারটি ব্যতীত মানুষের চিন্তাশক্তি ও কর্মক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ হইয়া মানুষ পূর্ণ নাগরিকত্ব অর্জন করিতে পারে না। এই অধিকারটির অবর্তমানে মানুষ চিন্তা ও ভাবের পারস্পরিক আদান-প্রদান দ্বারা উন্নত সমাজব্যবস্থা গঠন-

করিতে পারে না, ফলে সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সাফল্যের একটি অপরিহার্য উপাদান হইল বাক্-স্বাধীনতা—যে স্বাধীনতা প্রয়োগ করিয়া জনগণ তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার রক্ষা ও সরকারী অন্যায় ও অত্যাচার প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়।

বাক্-স্বাধীনতার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হইল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। বাক্-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার তাৎপর্য হইল যে, লোকে যাহা সত্য ও ন্যায় বলিয়া বিবেচনা করে তাহা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা। সংবাদ-পত্রের মধ্য দিয়াই এই মতামত অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রচারিত হওয়া সম্ভব। এইজন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সভা-সমিতির স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান বলিয়া পরিগণিত হয়।

অনেকের মতে যুদ্ধের সময় এই বাক্-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেশের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষাকল্পে সংকুচিত বা স্থগিত রাখা যাইতে পারে। কিন্তু এ যুক্তি শর্তহীনভাবে সমর্থনযোগ্য নহে। কোন সরকার যদি অন্যায়ভাবে বা দলীয় স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে অহেতুক যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে নাগরিকগণের কর্তব্য হইল এই সরকারের কার্য প্রতিরোধ করা। কোন ব্যক্তিকে বলপূর্বক সরকারী নীতি বা সরকারী কর্মপদ্ধতি সমর্থন করিতে বাধ্য করা গণতান্ত্রিক আদর্শসম্মত ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে না। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে যুদ্ধাবস্থায়ও নাগরিকগণের এই বাক্-স্বাধীনতার কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করা সমর্থনযোগ্য নহে।

নানাবিধ সংঘ গঠন করা ও সভা-সমিতিতে একত্রিত হইয়া আলাপ-আলোচনা করা মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, কারণ মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের সাধারণ স্বার্থের উপরই এই অধিকারটি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু রাষ্ট্র শান্তি-শৃংখলা রক্ষাকল্পে লোকের এই অধিকার সংকুচিত করিতে পারে।

৭। **ধর্মাচরণের অধিকার**—ইহার অর্থ হইল যে, অন্যের ধর্মমতে হস্তক্ষেপ না করিয়া বা শান্তি-শৃংখলা বা প্রচলিত নীতিবোধ লংঘন না করিয়া লোকে যে-কোন ধর্মমত পোষণ বা প্রচার করিতে পারে। ধর্ম হইল ব্যক্তিগত জীবনের একটি নিজস্ব ব্যাপার এবং এই কারণে রাষ্ট্র সাধারণতঃ লোকের ধর্মীয় জীবনে হস্তক্ষেপ করে না।

৮। **বিবাহ করিয়া পরিবার গঠনের অধিকার**—পরিবার গঠনের অধিকারের অর্থ হইল বিবাহ করিয়া সন্তান-সন্ততির পিতা হওয়া এবং পারিবারিক সম্পর্কের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখা। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার, কারণ পরিবারই হইল সমাজের প্রাথমিক সংগঠন এবং এই পারিবারিক সম্পর্কের অলংঘনীয়তা ও পবিত্রতার উপর সামাজিক জীবনের শান্তি-শৃংখলা নির্ভর করে। কিন্তু সামাজিক শান্তি-শৃংখলার পরিপন্থী কোন পারিবারিক অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় না। এই কারণে রাষ্ট্র অস্থায়ী বিবাহ-বন্ধন (Temporary Marriage) অনুমোদন করে না এবং অনেক রাষ্ট্র বহুবিবাহ সমর্থন করে না। রাষ্ট্র কতকগুলি পারিবারিক অধিকার স্বীকার করিলেও বিবাহিত জীবনের কতকগুলি বিশেষ করিয়া সন্তান-পালন সম্পর্কে কর্তব্য বলবৎ করে।

৯। **শিক্ষার অধিকার**—শিক্ষা ব্যতীত মানবচরিত্রের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নহে, তাই বর্তমান যুগে এই অধিকারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধিকার বলিয়া সভ্যদেশগুলিতে পরিগণিত হয়। শিক্ষা ব্যতীত নাগরিক চেতনার উন্মেষ হয় না। তাই রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার স্বাভাবিক প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার সুবিধা দান করা।

উপরি-উক্ত অধিকারগুলি প্রত্যেক ব্যক্তিই আইনতঃ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে দাবী করিতে পারে, কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই অধিকারগুলির কোনটিই অবাধভাবে প্রয়োগ করা চলে না। প্রত্যেক অধিকারই কর্তব্যের গণ্ডির দ্বারা সীমায়িত। আমার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে সত্য, কিন্তু আমি যদি অন্যের জীবননাশ করি তাহা হইলে আমার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার হইতে আমি বঞ্চিত হইব। আমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া যাহা সত্য বলিয়া মনে করি তাহা ব্যক্ত করিবার অধিকার আছে; কিন্তু আমার স্বাধীন মতামত এরূপভাবে ব্যক্ত করিতে হইবে যাহাতে অন্যের মতামত অভিব্যক্তির পথে অন্তরায় না হয়, বা অন্যের সুনাম নষ্ট না হয়, বা সমাজের শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা না থাকে। সেইরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র আমার এই স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে পারে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষাকল্পে সরকার অনেক সময় এই অধিকারগুলিকে সংকুচিত করিতে পারে। যে অধিকারগুলি প্রয়োগের ফলে সমাজ-

বিরোধী হিংসাত্মক-কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হইতে পারে বা শান্তি-শৃংখলাভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে, জনকল্যাণের জন্ত সরকার সে অধিকারগুলিও খর্ব করিতে পারে।

বর্তমান যুগে নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত ধারণার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। অধিকার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল যে, কোন অধিকারই অবাধ বা সমাজ-নিরপেক্ষ নহে। এতদ্ব্যতীত আরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, সর্বকালের জন্ত সুনির্দিষ্টভাবে এই অধিকারগুলির সংজ্ঞা নির্ণয় করা বা এইগুলির প্রয়োগের ক্ষেত্র স্থির করা যায় না। যেহেতু এই অধিকারগুলি একটা নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থায় স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়, সেই হেতু সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সহিত অধিকারগুলিরও পরিবর্তন ঘটে। মানুষের শিক্ষার অধিকার বা জীবিকা অর্জনের অধিকার পূর্বে স্বীকৃতিলাভ করে নাই বা বর্তমান জগতে বহুদেশে এই অধিকারগুলি স্বীকৃত হয় নাই। কালের বিবর্তনে বহুদেশে এই অধিকার স্বীকৃতি লাভ করিয়া মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। সুতরাং অধিকারগুলি গতিশীল —স্থিতিশীল নহে।

মৌলিক অধিকার—Fundamental Rights.

অধিকারগুলি পর্যালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অধিকারগুলি আপেক্ষিক ও প্রত্যেকটি অধিকার অন্যের অনুরূপ অধিকার ও সামাজিক হিতবোধ দ্বারা সীমায়িত—অর্থাৎ প্রত্যেকটি অধিকার ব্যক্তি কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে প্রযুক্ত হইবে। অধিকারগুলি অবাধ, অসীম বা চিরন্তন না হইলেও মানুষের এমন কতকগুলি প্রাথমিক অধিকার আছে, যেগুলি ব্যক্তিত্ববিকাশের অপরিহার্য অবস্থা বলিয়া সর্বদেশে স্বীকৃত হয় এবং এইজন্য এই অধিকারগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, স্বাধীন ধর্মমত পোষণ করিবার অধিকার প্রভৃতি এই পর্যায়ভুক্ত। বর্তমান যুগে এই অধিকারগুলি সকল সভ্য দেশের রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে এবং এই অধিকারগুলি সংরক্ষণের জন্ত রাষ্ট্রগুলি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। এই অধিকারগুলি যাহাতে অন্ত ব্যক্তি বা শাসনকর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতায় ব্যাহত না হয় তজ্জন্য

অনেক দেশে শাসনতন্ত্রে একটি অধিকারের সনদ (Bill of Rights) সংযোজনা করা হয়। অধিকারের সনদে মানুষের এই প্রাথমিক অধিকারগুলি – যেগুলির অভাবে কোন মানুষেরই ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করিতে পারে না — স্থান পায়। এই অধিকারগুলিকে বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে অন্যান্য অধিকার হইতে পৃথক করিয়া সংবিধান সন্নিবদ্ধ করা হয়। এইজন্য এই অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) বলা হয়। যদি কোন কারণে এই অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য শাসনতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি যে সমস্ত দেশে লিখিত শাসনতন্ত্রে অধিকারের সনদ দ্বারা অধিকারগুলি সুরক্ষিত হইয়াছে, সে সমস্ত দেশে প্রধান বিচারালয়ের বিচার-বিভাগীয় ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের উপর এই অধিকারগুলির নিরাপত্তা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। গ্রেট বৃটেনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত না হইলেও সে দেশের প্রচলিত আইন ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কার্য করে। আইনের দ্বারা জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষা করা হয়। গ্রেট বৃটেনের জাতীয় জীবনের নানারূপ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া নাগরিক অধিকারগুলি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং বিচারালয়গুলি এই সতঃস্ফূর্ত অধিকারগুলিকে স্বীকার করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করিয়াছে। শাসনতন্ত্র কর্তৃক সংরক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে এই অধিকারগুলি ব্যাহত হইতে পারে— এ কথা স্বীকার করিয়া লইলেও বলা যায় যে, শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত অধিকারগুলি সম্পর্কে ব্যক্তি যেরূপ অবহিত ও সচেতন থাকে, অন্যদিকে সেইরূপ শাসনকর্তৃপক্ষও এই অধিকার-গুলিকে কোনক্রমে ব্যাহত করিতে বিরত থাকে। এইরূপে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া লিখিত শাসনতন্ত্র ব্যক্তিগত অধিকার ও শাসনকর্তৃপক্ষের ক্ষমতার সামঞ্জস্যবিধানে সহায়তা করে।

রাজনৈতিক অধিকার—Political Rights.

নাগরিকগণ নিম্নলিখিত রাজনৈতিক অধিকারগুলি ভোগ করিয়া থাকেন :

১। প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার (Right to vote). ২। সরকারী

কার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার (Right to hold Public Offices). ৩। সরকারের অনুসৃত নীতি ও কার্যপদ্ধতির সমালোচনা করিবার অধিকার (Right to criticise the Government).

১। **ভোটদান করিবার অধিকার**—এই অধিকারের অর্থ হইল যে, প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তি নির্বাচনকালে ভোটদান করিয়া কোন্ ব্যক্তি সরকারী কার্যে উপযুক্ত তাহা স্থির করিতে পারিবে। ভোটদান ক্ষমতা হইল গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার মূল নীতি। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায়ও এই ভোটদান অধিকার সকল নাগরিকের উপর অর্পিত হয় না। নাবালক, দেউলিয়া, কয়েক শ্রেণীর দুর্বৃত্ত এবং অনেক দেশে স্ত্রীলোকগণকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। কিন্তু আদর্শ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় জাতি-বর্ণ-ধর্ম ও স্ত্রী-পুরুষ বা শিক্ষা ও সম্পত্তির মালিকানা-নির্বিচারে এই ভোটদান ক্ষমতা অর্পিত হওয়া উচিত। যে শাসন-ব্যবস্থায় ভোটদানের অধিকার নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সে শাসন-ব্যবস্থায় সার্বজনীন কল্যাণ ব্যাহত হয়।

২। **সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার**—উপযুক্ত যোগ্যতা-সম্পন্ন হইলে জাতি, ধর্ম ও স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইতে পারে। সকলকেই এ সম্পর্কে সমান অধিকার দান করিতে হইবে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদের জন্য উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন হইলে একজন দরিদ্র ব্যক্তি একজন ধনী ব্যক্তির সমান বিবেচিত হইবে।

৩। **প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবার অধিকার**-প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির যেরূপ ভোটদান করিবার অধিকার আছে, তদ্রূপ তাহার ভোট পাইবার অধিকারও আছে। আইনসভায় বা স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির সভায় প্রত্যেক ব্যক্তিই নির্বাচিত হইতে পারে। তবে নির্বাচিত হইতে গেলে তাহাদের একটা নির্দিষ্ট বয়স্ক হওয়া চাই ও প্রয়োজনীয় অন্য যোগ্যতার অধিকারী হইতে হয়।

৪ **সরকারী কাজের সমালোচনা করিবার অধিকার**-নাগরিকগণ অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য ও শাসন-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আইন-সঙ্গতভাবে সরকারের কার্যের সমালোচনা করিতে পারে। গণতান্ত্রিক

শাসন-ব্যবস্থায় শাসকবর্গ শেষ পর্যন্ত শাসিতের নিকট দায়ী। সুতরাং শাসক-শ্রেণী শাসিতের ন্যায়সঙ্গত অভাব-অভিযোগ উপেক্ষা করিতে পারে না।

অর্থনৈতিক অধিকার—Economic Rights.

বর্তমান যুগে মানুষের অর্থনৈতিক অধিকারগুলির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই অধিকারগুলি ব্যতীত রাজনৈতিক অধিকার সার্থক হইতে পারে না। মানুষ যদি সর্বদা অনশন, বেকার ও আশ্রয়হীন হইবার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে তাহা হইলে এরূপ ব্যক্তির নিকট ভোটাধিকার বিড়ম্বনা মাত্র।

যোগ্যতা অনুসারে কার্যে নিযুক্ত হইবার, নির্ধারিত সময় কাজ করিয়া উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইবার ও উপযুক্ত অবসর লাভের দাবী অর্থনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির ভোটদান ক্ষমতা থাকিলেও সে ক্ষমতা সে যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে অক্ষম। তাহার পক্ষে জাতীয় বা স্থানীয় আইনসভাগুলিতে সদস্য নির্বাচিত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং কাজ করিয়া জীবিকা অর্জনের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা বা ধর্মাচরণের স্বাধীনতা মূল্যহীন।

অর্থনৈতিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সমাজে এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে সকলের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অভাব পূরণের সামগ্রী না হওয়া পর্যন্ত মুষ্টিমেয়ের জন্য প্রাচুর্য থাকিতে পারিবে না। এরূপ সমাজব্যবস্থায় কোন শ্রেণীবিশেষের আধিপত্য থাকিতে পারিবে না। অর্থনৈতিক অধিকার-যুক্ত সমাজব্যবস্থায় শ্রমিক শুধু শ্রমের বিক্রেতা ও অপরের আজ্ঞাবহ বলিয়া পরিগণিত হয় না। এরূপ সমাজব্যবস্থায় শ্রমিক সমাজ-হিতকর উৎপাদক হিসাবে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। সুতরাং অর্থনৈতিক অধিকারের তাৎপর্য হইল উৎপাদন ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের প্রবর্তন। উৎপাদন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রবর্তন দুইটি অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, শ্রমিকগণের কাজ করিয়া উপযুক্ত মজুরি পাইবার, বিশ্রামলাভের, অসুস্থ, বেকার বা আকস্মিক বিপদ অবস্থায় সাহায্য পাইবার, শ্রমিক সংঘ গঠন করিবার প্রভৃতি অধিকার। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিক-গণের উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার। শ্রমিকগণের যদি উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের কোন অধিকার না থাকে তাহা হইলে তাহাদের

কর্মে অনুপ্রেরণা নষ্ট হইয়া তাহারা উৎসাহহীন নিস্পৃহ কর্মীতে পর্যবসিত হইবে। যে উৎপাদন ব্যবস্থা অনশন বা বেকার ভয়ে ভীত কর্মিবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত হয়, সে উৎপাদন ব্যবস্থা কখনই দক্ষ বা স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এরূপ ব্যবস্থায় মানবিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত না হইয়া শুধু ক্ষুণ্ণ হয়।

অধিকারের আইনগত ভিত্তি—Legal basis of Rights.

রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা অর্থাৎ অবাধ ও অসীম ক্ষমতা হইল ব্যক্তিগত অধিকারের একমাত্র উৎস। এই মতবাদে বলা হয় যে, ব্যক্তির অধিকারের অর্থ হইল ব্যক্তির এমন কতিপয় দাবী যাহা বিচারালয়ের নির্দেশে রাষ্ট্র কর্তৃক বলবৎ করা হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, রাষ্ট্রই ব্যক্তিগত অধিকারের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া ইহার পরিধি ও কার্যক্ষেত্র স্থির করিয়া দেয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অধিকারগুলি রাষ্ট্র হইতে উদ্ভূত এবং রাষ্ট্র ব্যতীত কার্যকর করা যায় না। রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিয়া এই আইনের সাহায্যে অধিকারগুলি ব্যক্তির পক্ষে সহজলভ্য করে। যেহেতু আইনের সাহায্যে অধিকারগুলির সৃষ্টি হয় এবং বলবৎ করা হয়, সেই হেতু আইনের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটিলে, অধিকারগুলির প্রকৃতি ও তাৎপর্যের পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং অধিকারগুলি একান্তভাবে আইনের উপর নির্ভরশীল।

অধিকারের উপরি-উক্ত নিছক আইন-ভিত্তিক ব্যাখ্যা দ্বারা অধিকারগুলির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া সম্ভব নহে। কোন নির্দিষ্ট কালে কোন সমাজে ব্যক্তি যে অধিকারগুলি আইনের বলে কার্যতঃ ভোগ করিতে পারে তাহা নিশ্চয়ই তাহার যে সমুদয় অধিকার ভোগ করা উচিত তাহার সমান নাও হইতে পারে। বর্তমানে শিক্ষার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার বলিয়া সকল সভ্য সমাজে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু অনেক সমাজে শিক্ষার এই অধিকার আইনের সাহায্যে সৃষ্টি হয় নাই বা স্বীকৃতি লাভ করে নাই। সুতরাং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য যে সমুদয় অধিকার একান্তভাবে অপরিহার্য তাহা শুধুমাত্র আইন দ্বারা সৃষ্ট ও স্বীকৃত অধিকারের দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয়। ইহা ব্যতীত বলা যায় যে, মানুষ প্রকৃতি ও প্রয়োজনের তাগিদে সমাজমধ্যে বহুবিধ সংঘ গঠন করিয়াছে। এই বিভিন্ন সংঘগুলি সম্পর্কেও মানুষের

বিভিন্ন অধিকার আছে যে অধিকারগুলিও তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে। সুতরাং একমাত্র রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা স্থিরীকৃত অধিকারগুলি ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। পরিশেষে বলা যায় যে, অধিকারের ধারণার প্রকৃত উৎস হইল সামগ্রিকভাবে সামাজিক হিতাহিত বোধ। আইন নির্দিষ্ট সময়ের সামাজিক চিন্তাধারার প্রতিবিম্ব। সুতরাং অধিকারগুলিও এই সামাজিক চিন্তাধারার অভিব্যক্তি মাত্র – রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা সৃষ্ট নহে।

শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অধিকারের নিছক আইন-ভিত্তিক ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নহে। আইন-ভিত্তিক অধিকার ব্যতীতও নৈতিক অধিকার সমগ্র সমাজব্যবস্থায় অপরিহার্য।

অধিকারের অর্থনীতিভিত্তিক সংজ্ঞা—Economic View of Rights.

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লেখকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে অধিকার সংজ্ঞাটির বিশ্লেষণ করিয়াছেন। যে-কোন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অধিকার সংজ্ঞাটি ব্যাখ্যা করা হউক না কেন, অধিকার সম্পর্কে প্রধান কথাটি হইল যে, যেহেতু রাষ্ট্র প্রণীত আইন সাহায্যে অধিকারগুলি স্বীকৃত ও বলবৎ করা হয়, সেই হেতু অধিকারগুলির রূপ ও প্রকৃতি আইনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। সুতরাং অধিকারগুলির প্রকৃতি জানিতে হইলে আইনগুলির প্রকৃতি জানা প্রয়োজন।

কোন দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রচলিত আইনগুলির কোন সার্বজনীন রূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কার্ল মার্কস প্রভৃতি সমাজতন্ত্রবাদী লেখকদের মতে আইন হইল একটি নির্দিষ্ট সময়ে শ্রেণীবিশেষের স্বার্থে রচিত কতিপয় আচরণ-বিধি। যে শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম সেই শ্রেণীর স্বার্থেই আইন রচিত হয়। সাধারণভাবে বলিলে বলা যায় যে, যে শ্রেণীর হস্তে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, সেই শ্রেণীই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা দখল করিয়া তাহাদের স্বার্থে আইন প্রণয়ন করে। ইহাদের মতে দেশের ধনবণ্টন ব্যবস্থার উপরই আইনের কাঠামো নির্ভর করে। অর্থনৈতিক ক্ষমতা যদি স্বল্প সংখ্যক ভূম্যধিকারী ও ধনিক শ্রেণীর

হস্তে কেন্দ্রীভূত হয় তাহা হইলে এই শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করিয়া তাহাদের শ্রেণীসার্থ পুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে। এরূপ ক্ষেত্রে অধিকারের অর্থ হইল শ্রেণীবিশেষের আইন দ্বারা সুরক্ষিত কতকগুলি বিশেষ সুবিধা। এক্ষেত্রে বিত্তহীন শ্রেণীর অধিকার বিশেষভাবে সংকুচিত হয়। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে সমাজ-ব্যবস্থা গঠিত না হইলে সার্বজনীন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

অধিকারের উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা সাহায্যে ধনবণ্টন ব্যবস্থায় যে গুরুতর বৈষম্য আছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায় এবং এই বৈষম্য দূরীভূত না হইলে অধিকারের সার্বজনীন রূপায়ণ সম্ভব নয় তাহা বিশেষভাবে বুঝিতে পারা যায়। তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বর্তমান যুগে অধিকারগুলির স্রষ্টা ও প্রবর্তনকারী আইন শুধু একটি মাত্র শ্রেণীর প্রভাবে রচিত হয় না। আইন প্রণয়নে অল্পবিস্তর পরিমাণে সামাজিক অন্যান্য শক্তিরও প্রভাব দেখা যায়। তাই প্রায় সব দেশেই আইন প্রণয়নে বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা দেখা যায়।

নাগরিকের কর্তব্য—Duties of Citizens

নাগরিক কর্তব্য বলিতে বুঝায়, যে কর্তব্যগুলি নাগরিকের পক্ষে অবশ্য করণীয়—যেগুলি পালন না করিলে আইনসঙ্গতভাবে শাস্তি পাইতে হয়। নাগরিক যেরূপ রাষ্ট্রের নিকট হইতে অধিকার দাবী করে, রাষ্ট্রও তদ্রূপ নাগরিকের নিকট কতকগুলি কর্তব্যপালনের দাবী করিতে পারে। এই কর্তব্যগুলি হইল—

আনুগত্য - Allegiance.

প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হইল রাষ্ট্রের প্রতি একনিষ্ঠভাবে আনুগত্য প্রদর্শন করা। আনুগত্যের অর্থ হইল, রাষ্ট্রের কার্যে বাধা না দিয়া সর্বতোভাবে রাষ্ট্রকে সাহায্য করা। অপরাধ নিবারণ ও অপরাধীদের গ্রেপ্তার কার্যে, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কার্যে, অন্তর্বিপ্লব ও বহিরাক্রমণ হইতে রাষ্ট্র রক্ষা-কার্যে সাহায্য করা প্রত্যেক নাগরিকেরই গুরুদায়িত্ব বলিয়া সর্বদেশে বিবেচিত হয়।

রাষ্ট্রের আইন মান্য করিয়া চলা—Obedience to laws.

রাষ্ট্র আইনের দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করে। সুতরাং ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের আইন মানিয়া চলা উচিত। কোন ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের মতে যদি কোন আইন অন্যায় বা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে জনমত সৃষ্টি করিয়া নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সে আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে হইবে।

কর প্রদান—Payment of taxes.

আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও জনহিতকর কার্যসম্পাদনের জন্য রাষ্ট্রের প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। জনগণের প্রদত্ত কর হইতে এই অর্থ সংগৃহীত হয়। সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনা-কার্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেইজন্য প্রত্যেকের দেয় কর সময়মত রাষ্ট্রকে প্রদান করিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক নাগরিকের ভোটদান-ব্যাপারে অবহিত হইতে হইবে। ভোটদান করা শুধু একটা নাগরিক অধিকার নয়, ইহা নাগরিকের পক্ষে একটা গুরু দায়িত্ব বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। সুতরাং সততা ও সুবিবেচনাসহকারে এই দায়িত্ব পালন করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। সমাজ-জীবন যাহাতে উন্নততর হয় সেইজন্য নাগরিকগণের সর্বদা সচেতন থাকা উচিত। প্রয়োজনমত সরকারী কার্যে সাহায্য করা নাগরিকদের অবশ্য কর্তব্য। এইজন্য সর্বদেশে জুরীর বিচার প্রবর্তিত আছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা কোন কারণে বিপন্ন হইলে নাগরিকগণের কর্তব্য হইল নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া রাষ্ট্রকে রক্ষা করা। রাষ্ট্র সকল অধিকারের উৎস। রাষ্ট্রের অবর্তমানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। তাই রাষ্ট্রকে রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকেরই অবশ্য কর্তব্য।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিবার বিভিন্ন উপায়—Safeguards of Liberty.

স্বাধীনতা ব্যক্তিত্ববিকাশের অপরিহার্য সহায়ক বলিয়া সর্বদেশে বিবেচিত হয়, সেইজন্য সকল দেশেই এই ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশে একটা সুনির্দিষ্ট লিখিত শাসনতন্ত্রের সাহায্যে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শাসনতন্ত্রে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলি সুসংবদ্ধভাবে লিখিত হইয়াছে। এই অধিকারগুলির কোনটি যদি শাসনকর্তৃপক্ষের কার্য দ্বারা ব্যাহত হয় তাহা হইলে নাগরিকগণ সুপ্রীম কোর্টে ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে ও এই আদালতের নির্দেশ অনুসারে শাসনকর্তৃপক্ষের কার্য পরিচালনা করিতে হইবে। সুতরাং অনেক দেশে লিখিত শাসনতন্ত্র ও উচ্চ বিচারালয় ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে।

কিন্তু ইংলণ্ডে কোন লিখিত শাসনতন্ত্র নাই বা সেখানকার উচ্চ বিচারালয়ের শাসনকর্তৃপক্ষ বা আইনসভার কার্যের বৈধতা বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। ইংলণ্ডে কতিপয় অ-লিখিত আইন ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা নাগরিক অধিকারগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহায্য করে। ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় আইনের প্রাধান্য ও আইনের নিরপেক্ষতা নীতি (Rule of Law) বিশেষ কার্যকরী হইয়া নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত করিয়াছে। যদি কোন নাগরিক বিনা বিচারে শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক বন্দী হয়, তাহা হইলে বন্দী ব্যক্তির আবেদনক্রমে বিচারালয় ঐ ব্যক্তির বিচার করিবার জন্য তাহাকে আদালতে উপস্থিত করিবার আদেশ দিতে পারে। বিনা বিচারে কাহারও ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট হইতে পারে না। ইংলণ্ডে আইনের চক্ষে সকল নাগরিকই সমান।

ক্ষমতার বিভাগ করিয়া (Separation of powers) অনেক সময় ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু ক্ষমতার এই বিভাগ ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার একটি অপরিহার্য উপকরণ বলিয়া সর্বক্ষেত্রে গণ্য হইতে পারে না। গ্রেট বৃটেনে ক্ষমতার বিশেষ কোন বিভাগ নাই, তাহা সত্বেও ইংলণ্ডবাসী স্বাধীন।

নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থার দ্বারা (Independence of the Judiciary) ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব। ন্যায় বিচার সাহায্যে সকলের সমানাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়।

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় (Democracy) ব্যক্তি-স্বাধীনতা অধিকতর সুরক্ষিত হয়। এই শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিই সাম্যের অধিকারী হইয়া স্বীয় অধিকার সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকে। নাগরিকগণের এই আত্ম-সচেতনতাই হইল তাহাদের স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ। "(Eternal vigilance is the price of liberty)".

ভারতের সংবিধানে সংরক্ষিত মৌলিক অধিকারসমূহ—Fundamental Rights guaranteed by the Indian Constitution.

স্বাধীন ভারতের সংবিধানের একটি প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হইল যে, ইহার দ্বারা ভারতীয় নাগরিকগণের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় এই অধিকারগুলি জনসাধারণের আত্ম উপলব্ধির অপরিহার্য উপাদান বলিয়া গণ্য হয়। ভারতের সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ১২ হইতে ৩৫ ধারায় মৌলিক অধিকারগুলি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে নির্দেশাত্মক নীতি নামকরণে আরও কতিপয় বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। ভারতের সংবিধানে সাত দফা মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ ও স্বীকৃত হইয়াছে। অধিকারগুলি হইল :

১। সাম্যের অধিকার—Right of Equality.

২। স্বাধীনতার অধিকার—Right to Freedom.

৩। শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার—Right against Exploitation.

৪। ধর্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতার অধিকার—Right to Freedom of Religion.

৫। সংস্কৃতিগত ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার—Cultural and Educational Rights.

৬। সম্পত্তির অধিকার—Right to Property.

৭। শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকার—Right to Constitutional Remedies.

এখন প্রত্যেকটি অধিকার পৃথকভাবে আলোচনা করা যাউক।

১। সাম্যের অধিকার—Right of Equality.

এই অধিকার আলোচনা করিবার পূর্বে 'সাম্য' কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য জানা প্রয়োজন। সাধারণ অর্থে সাম্য বলিতে বুঝায় সকল মানুষই সমান। কিন্তু বাস্তব জীবনে দেখা যায় কি শারীরিক, কি মানসিক গঠনে কোন দুই ব্যক্তিই সমান নয়। মানুষ অসমান হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। সকল ব্যক্তিকেই যে সমান হইতে হইবে বা সমান করিতে হইবে—ইহাও সাম্যের অর্থ নয়।

সাম্যের প্রকৃত অর্থ হইল, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার বংশ, পদমর্যাদা, জাতি-ধর্ম-নির্বিচারে সমান সুযোগ (Equal opportunity) দিতে হইবে। একদিকে রাষ্ট্র যেমন সকলকে তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সমান সুযোগের অধিকার দান করিবে অন্যদিকে তদ্রূপ ব্যক্তিবিশেষকে বা সম্প্রদায়বিশেষকে বৈষম্যমূলক সুযোগ দান করিতে পারিবে না। রাষ্ট্র কোন কারণে কাহাকেও বিশেষ সুযোগের অধিকারী করিবে না বা কোন কারণে কাহাকেও ন্যায্য সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবে না।

ভারতের সংবিধানের ১৪ ধারায় এই সাম্যের নীতি ঘোষিত ও স্বীকৃত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ভারতে সকলেই আইনের চক্ষে সমান এবং আইন সকলকেই সমানভাবে রক্ষা করিবে। অন্যান্য দেশের সংবিধানে অধিকারের তালিকায় এই অধিকারটি প্রায় সমভাবে স্থান পাইয়াছে। বিখ্যাত ইংরাজ ভাষ্যকার ডাইসি ইংলণ্ডের আইনের অনুশাসন (Rule of Law) বিধির যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তদনুসারে বলা যায় যে, সাম্যের অধিকারের অর্থ হইল কোন ব্যক্তিই আইনের ঊর্ধ্বে নহে। পদমর্যাদা নির্বিচারে সকল ব্যক্তিই আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং একই বিচারালয়ের অধীন। অবশ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই আইনগত সমতার নীতি সমভাবে প্রযুক্ত না হইতে পারে। আয়কর ধার্য করিবার কালে সরকার বিভিন্ন আয়ের ব্যক্তিগণকে শ্রেণী বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ ব্যাপারে পৃথকাচরণ করেন। এই শ্রেণীবিভাগ অবশ্য পক্ষপাতশূন্য ও যুক্তিসম্মত হওয়া চাই এবং একই শ্রেণীভুক্ত লোকের মধ্যে পার্থক্যমূলক কোনরূপ আচরণ করা সমতা-বিরোধী হয়।

এস্থলে একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ভারতে বিচারব্যবস্থা এরূপ দীর্ঘায়িত ও ব্যয়বহুল যে, এ দেশে বিচার ক্রয়-বিক্রয় হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র। তাহাদের পক্ষে বিচার ক্রয় করা আদৌ সম্ভব নয়। সুতারাং অধিকাংশ লোকের পক্ষে এই সাম্য-নীতি প্রযোজ্য নহে। সাম্য-নীতি সার্থক করিতে হইলে বিচার-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দরিদ্রগণ যাহাতে ধনিগণের অনুরূপ ন্যায় বিচার পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

এতদ্ব্যতীত ভারতের ক্ষেত্রে আর একটি দৃষ্টিকোণ হইতে এই সমতানীতি

প্রযোজ্য নহে। রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালগণ যতদিন পর্যন্ত স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন ততদিন পর্যন্ত তাঁহাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা চলিতে পারে না বা বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া দেওয়ানী মামলা রুজু করা যায় না।

সংবিধানের ১৫ ধারা অনুসারে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-স্ত্রী-পুরুষ ও জন্মস্থান-নির্বিশেষে সকল নাগরিকেরই সমান অধিকার-সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। সকল নাগরিকেরই (ক) দোকান, সাধারণের ব্যবহার্য রেস্তোঁরা, হোটেল ও প্রমোদস্থলে প্রবেশাধিকার থাকিবে। (খ) কূপ, পুষ্করিণী, অবগাহন স্নান, রাস্তা ও আশ্রয়স্থান ব্যবহারের পূর্ণ অধিকার থাকিবে। পরবর্তী কালে কয়েকটি সংশোধনী আইনের বলে স্ত্রীলোক, শিশু ও অনুন্নত শ্রেণীর জন্য বিশেষ সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে সকলকে সমানাধিকার দিতে হইবে, কিন্তু রাষ্ট্র অনুন্নত শ্রেণীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অর্থাৎ আসন নির্দিষ্ট রাখিতে পারিবে। ইহা ছাড়া, রাজ্য সরকারের কোন চাকুরির ব্যাপারে নিয়োগক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট আইন পাস করিয়া বাসস্থানের যোগ্যতার শর্ত স্থির করিয়া দিতে পারে।

মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত অস্পৃশ্যতা-বর্জন-নীতি সংবিধানের ১৭ ধারায় স্বীকৃত হইয়াছে। যে-কোন আকারের অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং অস্পৃশ্যতার জন্য কোন ব্যক্তির উপর কোনরূপ অক্ষমতা আরোপ করা আইনতঃ দণ্ডনীয় করা হইয়াছে। কিন্তু নূতন সংবিধানে অস্পৃশ্যতার কোন-রূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয় নাই। তৎসত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, সমাজদেহ হইতে অস্পৃশ্যতা রূপ দুষ্ট ব্যাধি দূর করিয়া ভারতের সংবিধান ভারতে প্রকৃত সাম্যের অগ্রগতির পথ সুগম করিয়াছে। মানুষের সমাজ-চেতনা ও সহমর্মিতার উপরই এই ধারাটির কার্যকারিতা বহুলাংশে নির্ভরশীল।

সামাজ-ব্যবস্থায় সাম্যভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিক-গণকে কোন উপাধি বা পদবী প্রদানের প্রথা রহিত করা হইয়াছে। ভারতীয় নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্র-প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ করিতে পারিবে না। ভারত রাষ্ট্রের কার্যে নিযুক্ত বিদেশীগণও রাষ্ট্রপতির অনুমতি ব্যতীত কোন খেতাব গ্রহণ করিতে পারিবে না। কেবলমাত্র সামরিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত উপাধি ব্যতীত অন্য কোনরূপ উপাধি প্রদান করা হইবে না।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পরবর্তী কালে ভারত সরকার উপাধি বিতরণ

নীতি পরিবর্তন করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে ভারত সরকার প্রধানমন্ত্রীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ভারত-রত্ন, পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করিতেছেন। সরকার এই উপাধিগুলিকে পুরস্কার বলিয়া আখ্যা দেন এবং আত্মশ্লাঘার উদ্দেশ্যে কেহই এই পুরস্কারগুলিকে নামের শেষে যুক্ত অথবা চিঠির শিরোনামা হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

সংবিধান কর্তৃক সাম্য-নীতি গ্রহণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই নীতি কার্যকর করিবার দায়িত্ব অংশতঃ জনসাধারণের এবং অংশতঃ সরকারী কর্মচারিগণের উপর নির্ভর করে।

২। স্বাধীনতার অধিকার—Right to Freedom.

সংবিধানের ১৯ হইতে ২২ ধারায় স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। ১৯ ধারায় সাত দফা স্বাধীনতা ও ইহাদের সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ২০ হইতে ২২ ধারায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।

১৯ ধারায় আলোচিত সাতটি স্বাধীনতার ধারার প্রথমটি হইল :

(ক) বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা—Right to Freedom of speech and expression.

নাগরিকগণের বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। এই স্বাধীনতার অর্থ হইল যে, ব্যক্তি ও তাহার শিক্ষা ও বিবেক-প্রসূত চিন্তা ও ধারণা মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে অথবা অংকনের সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারিবে। চিন্তা করাই হইল মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং এই চিন্তা-শক্তিই মানুষকে পশু হইতে পৃথক করিয়াছে। সুতরাং চিন্তা করা এবং চিন্তাপ্রসূত মত বা ধারণা মৌখিক অথবা লিখিতভাবে জনসমাজে প্রকাশ করা মানব অস্তিত্বের একটি প্রধান লক্ষণ। যে মানুষ স্বাধীনভাবে তাহার মতামত প্রকাশ করিতে পারে না, সে মানুষ চিন্তা করিতে পারে না—আর যে মানুষ চিন্তা করিতে পারে না, সে মানুষ মনুষ্যপদবাচ্য নহে। সুতরাং এই অধিকারটি মানুষের একটি প্রাথমিক অধিকার। চিঠি-পত্র, পত্র-পত্রিকা, আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক প্রভৃতি হইল চিন্তাপ্রসূত মতামত প্রকাশের মাধ্যম এবং স্বভাবতই বাক্-স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে

পারে। সুপ্রীম কোর্টের একটি সিদ্ধান্তেও উপরি-উক্ত মত আইনানুমোদিত বলিয়া গণ্য হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোন স্বাধীনতাই অবাধ নহে। ভারতে বাক্-স্বাধীনতারও কতিপয় ব্যতিক্রম দেখা যায়। সংবিধানের প্রথম সংশোধন আইন দ্বারা বাক্-স্বাধীনতার উপর যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হইয়াছে। বাক্-স্বাধীনতার দ্বারা যদি (ক) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, (খ) বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত মৈত্রীবন্ধন ক্ষুণ্ণ হয়, (গ) জনশৃংখলা ভঙ্গ হয়, (ঘ) অপরের সম্ভ্রম হানি হয়, (ঙ) অপরাধ অনুষ্ঠান, অশ্লীলতা এবং অসদাচার প্রশ্রয় পায় তাহা হইলে বাক্-স্বাধীনতা খর্ব করা যাইতে পারে।

(খ) শান্তিপূর্ণভাবে নিরস্ত্র হইয়া সমবেত হইবার অধিকার—Right to assemble peacably and without arms.

জনগণের এই অধিকারটি সকল সভ্য দেশ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। স্বাধীন চিন্তা ও অভিব্যক্তির অধিকারের সহিত এই অধিকারটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জনসাধারণ একত্রে সমবেত হইয়া তাহাদের সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কে মতবিনিময় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ভারতের সংবিধানে পৃথক্‌ভাবে শোভাযাত্রা করিবার অধিকারের উল্লেখ না থাকিলেও সমবেত হইবার অধিকারের মধ্যে এই অধিকারের পরোক্ষ স্বীকৃতি আছে। কিন্তু এই অধিকারও সর্তশূন্য নহে। জনগণ সমবেত হইতে পারিবে যদি (ক) এই সভা শান্তিপূর্ণ এবং (খ) নিরস্ত্র হয়, (গ) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও জনস্বার্থ রক্ষাকল্পে এই অধিকার নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে।

ইহা ছাড়াও শোভাযাত্রা ও সভা করিবার অধিকারের উপর পুলিশ নিয়ন্ত্রণ আছে। শোভাযাত্রা ও সভা ভাঙ্গিয়া দিবার ক্ষমতা পুলিশকে দেওয়া হইয়াছে। সংবিধানের ১৯ (৩) ধারায় বলা হইয়াছে যে, যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেও এই অধিকার সংকুচিত করা যাইতে পারে। নিয়ন্ত্রণ যুক্তিসঙ্গত কিনা তাহা বিচারবিভাগ দ্বারাই নির্ধারিত হইবে।

(গ) সমিতি অথবা সংঘ গঠন করিবার অধিকার—Right to form associations or unions.

সমিতি অথবা সংঘ গঠন করিবার অধিকার ব্যক্তি-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। চিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার অর্থ হইল ব্যক্তি

তাহার শিক্ষা ও বিবেকসম্মতভাবে যে মত গঠন ও পোষণ করে অন্য ব্যক্তিকেও সে তাহার নিজ মত দ্বারা প্রভাবিত করিতে পারে। মতবিনিময় এবং ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই সংঘ গঠন করিবার প্রয়োজন হয়। একমতাবলম্বী জনগণ সংঘের মাধ্যমে দলের শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে। ইংলণ্ডে আইনসঙ্গত-ভাবে এবং আইনসঙ্গত কারণে সংঘ গঠনের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। মার্কিন শাসনতন্ত্রে সংঘ গঠনের কোন অধিকারের উল্লেখ না থাকিলেও ইদানীং বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্তের দ্বারা এই অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। অন্য সর্ববিধ সংঘ গঠন করিবার অধিকার স্বীকৃত হইলেও সোভিয়েত শাসনতন্ত্রে সোভিয়েত নাগরিকগণের রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার দেওয়া হয় নাই। সাম্যবাদী দলই হইল সে দেশের একমাত্র আইনানুমোদিত দল।

ভারতের সংবিধানে নাগরিকগণকে সংঘ গঠন করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। শ্রমিক সংঘ, রাজনৈতিক দল, বিজ্ঞান-বিষয়ক সংঘ, যুব সংঘ প্রভৃতি সংঘ গঠন করা যাইতে পারে। কোন অপরাধমূলক কার্য বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার উদ্দেশ্যে কোন সংঘ বা সমিতি গঠন করা যাইবে না। শ্রমিকগণ তাহাদের কার্যের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিতে পারিলেও অসদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করিয়া শ্রমিক সংঘ গঠন করিতে পারিবে না। এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সংঘগুলিকে নিয়ন্ত্রন করিতে পারে।

(ঘ) ভারতের সর্বত্র অবাধে গতিবিধির অধিকার – **Right to move freely throughout the territory of India.**

ভারতের নাগরিকগণ ভারতের যত্রতত্র অবাধে ভ্রমণ করিতে পারিবে।

(ঙ) ভারতের যে-কোন অংশে বসবাস ও স্থিতিশীল হইবার অধিকার—**Right to reside and settle in any part of the territory of india.**

ভারতের যে-কোন অংশে সাময়িক অথবা স্থায়িভাবে বসবাস করিবার অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতীয় নাগরিকগণ বিনা বাধায় ভারতের সর্বত্র শুধু গমনাগমন নয়, বসবাসও করিতে পারিবে। ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যেই এই অধিকারটি প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই উদ্দেশ্যে সর্বভারতের জন্য মাত্র একদফা নাগরিকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে যাহার ফলে আন্তঃরাজ্য ক্ষেত্র সংকুচিত হইয়াছে।

এই বিধিটির কয়েকটি ব্যতিক্রম দেখা যায়। সংগত কারণে রাষ্ট্র উপরি-উক্ত দুইটি অধিকার হইতে নাগরিকগণকে বঞ্চিত করিতে পারে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, আঞ্চলিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে অথবা দাঙ্গাহাঙ্গামা নিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে স্থানত্যাগ না করিতে অথবা স্থানত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবার আদেশ প্রদান করিতে পারে। মহামারী বা সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র জনসাধারণের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। আবার সরকার সামরিক বা অন্য কোন কারণে কতকগুলি অঞ্চলকে নিষিদ্ধ অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা দ্বারা এসব অঞ্চলে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করিতে পারে। ইহা ছাড়া, দুশ্চরিত্র, সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিগণকে বহিষ্কার করিবার অধিকারও রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত।

(চ) সম্পত্তি অর্জন, দখলে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার অধিকার—**Right to acquire, hold and dispose of property.**

সম্পত্তির উপর ব্যক্তির একচ্ছত্র অধিকার তাহার আত্মোন্নতির সহায়ক। তাই সকল দেশেই ব্যক্তির এই অধিকার কোথায়ও বা অবাধভাবে আবার কোথায়ও বা নির্ধারিত সীমার মধ্যে স্বীকৃত হয়। ভারতের সংবিধানেও নাগরিকগণের এই অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। নাগরিকগণ সম্পত্তি অর্জন, ভোগ-দখল-ক্রয়-বিক্রয়-দান দ্বারা হস্তান্তর করিতে পারে। অবশ্য সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে রাষ্ট্র প্রয়োজনমত বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারে। সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে পরে পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

(ছ) যে-কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবার অথবা যে-কোন পেশা, বাণিজ্য বা ব্যবসা পরিচালনা করিবার অধিকার—**Right to practise any profession or to carry on any occupation, trade or business.**

নিজের পছন্দমত বৃত্তি গ্রহণ করিবার অধিকার ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক সকল নাগরিকের উপরই প্রদত্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার পছন্দমত চাকুরি গ্রহণ করিতে পারিবে এবং যে-কোন ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করিতে পারিবে। বৃত্তি গ্রহণ ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করিবার

স্বাধীনতার উপর সরকার অবশ্য নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে পারেন। বৃত্তি অনুসারে সরকার কর্মীর গুণ ও যোগ্যতা নির্ধারণ করিয়া দিতে পারেন।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে সংবিধানের প্রথম সংশোধন আইন পাস করিয়া ব্যক্তির এই বৃত্তিগত স্বাধীনতা সরকার বিশেষভাবে সংকুচিত করিয়াছেন। এই সংশোধন আইন বলে রাষ্ট্র স্বয়ং অথবা কর্পোরেশন গঠন করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করিতে পারিবে, ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক সংগঠন তুলিয়া দিয়া একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করিতে পারিবে।

বৃত্তি ও ব্যবসায়গত অধিকারগুলির উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেখিলে এই অধিকারগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে অসার বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু জনস্বার্থে ও গণতান্ত্রিক আদর্শ রূপায়ণে এই নিয়ন্ত্রণ কাম্য। বৃত্তি বা পেশা শুধু ব্যক্তির উপার্জনের উপায় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। প্রত্যেক বৃত্তি ও পেশার সহিত সমষ্টির স্বার্থও জড়িত। সমষ্টির স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই রাষ্ট্রকে বৃত্তিগত অধিকারের সীমারেখা স্থির করিতে হইবে। কাজের জন্য যোগ্য ব্যক্তিই কাজে নিযুক্ত হইতে পারিবে। সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে কর্মীর গুণ ও যোগ্যতা স্থির করিয়া দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন, বিশেষ করিয়া কারিগরি ক্ষেত্রে দক্ষতা বজায় রাখিবার জন্য যোগ্যতার মান নিরূপণ নিতান্ত অপরিহার্য। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্র ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য বৃত্তি, পেশা, ব্যবসা-বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ অবশ্যম্ভাবী। তবে দেখিতে হইবে যে, ব্যক্তিগত ব্যাপারে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহিত সম্পর্করহিত কোনরূপ অবাঞ্ছিত নিয়ন্ত্রণ আরোপিত না হয়।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ইহার সীমা—Personal Freedom and its Limitations.

সংবিধানের ২০ ধারার তিনটি ভাগ আছে। প্রথম ভাগে বলা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তিকে অপরাধ অনুষ্ঠান বা আইনভঙ্গের সময়ে প্রচলিত আইনানুসারে শাস্তি দিতে হইবে। পরবর্তী কালে প্রণীত বা সংশোধিত আইন বলে কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া চলিবে না। একই অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার অভিযুক্ত বা শাস্তি প্রদান করা চলিবে না। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই অভিযোগ বা শাস্তির দ্বারা বিচারবিভাগীয়

অভিযোগের বা শাস্তির কথা বলা হইয়াছে। কোন সরকারী কর্মচারী যদি অপরাধ করে, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে বিচারবিভাগীয় শাস্তি ব্যতীতও তাঁহাকে সংশ্লিষ্ট দপ্তর-প্রদত্ত শাস্তিও দেওয়া যাইতে পারে। ২০ ধারায় আরও বলা হইয়াছে যে, কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না।

সংবিধানের ২১ ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তিকে আইন নির্ধারিত পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে তাহার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না ("No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law")। ব্যক্তি-স্বাধীনতা সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে ও মার্কিন দেশে অনুরূপ বিধি প্রবর্তিত আছে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে বিচারালয়ের ক্ষমতা খুব সীমাবদ্ধ। যে আইনবলে ব্যক্তির স্বাধীনতার অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, সে আইন যদি বৈধ আইনসভা কর্তৃক বিধিসম্মত-ভাবে রচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট অথবা অন্য বিচারালয় সে আইনানুসারে বিচার করিতে বাধ্য। প্রযোজ্য আইনটি কঠোর বা অবৈধ হইতে পারে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিধিসম্মত পদ্ধতিতে রচিত আইন বিচারালয়ের প্রয়োগ করিতেই হইবে। বিচারালয় আইন প্রণয়নের বৈধতা প্রশ্ন করিতে পারে, কিন্তু আইনের বৈধতা বা গুণাগুণ প্রশ্ন করিতে পারে না। কিন্তু মার্কিন দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন যুক্তিসঙ্গত কিনা তাহা বিচারপূর্বক আইনটিকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে এবং আদালত কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত আইন বলবৎ করা যায় না। তবে ভারতে অন্য একটি উপায়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে। শুধু সরকারী আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করা সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে হেবিয়াস্ কর্পাস্ আইনবলে আটক ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করিতে হইবে এবং আদালত কর্তৃক বিচারপূর্বক দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত তাহার স্বাধীনতা হরণ করা যাইবে না। সংবিধানের ২২ (ক) ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তিকে কারণ না দেখাইয়া গ্রেপ্তার করা যাইবে না। আটক ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছামত একজন আইনজীবীর দ্বারা সমর্থিত হইবার

অধিকার প্রদান করিতে হইবে। ২২ (খ) ধারায় বলা হইয়াছে যে, গ্রেপ্তার করিবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই ব্যক্তিকে নিকটস্থ কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করিতে হইবে এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাহাকে অতিরিক্ত সময় আটক রাখা চলিবে না। নিবর্তনমূলক আটক আইনে (Preventive Detention) ধৃত ব্যক্তিদেরও শত্রুভাবাপন্ন বিদেশী (Enemy alien) ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ২২ (ক) ধারা প্রযুক্ত হইবে না।

ভারতের সংবিধান অনুসারে পার্লামেণ্ট সভা এবং রাজ্যের আইনসভাগুলি কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রণয়ন করিতে পারে। ভারত বা কোন অঙ্গরাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষা বা জনস্বার্থ সংরক্ষণ করিবার বা আইন-শৃংখলা রক্ষা করিবার জন্য আটক আইন প্রণয়ন করা যাইতে পারে। নিবর্তনমূলক আটক আইনের অর্থ হইল যে, যে-কোন সময় যে-কোন ব্যক্তিকে শাসন কর্তৃপক্ষ সন্দেহের বশে অথবা ভবিষ্যতে অপরাধ অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা দূর করিবার জন্য গ্রেপ্তার ও আটক রাখিতে পারেন। এই গ্রেপ্তার ও আটকের জন্য কর্তৃপক্ষকে ধৃত ব্যক্তির অপরাধ সম্পর্কে আদালতে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ দিতে হয় না।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ভারতের পার্লামেণ্ট এক নিবর্তনমূলক আটক আইন [Preventive Detention Act, (IV) 1950] প্রণয়ন করে। গোপালন বনাম মাদ্রাজ সরকার মামলাটির রায় দানকালে সুপ্রীম কোর্ট এই আইনের ১৪ ধারার কয়েকটি অংশ বাতিল করে। ইহার পর পার্লামেণ্ট সভা আইনটি সংশোধন করে।

সংশোধিত আইন অনুসারে আটক ব্যক্তির বিষয় তিনজন উচ্চ বিচারালয়ের বিচারকের সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি লইয়া গঠিত একটি পরমার্শদাতা কমিটির (Advisory Board) নিকট বিচারের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে। এই পরামর্শদাতা কমিটি যদি আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিবেচনা করিয়া মুক্তির সুপারিশ করে, তাহা হইলে আটক ব্যক্তিকে মুক্তি-দান করিতে হইবে। নিবর্তনমূলক আইনে আটক ব্যক্তি সম্পর্কে পরামর্শদাতা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে। কমিটির নিকট উপস্থিত হইয়া আটক ব্যক্তির তাহার বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার না থাকিলেও কমিটি প্রয়োজন বোধ করিলে আটক ব্যক্তিকে কমিটির নিকট

হাজির হইতে বলিতে পারে। সংশোধিত আইনানুসারে মহকুমা শাসকগণ এই আইনের বলে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিতে পারেন না। সংশোধিত আইনানুসারে এইরূপ আটক ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। সংশোধিত আইনের দ্বারা মূল আইনের কঠোরতা প্রশমিত করা হইয়াছে।

১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে নিবর্তনমূলক আটক আইনের মেয়াদ শেষ হয়। তদানীন্তন সরকার এই আইন পুনঃপ্রবর্তনে বিরত থাকেন। কিন্তু ইহার পরবর্তী কালে দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইলে এবং পার্শ্ববর্তী পূর্ব পাকিস্তানে বিপ্লব ঘটিলে ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার নিবর্তনমূলক আটক আইনের অনুরূপ আর একটি আইন পাস করেন। এই আইনটি আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষণ আইন (Maintenance of Internal Security Act, 1971) নামে পরিচিত। সংক্ষেপে বলা হয় মিশা (MISA)। পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য সরকারও মিশা আইনটি পাস করেন। এই আইনের বলে কোন ভারতীয় নাগরিক বা বিদেশীকে ভারত সরকার বা রাজ্য সরকার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে গ্রেপ্তার ও আটক করিতে পারেন। এইরূপ আটক ব্যক্তিকে পাঁচ হইতে পনের দিনের মধ্যে তাহাকে আটক করিবার কারণ দর্শাইতে হইবে এবং আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ একটি পরামর্শ-দাতা কমিটি (Advisory Board) কর্তৃক বিবেচিত হইবে। এই কমিটির বিবেচনায় আটক ব্যক্তি নির্দোষ হইলে মুক্তি পাইবে। অধিকাংশক্ষেত্রে আটক ব্যক্তি কমিটি কর্তৃক নির্দোষ সাব্যস্ত হওয়ার ফলে ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এই আইনটি সংশোধিত হয়। সংশোধিত আইনের বিধি অনুযায়ী আটক ব্যক্তিকে বর্তমানে আর তাহার গ্রেপ্তারের কারণ দর্শাইতে হয় না। সুতরাং দেশের 'শান্তি' ও 'নিরাপত্তা' রক্ষার উদ্দেশ্যে পূর্বতন অস্থায়ী নিবর্তনমূলক আটক আইনের পরিবর্তে মিশা নামে একটি স্থায়ী আইন প্রবর্তিত হইয়াছে। ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে রাষ্ট্রপতি একটি জরুরী আইন-জারী করিয়া মিশায় ধৃত ব্যক্তিদের আটক কাল ১২ মাস হইতে ২৪ মাসে বৃদ্ধি করিয়াছেন।

আপতদৃষ্টিতে নিবর্তনমূলক আটক আইন ও মিশা গণতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া মনে হইলেও ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এইরূপ আইনের প্রয়োজনীয়তা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। প্রতিষ্ঠিত আইন-

সঙ্গত সরকারকে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি-বহির্ভূত উপায়ে অপসারণের প্রচেষ্টা, প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণ ও সশস্ত্র বাহিনীকে উত্তেজিত করা এবং সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে নানাভাবে অন্তরায় সৃষ্টি করিবার ক্ষেত্রে মিশার প্রয়োগ অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। তবে এইরূপ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ ক্ষেত্রে শাসন-কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে দেখিতে হইবে যে এইরূপ আইনের যাহাতে কোন অপপ্রয়োগ হইয়া সংবিধান-প্রদত্ত ব্যক্তি-স্বাধীনতা কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ না করে।

৩। শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার—Right against Exploitation.

সংবিধানের ২৩ ও ২৪ ধারা দুইটিতে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। কোনরূপ প্রতিদান না দিয়া বা উপযুক্ত পরিমাণ প্রতিদান না দিয়া লোকের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বলপূর্বক তাহার নিকট হইতে কার্য আদায় করা হইল শোষণ। ভারতের সংবিধানে দাস ব্যবসায়, বেগার খাটুনি (বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিতে বাধ্য করা), অনুরূপভাবে বলপূর্বক শ্রম আদায় করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ১৪ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদিগকে কারখানা, খনি বা অন্য কোন বিপজ্জনক কার্যে নিযুক্ত করাও নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। মানুষ ক্রয়-বিক্রয় করা বা স্ত্রীলোকদিগকে ব্যভিচার করিতে বাধ্য করাও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এই ধারাটির একটি ব্যতিক্রম হইল যে, রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে জনস্বার্থ রক্ষাকল্পে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকেই বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করাইয়া লইতে পারিবে। জনস্বার্থে রাষ্ট্র নাগরিকগণকে সেনাবাহিনীতে যোগদান করিতে বাধ্য করিতে পারে এবং এরূপক্ষেত্রে নাগরিকগণকে রাষ্ট্রের কোনরূপ ক্ষতিপূরণ দিবারও বাধ্যবাধকতা নাই। ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশেই যুদ্ধের সময় নাগরিকগণের নিকট হইতে কাজ দাবি করা যায়।

সংবিধান দ্বারা ভারতে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার প্রতিষ্ঠা হইলেও কার্যক্ষেত্রে ভারতে এই অধিকার সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই। ভারতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা বর্তমান থাকিবার ফলে খনি, ফ্যাক্টরি, কল-কারখানা প্রভৃতি ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পত্তির মাধ্যমে মজুরদের কাজ করাইয়া ন্যায্য মজুরি অপেক্ষা কম মজুরি

দেওয়া হয়। এমন কি, শিক্ষাক্ষেত্রেও অনেক স্থলে শিক্ষকদের কম বেতন দেওয়া হয়। এইরূপে কর্মিগণের অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ধন-সম্পত্তির অধিকারিগণ শ্রমিকগণকে শোষণ করেন। শোষণের ফলে কর্মিগণ কৃশকায় হন, আর মালিকগণ ক্রমশই স্ফীত হন। শোষণ মাত্রাধিক্যে পৌঁছিলে শ্রমিক-মালিক বিরোধ ঘটে ও শিল্প-বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। একমাত্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান ঘটাইয়া এক শোষণ-মুক্ত সমাজ গঠন করিবার চেষ্টা চলিয়াছে। সোভিয়েত দেশে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কেহ কাহাকেও শোষণ করিতে পারে না। শোষণের প্রধান যন্ত্র হইল ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যাহার অস্তিত্ব সেদেশে স্বীকৃত হয় নাই।

৪। ধর্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতার অধিকার—Right to Freedom of Religion.

ভারতের ইংরাজ শাসকগণ ধর্মীয় ভিত্তিতে দ্বি-জাতিতত্ত্ব স্বীকার করিয়া ভারত বিভাগ করেন। কিন্তু ভারত রাষ্ট্র ইহার অভ্যুদয়ের প্রাক্কাল হইতেই এই দ্বি-জাতিতত্ত্ব বলিষ্ঠভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিতেছে। ভারতের সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত না হইলেও ভারতকে একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Secular State) বলা হয়। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অর্থ হইল যে, ভারতে রাজনীতিকে সম্পূর্ণভাবে ধর্ম হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ধর্ম-মতের কোন স্থান নাই। ভারত রাষ্ট্র ভারতে প্রচলিত সকল ধর্মের প্রতিই সমানভাবে নিরপেক্ষ। ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রের এই ধর্ম-নিরপেক্ষতা নানাপ্রকারে সংরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ, ভারতে ইংলণ্ডের মত রাষ্ট্রের কোন সরকারী ধর্ম নাই বা রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মমতের পৃষ্ঠপোষক নহে। দ্বিতীয়তঃ, পাকিস্তানের ন্যায় ভারত কোন ধর্মীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। বিশেষ কোন ধর্মমত অনুসরণ-কারীদের জন্য ভারতে কোন বিশেষ ব্যবস্থা নাই। ধর্মমত-নির্বিশেষে ভারত সকল নাগরিককে সমান সুযোগ-সুবিধা দান করে।

সংবিধানের ২৫ ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রের শান্তি-শৃংখলা বা জনস্বার্থ, সাধারণ ও নীতিজ্ঞান-বিরোধী না হইলেও প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তাহার ধর্মাচরণ করিতে পারে এবং ধর্মমত প্রচার করিতে পারিবে। সুতরাং ভারতে

নাগরিকগণের ধর্মের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। সংবিধানের ২৫ (২) ধারায় বলা হইয়াছে যে, ধর্ম-সম্পর্কিত যে-কোন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা ধর্ম-নিরপেক্ষ কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে না।

সংবিধানের ২৫ (২) ক ধারা অনুসারে রাষ্ট্র কোন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা ধর্ম-নিরপেক্ষতা সম্পর্কিত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিয়া আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে এক বিবাহ আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিয়া বহুবিবাহের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে এমন আইন প্রণয়ন করিতে পারে যাহা দ্বারা গির্জা বা মঠের সম্পত্তি হইতে আয় নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে। ২৫ (২) খ ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র সামাজিক হিতার্থে ও সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাসনালয়-গুলিতে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের হিন্দুদের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

সংবিধানে 'হিন্দু' শব্দটি এক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শিখ, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীদের হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। রাষ্ট্র শুধুমাত্র শিখধর্মাবম্বীদের ক্ষেত্রে কৃপাণ বহন করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছে।

সংবিধানের ২৬ ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রের শান্তি-শৃংখলা, জনস্বার্থ বা নীতিজ্ঞান বিরুদ্ধ না হইলে প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের লোক (ক) ধর্মীয় ও দানের উদ্দেশ্যে মঠ, মন্দির, মসজিদ, গির্জা প্রভৃতি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে। (খ) ধর্মসম্পর্কিত ইহার নিজস্ব ব্যাপারগুলি পরিচালনা করিতে পারিবে। (গ) স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ভোগ ও অর্জন করিতে পারিবে এবং (ঘ) আইনানুমোদিতভাবে এইরূপ সম্পত্তির পরিচালনা করিতে পারিবে।

উপরি-উক্ত অধিকারগুলি সঙ্গতভাবেই সংবিধানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কারণ এইগুলির অবর্তমানে ধর্মমত পোষণের ও ধর্মমত প্রচারের অধিকার সম্ভব হয় না।

২৭ ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ ধর্ম বা বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্মমত বজায় বা প্রসারের উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার জন্য কোন প্রকার কর প্রদান করিতে বাধ্য করা যাইবে না। এই ধারাটির অন্তর্ভুক্তিতে রাষ্ট্রের ধর্ম-নিরপেক্ষতা নীতি অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়াছে।

২৮ ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র পরিচালিত কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইবে না। কিন্তু ইহার একটি ব্যতিক্রমও সংবিধানে যুক্ত হইয়াছে। যদি সরকার পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে চিরকালের জন্য প্রদত্ত (Endowment) অথবা কাহারও তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত (Trust) হয় এবং ধর্ম শিক্ষা দিবার শর্ত থাকে তাহা হইলে এই সকল প্রতিষ্ঠানে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। আবার কোন শিক্ষার্থীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা তাহার অভিভাবকের সম্মতি ব্যতীত ধর্ম শিক্ষা দেওয়া চলিবে না।

ভারতের সংবিধানে ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা দেওয়া হইলেও সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকগণের যেরূপ ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করিবার অধিকার (anti-religious propaganda) দেওয়া হইয়াছে, ভারতের নাগরিকগণকে সেরূপ কোন অধিকার দেওয়া হয় নাই।

ভারতের সংবিধানে ধর্মমত পোষণ ও প্রচারের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া গণতন্ত্র প্রসারের পথের অন্তরায় দূর করা হইয়াছে। কিন্তু এই সঙ্গে ধর্মের নামে যে সমস্ত অন্যায়, অবিচার, ব্যভিচার ও বিরোধের সৃষ্টি হয়, সেগুলিকে কঠোর হস্তে দমন করিবার উদ্দেশ্যে সংবিধানে কতিপয় কার্যকরী ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হইয়াছে।

৫। সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত অধিকার—Cultural and Educational Rights.

ভারতের সংবিধানের ২৯ এবং ৩০ ধারায় এই অধিকারগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। সকল শ্রেণীর নাগরিকগণ নিজ নিজ ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি ব্যবহার করিতে পারিবে। সরকার কর্তৃক পরিচালিত অথবা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সকল সম্প্রদায়ের সমান প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। অবশ্য প্রবেশার্থীর উপযুক্ত যোগ্যতা থাকা চাই। সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়গুলি তাহাদের ইচ্ছামত বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে। ধর্ম ও ভাষা নিরপেক্ষভাবে সকল বিদ্যালয়ই সরকারী সাহায্য পাইবে।

এই অধিকারটি ভারতের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার দিক দিয়া ভারত পাশ্চাত্য অনেক দেশ অপেক্ষা মারাত্মকরূপে অনগ্রসর অথচ এদেশে

সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং ইহার অপরিহার্য উপাদান প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রদান করা হইয়াছে। গণতন্ত্রের সাফল্য শিক্ষিত ও সচেতন জনমতের উপর একান্তভাবে নির্ভর করে। কিন্তু ভারতে এই শিক্ষিত ও সচেতন জনমতের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহার ফলে ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বহু দুর্নীতি ও ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়। সংবিধানে শুধু শিক্ষার অধিকার বিধিবদ্ধ করিলেই রাষ্ট্রকর্তব্য শেষ হয় না প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার দ্বারা জনগণের মধ্য হইতে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও সংকীর্ণতা দূর করিবার সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বিফল হইবে। ভারত সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও অনুন্নত শ্রেণীর জনগণকে উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে বৃত্তিদান, চাকুরির ক্ষেত্রে সুবিধা প্রভৃতি বিশেষ কয়েকটি অধিকার অর্পণ করিয়াছেন।

৬। সম্পত্তির অধিকার—Right to Property.

ব্যক্তির বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সম্পত্তির উপর অধিকার থাকা প্রয়োজন—ইহাই ছিল চলিত ধারণা। স্বোপার্জিত, উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা অন্য কোন উপায়ে অর্জিত সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা সর্বদেশে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অপব্যবহারের ফলে যখন মুষ্টিমেয় সম্পত্তির মালিক শোষণ দ্বারা সমাজ-ব্যবস্থায় চরম ধনবৈষম্য সৃষ্টি করিল সেই সময় হইতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সম্পত্তির উপর ব্যক্তির অধিকার স্বীকৃত হইলেও সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণও আরোপিত হইতে শুরু হইল। গ্রেট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—উভয় দেশেই সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, আইনসম্মত পদ্ধতি ব্যতীত ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

ভারতের সংবিধানের ১৯ ধারায় বলা হইয়াছে যে, যে-কোন ব্যক্তি সম্পত্তি অর্জন, ভোগ-দখল এবং হস্তান্তর করিবার অধিকারী। অবশ্য ব্যক্তির এই অধিকার রাষ্ট্র জনস্বার্থে অথবা তপশীলভুক্ত জাতির স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সংকুচিত করিতে পারে। সংবিধানের ৩১ (১) ধারায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হইলেও উক্ত ধারায় একই সঙ্গে বলা হইয়াছে যে, আইনসম্মত পদ্ধতি ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তির অধিকার

হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। উক্ত ধারাটি বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, আইনসভা দ্বারা প্রণীত আইন সাহায্যে যে-কোন ব্যক্তিকে সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায়। ৩১ (২) ধারায় বলা হইয়াছে যে, ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিয়া জনসাধারণের স্বার্থে কোন স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা চলিবে না এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বা নীতি বা ক্ষতিপূরণ প্রদান পদ্ধতি আইন দ্বারা নির্ধারিত করিতে হইবে। সুতরাং দেখা যায় যে, (ক) জনস্বার্থে, (খ) আইনানুমোদিতভাবে এবং (গ) ক্ষতিপূরণ এই তিনটি শর্ত পূরণ করিয়া রাষ্ট্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিতে পারে।

সম্পত্তি-সম্পর্কিত অধিকার পরবর্তী কালে চারবার সংশোধিত, পরিবর্ধিত ও পুনঃসংশোধিত হয়। জমিদারী প্রথার বিলোপ সাইন, ভূমিসংস্কারমূলক আইন-প্রণয়ন এবং সরকার কর্তৃক ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিগ্রহণ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্পর্কে এই সংশোধনগুলির প্রয়োজন হয়।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে শাসনতান্ত্রিক প্রথম সংশোধনী আইন পাস করা হয়। এই আইনের ৩১ ধারায় দুইটি নূতন ধারা—৩১ (ক) ও ৩১ (খ) যুক্ত হয়। এই আইনের ফলে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ-সম্পর্কিত আইনগুলির বৈধতা বিচার করিবার ক্ষমতা আর বিচারালয়গুলির থাকিল না। রাষ্ট্র এই প্রস্তাবগুলির সাহায্যে নানাবিধ সমাজ হিতকর নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করিতে পারিবে, যথা, খনি ও খনিজ তৈলের রাষ্ট্রীয়করণ। দুই বা ততোধিক কোম্পানীর জাতীয়করণ। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের ক্ষমতা পরিবর্তন বা বিলোপ, ঋণ প্রভৃতির লাইসেন্স প্রদানের ক্ষমতার অবসান, জমির সীমানা নির্ধারণ ইত্যাদি।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে সম্পত্তি-সম্পর্কিত দ্বিতীয় সংশোধনী আইন পাস করা হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিয়া ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি মামলায় জড়িত হন। সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত সম্পত্তির মালিক উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ না দিবার দায়ে সুপ্রীম কোর্টে সরকারকে অভিযুক্ত করেন। সুপ্রীম কোর্ট সরকারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিবার নির্দেশ দেয়। ভারত সরকার ইহার ঘোষিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রসারণের অন্তরায় দূর করিবার জন্য ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে শাসনতান্ত্রিক চতুর্থ সংশোধনী আইন পাস করিয়া ৩১ (২) ধারাটির সহিত নূতন ধারা যোগ করেন। এই ধারায় ৩১ (২ক) বলা হয় যে,

সরকার কর্তৃক ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে আইনসম্মতভাবে যে ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত হইবে তাহার বৈধতা সম্পর্কে কোন বিচারালয়ই প্রশ্ন করিতে পারিবে না। সুতরাং সংশোধিত আইনবলে রাষ্ট্র ইহার ইচ্ছামত ক্ষতিপূরণ দিয়া ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে। নূতন সংবিধান প্রবর্তিত হইবার পূর্বে উত্থাপিত এই জাতীয় কোন প্রস্তাব যদি গৃহীত হয় এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে, তাহা হইলে সে আইন উপরি-উক্ত আইনের ব্যতিক্রম হইলেও কার্যকর থাকিবে। কিন্তু করধার্য বা অর্থদণ্ডের উদ্দেশ্যে, অথবা জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে, কিংবা জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে, অথবা উদ্বাস্তুর সম্পত্তি গ্রহণ সম্বন্ধে গৃহীত আইনে ক্ষতিপূরণ ধারা প্রযোজ্য হইবে না। সংবিধানে আরও বলা হইয়াছে যে, রাজ্য আইনসভা কর্তৃক গৃহীত এইরূপ আইন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে ভূমিসংস্কারমূলক ব্যবস্থা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে শাসনতান্ত্রিক সপ্তদশ সংশোধনী আইন পাস করা হয়। এই আইনের দ্বারা ৩১ (ক ধারাটি সংশোধিত হয়। সুপ্রীম কোর্ট ও কয়েকটি রাজ্য প্রধান বিচারালয় কর্তৃক ভূমিসংস্কারমূলক বিধি অগ্রাহ্য হইবার কারণ এই সংশোধনী আইনটি পাস করা হয়। এই আইনের দ্বারা সম্পত্তির (Estate) একটি ব্যাপক অর্থ করা হইয়াছে যাহাতে সকল প্রকারের জমি 'সম্পত্তি' শব্দটির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই আইনে নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে অর্জিত জমির জন্য বাজার দরে ক্ষতিপূরণ দিবারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯৭১ খৃষ্টাব্দে শাসনতান্ত্রিক পঞ্চবিংশতি সংশোধনী আইনটি সম্পত্তি-সম্পর্কিত। এই আইনের দুইটি অংশ আছে। প্রথমে ৩১ (২ ধারাটির সংশোধন করা হয় এবং দ্বিতীয়তঃ, ৩১ (গ) নামে নূতন একটি ধারা যুক্ত হয়।

এই সংশোধনের বলে ভবিষ্যতে রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা অর্জন কালে যাহাতে অত্যধিক পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিবার প্রশ্ন না উঠে তদুদ্দেশ্যে ৩১ (২) ধারাটি হইতে ক্ষতিপূরণ (Compensation) কথাটি একেবারে বাদ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এই আইন পাস হইবার ফলে কোনপ্রকার সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়করণ বা জাতীয়করণ করিবার কালে

উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, ৩১ ধারার সঙ্গে ৩১ (গ) নামে একটি নূতন ধারা যোগ করা হইয়াছে। সংবিধানের ৩৯ (খ) এবং (গ) ধারায় উল্লেখিত নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যেই এই নূতন ধারাটি রচিত হইয়াছে। উপরি-উক্ত নির্দেশাত্মক নীতিগুলি হইল : রাষ্ট্র এরূপভাবে ইহার নীতি পরিচালনা করিবে যাহাতে (১) সর্বসাধারণের হিতার্থে দেশের সম্পদের মালিকানা ও কর্তৃত্ব বন্টিত হয় এবং (২) রাষ্ট্র এরূপভাবে তাহার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা করিবে যাহার ফলে দেশের সম্পদ ও উৎপাদনের উপাদান-সমূহ মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইয়া জনসাধারণের স্বার্থের ব্যাঘাত না ঘটায়। ৩১ (গ) ধারাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই ধারাটির সাহায্যে রাষ্ট্র উপরি-উক্ত নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে কার্যকর করিবার জন্য সংবিধানে বিধিবদ্ধ ১৪ ধারায় বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলিকে ক্ষুণ্ণ করিয়াও আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। এতদিন পর্যন্ত মৌলিক অধিকারগুলি ছিল দুর্ভেদ্য। সংবিধানের ১৩ ধারায় নির্দেশ রহিয়াছে যে, মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া রাষ্ট্র কোনপ্রকার আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে না। কিন্তু সংবিধানের নূতন ৩১ (গ) সংশোধন দ্বারা রাষ্ট্রের মৌলিক অধিকার বিরোধী আইন প্রণয়ন করিবার অক্ষমতা দূর করা হইয়াছে। সুতরাং পূর্বোক্ত নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র যদি কোন আইন পাস করে, তাহা হইলে উক্ত আইন সংবিধানে বর্ণিত সম্পত্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়াছে এই অজুহাতে অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

সংবিধানের উপরি-উক্ত ধারাগুলি দেখিলে স্বভাবতই মনে হয় যে, ভারতের সংবিধান নাগরিকগণের অন্যান্য অধিকার অপেক্ষা সম্পত্তির অধিকারের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। সম্পত্তির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপের ফলে পরবর্তী কালে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, ভূমিসংস্কারমূলক প্রভৃতি প্রগতিশীল আইন-প্রণয়নে বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। ভারত সরকারের ঘোষিত নীতি হইল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। এই ব্যবস্থা কার্যকর করিবার প্রধান উপায় হইল ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করা। ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত উৎপাদনের উপায়গুলিকে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ এবং অর্থ-

নৈতিক পরিকল্পনা রূপায়ণ সাহায্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস এবং শক্তিশালী অর্থনৈতিক বনিয়াদ গঠন সম্ভব। সোভিয়েত দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোন স্থান নাই। উৎপাদনের উপায়গুলিকে জাতীয়করণ দ্বারা সোভিয়েত দেশে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। বেকার সমস্যা, বাণিজ্য চক্র, উৎকট ধনবৈষম্য প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী কুফলগুলি সেদেশ হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। ভারত যখন সমাজতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ করিয়াছে, তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সংকুচিত করিবার প্রয়াস ভারত সরকারের পক্ষে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হইবার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

৭। শাসনতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিকারের অধিকার—Right to Constitutional Remedies.

প্রতিকারের অধিকারটি হইল সংবিধানে বর্ণিত সপ্তম ও শেষ অধিকার। সংবিধানে বিধিবদ্ধ থাকিলেই নাগরিক অধিকারগুলি সুরক্ষিত হইতে পারে না। অধিকার কোনমতে ব্যাহত হইলে তাহার প্রতিকারের উপায় থাকা একান্ত আবশ্যক। ইংলণ্ডে আইনের অনুশাসন (Rule of Law) সাহায্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রধানতঃ সুরক্ষিত করা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টই ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষা-কবচ বলিয়া পরিগণিত হয়। অনুরূপভাবে ভারতের সংবিধানের ৩২ (১) ধারায় বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় নাগরিকগণ মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য সুপ্রীম কোর্ট বা রাজ্যের উচ্চ বিচারালয় অথবা পার্লামেন্ট কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতাসম্পন্ন কোন বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হইতে পারে। উপরি-উক্ত বিচারালয়গুলি মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করিবার জন্য নানাবিধ আদেশ ও নির্দেশ বলবৎ করিতে পারে। আদেশ ও নির্দেশগুলির বিবরণ পরে দেওয়া হইল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সংবিধানে বর্ণিত অপরাপর অধিকারগুলির ন্যায় এই শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকারটিও অবাধ বা শর্তশূন্য নহে। এই অধিকারটি কতকগুলি অবস্থায় স্থগিত রাখিবার ব্যবস্থাও শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে।

সংবিধানের ৩৫৮ ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা

ঘোষণা কালে ১৯ ধারায় বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকার স্থগিত থাকিবে। ৩৫৯ ধারায় বলা হইয়াছে যে, এই ঘোষণাকালে নাগরিকগণের সংবিধান-প্রদত্ত অধিকারগুলি বলবৎ করিবার উদ্দেশ্যে আদালতে আবেদন করিবার অধিকার পর্যন্ত স্থগিত থাকিবে। নিম্নলিখিত অবস্থায় রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, দেশের নিরাপত্তা যুদ্ধ বা আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলার জন্য বিঘ্নিত হইতে পারে, অথবা ভারতের যে-কোন অংশের নিরাপত্তা বিপন্ন হইয়াছে তাহা হইলে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। উপরি-উক্ত অবস্থাগুলি কার্যতঃ উপস্থিত না হইলেও যদি প্রত্যাসন্ন বলিয়া রাষ্ট্রপতি মনে করেন তাহা হইলেও তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় বাক্-স্বাধীনতা, সভা-সমিতি করিবার স্বাধীনতা প্রভৃতি স্থগিত থাকিবে। অধিকন্তু এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রপতির নির্দেশক্রমে মৌলিক অধিকারগুলিকে বিচারালয়ের সাহায্যে বলবৎ করিবার নাগরিক অধিকারও স্থগিত থাকিবে।

সংবিধানের ৩৩ ধারায় বলা হইয়াছে যে, সামরিক ও অন্যান্য প্রতিরক্ষা বাহিনীর ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারগুলি কতদূর প্রযোজ্য তাহা পার্লামেণ্ট আইন পাস করিয়া স্থির করিয়া দিবে।

সামরিক আইন (Martial Law) চালু থাকাকালে সাধারণতঃ মৌলিক অধিকারগুলি প্রযোজ্য নহে। এরূপ অবস্থায় যদি কোন সরকারী কর্মচারী আইন-শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কোন আইন-বিরুদ্ধ কাজ করেন, তাহা হইলে পার্লামেণ্ট আইন পাস করিয়া উক্ত আইন-বিরুদ্ধ কাজকে বৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন।

সুপ্রীম কোর্ট বা উচ্চ বিচারালয়গুলি নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার রক্ষাকল্পে যে সমস্ত আদেশ বা নির্দেশ জারী করিতে পারে, তাহার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

১। **হেবিয়াস্ কর্পাস্—Habeas Corpus.** সশরীরে কোন ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করিবার জন্য আদেশ দেওয়াকে হেবিয়াস কর্পাস বলা হয়। কোন ব্যক্তি যদি বন্দী বা আটক হয় তাহা হইলে বন্দী ব্যক্তির আবেদনক্রমে সুপ্রীম কোর্ট বা উচ্চ আদালত আটককারী ব্যক্তির উপর এই আদেশ জারী

করিয়া বন্দী ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করিবার নির্দেশ দিতে পারে। আদালত বিচার করিয়া দেখিবে যে, আটক ব্যক্তি আটককারী কর্তৃক আইনানুমোদিতরূপে বন্দী হইয়াছে কিনা। আদালতের মতে বন্দী ব্যক্তিকে যদি আইনানুসারে আটক করা না হইয়া থাকে তাহা হইলে আদালত বন্দী ব্যক্তিকে মুক্তি দান করিতে পারে অথবা সত্বর তাহার বিচারের ব্যবস্থা করিতে পারে। এইরূপ আদেশ জারী করিয়া আদালতগুলি ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করে।

২। **ম্যানডামাস্** - **Mandamas.** ইহাও সুপ্রীম কোর্ট বা উচ্চ বিচারালয়গুলি কর্তৃক প্রদত্ত একজাতীয় আদেশ। এই আদেশের বলে বিচারালয়গুলি কোন সরকারী কর্মচারী, কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন নিম্ন আদালতকে সাধারণ স্বার্থ-সম্পর্কে তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য আদেশ দিতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এইরূপ আদেশ জারী করা বিচারালয়গুলির অধিকারভুক্ত নহে। বিচারালয়গুলি তাহাদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া প্রয়োজনমত এইরূপ আদেশ জারী করে।

৩। **প্রহিবিশন—Prohibition.** এই জাতীয় আদেশ উচ্চতর বিচারালয়গুলি কর্তৃক নিম্নতর বিচারালয়গুলির উপর জারী করা হয়। এই আদেশ জারী করিবার উদ্দেশ্য হইল যাহাতে নিম্ন আদালতগুলি তাহাদের ক্ষমতা-বহির্ভূত বা বে-আইনী কোন কাজ করিতে না পারে। পৌর প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি জনসাধারণ-সম্পর্কিত সংস্থাগুলি যখন বিচার-ব্যবস্থার অনুরূপভাবে কোন কাজ করে, তখন এই সংস্থাগুলির উপরেও এই আদেশ জারী হইতে পারে।

৪। **সার্টিওরারি** **Certiorari.** দুইটি উদ্দেশ্যে এই আদেশ সুপ্রীম কোর্ট বা উচ্চ বিচারালয় কর্তৃক বলবৎ হইতে পারে। উচ্চ বিচারালয় কোন মামলার নিরপেক্ষ বিচার করিবার জন্য অথবা নিম্ন আদালতের ক্ষমতা-বহির্ভূত কাজে বাধা দিবার জন্য নিম্ন আদালতকে নির্দেশ দিতে পারে যে, মামলাটির শুনানীর জন্য উচ্চ আদালতে প্রেরণ করা হউক। এরূপ আদেশ পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধেও জারী করা হইতে পারে।

৫। **কো-ওয়ারেন্‌টো—Quo-Warranto.** কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কি ক্ষমতার বলে কোন বিশেষ কার্য সম্পাদন করিতেছে তাহার কারণ দর্শাইতে বলিয়া কোন বিচারালয় যে আদেশ জারী করে তাহাকে কো-ওয়ারেন্‌টো বলা হয়। এই আদেশ অনেকটা বিচারালয় কর্তৃক প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞাপত্রের (Injunction অনুরূপ।

মৌলিক অধিকারগুলির বৈশিষ্ট্য- Features of the Fundamental Rights.

ভারতের শাসনতন্ত্রে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি পর্যালোচনা করিলে ইহাদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

প্রথমতঃ, এই অধিকারগুলির কোনটিই অবাধ বা শর্তশূন্য নহে। অধিকারগুলি কেবলমাত্র রাষ্ট্র-নির্ধারিত অবস্থায় ভোগ করা যাইতে পারে। আবার এই অধিকারগুলি কতিপয় যুক্তিসঙ্গত বাধা দ্বারা সীমায়িত এবং এই বাধাগুলির যুক্তিযুক্ততা একমাত্র বিচারালয় কর্তৃক স্থিরীকৃত হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, একমাত্র ভারতীয় নাগরিকগণই এই অধিকারগুলি ভোগ করিতে পারিবে। বিদেশীরা শুধু তাহাদের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার অধিকার পাইবে।

তৃতীয়তঃ, এই অধিকারগুলি সাময়িকভাবে সংকুচিত অথবা অব্যবহার্য করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে জরুরী অবস্থা থাকাকালে এই অধিকারগুলি প্রয়োগ বলবৎ হইবে না। মার্কিন শাসনতন্ত্রে নাগরিক অধিকার সংকুচিত করিবার এরূপ কোন বিশেষ ব্যবস্থা স্থান পায় নাই।

চতুর্থতঃ, এই মৌলিক অধিকারগুলি ভারতের আইনসভা, শাসনকর্তৃপক্ষ ও কতিপয় ক্ষেত্রে বিচার-বিভাগের কার্যের বাধাস্বরূপ কাজ করে। কোন মৌলিক অধিকারের সহিত যদি আইনসভা-প্রণীত কোন আইনের বা শাসন-কর্তৃপক্ষের কোন নির্দেশের বিরোধ ঘটে তাহা হইলে সুপ্রীম কোর্ট এরূপ আইন বা নির্দেশ অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে অর্থাৎ পার্লামেণ্ট মৌলিক অধিকার-বিরোধী কোন আইন পাস করিতে পারিবে না। কিন্তু ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে গোলকনাথ ও অন্যান্য বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলায় সুপ্রীম কোর্ট

সংবিধানের চলিত ব্যাখ্যা বাতিল করিয়া দেয়। চলিত ব্যাখ্যা অনুসারে বলা হইত যে, পার্লামেণ্ট সাধারণ আইন পাস করিয়া মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। কিন্তু এই মামলায় নূতন ব্যাখ্যা দ্বারা বলা হয় যে, সংবিধানে বর্ণিত আইন শুধু সাধারণ আইন বুঝায় না, শাসনতান্ত্রিক আইনও 'আইন' কথাটির অন্তর্ভুক্ত। এই যুক্তির বলে সুপ্রীম কোর্ট সিদ্ধান্ত করে যে, সংবিধানের ১৩ ২) ধারায় যে আইনের উল্লেখ আছে, সে আইন শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইন – উভয়কে বুঝায়। সুতরাং সাধারণ আইন বা শাসনতান্ত্রিক আইন পাস করিয়া পার্লামেণ্ট মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না।

সুপ্রীম কোর্ট কতৃক এই রায় প্রদানের ফলে সরকারের পক্ষে কতকগুলি প্রগতিশীল, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যসূচী বলবৎ করিবার পথে বাধা সৃষ্টি হয়। এই বাধাগুলি দূর করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে শাসনতান্ত্রিক চতুর্বিংশতি সংশোধনী আইন পাস করা হয়। এই আইনের বলে বর্তমানে মৌলিক অধিকারসহ সংবিধানের যে-কোন অংশ সংশোধন করিবার অধিকার পার্লামেণ্টের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত এইরূপ আইনে রাষ্ট্রপতিকে সম্মতি দিতেই হইবে।

সমালোচনা – Criticism.

শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ মৌলিক অধিকারগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, নাগরিক অধিকারগুলি সংরক্ষণের জন্য শাসনতন্ত্রে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে এবং প্রয়োজনক্ষেত্রে অধিকারগুলিকে বলবৎ করিবার জন্য সুপ্রীম কোর্ট বা উচ্চ বিচারালয়ে আবেদন করিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অতীত বা ভবিষ্যৎ কোন আইন যদি মৌলিক অধিকারগুলির পরিপন্থী হয়, তাহা হইলেও সেই আইনগুলি অসিদ্ধ বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অনেক সমালোচক বলেন যে, ভারতের শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারগুলি এরূপ সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা দ্বারা এরূপভাবে সংকুচিত করা হইয়াছে যে, জনসাধারণ এই অধিকারগুলি ভোগ করিবার সুযোগ খুব কমই পাইবে। অধিকারগুলিকে যে সমস্ত বিধি-নিষেধ দ্বারা সংকুচিত করা হইয়াছে, সেগুলি পর্যালোচনা করিলে

মনে হয় যে, কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। সেইজন্য অন্যান্য দেশের মৌলিক অধিকারগুলির অনুরূপ কতকগুলি অধিকার প্রদান করিয়া সেই অধিকারগুলি যাহাতে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হয়, সেইজন্য এইরূপ চরম প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যায় যে, ভারতের সংবিধান এক হস্তে নাগরিকগণকে যে সমুদয় মৌলিক অধিকার দিয়াছে, অপর হস্ত দ্বারা নাগরিকগণকে সেই অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। ভারতের সংবিধানে আরও কতকগুলি মৌলিক অধিকারের উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সেগুলি মৌলিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত না করিয়া রাষ্ট্রপরিচালনা ক্ষেত্রে কতকগুলি আদর্শ হিসাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই আদর্শগুলি রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি নামে সংবিধানে স্থান পাইয়াছে।

নির্দেশাত্মক নীতি—Directive Principles.

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্রের ধারণা আমূল পরিবর্তিত হইয়া বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং কার্যকারিতা একমাত্র ইহার জনহিতকর কার্যকলাপের দ্বারাই সমর্থন করা যায়। তাই ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের স্বার্থসংরক্ষণ বা ইহার উন্নয়ন বর্তমান রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল সকল মানুষকে সুখী করা (To make all men happy)। যে রাষ্ট্র জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত নয়, সে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও ক্ষমতা সমর্থনযোগ্য নয়, সে রাষ্ট্র হইল শুধু ক্ষমতা-ভিত্তিক রাষ্ট্র—সে রাষ্ট্র ইহার নাগরিকগণের নিকট হইতে আনুগত্য বা বশ্যতা দাবি করিতে পারে না। রাষ্ট্রের এই মহান জনকল্যাণকামী উদ্দেশ্য সম্পর্কে যাহাতে জনসাধারণ সন্দেহাতীতরূপে আস্থাবান ও শ্রদ্ধাবান থাকে সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপগুলির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এইগুলি রূপায়ণের বাস্তব কর্মসূচী জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করা কল্যাণ রাষ্ট্রের একটি লক্ষণ। এই উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি সংবিধানে যুক্ত করা হয়।

স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের অনুকরণে ভারতের সংবিধানেও কতকগুলি রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি সংযোজিত হইয়াছে। ভারতের শাসন-

তন্ত্রের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে ভারতকে একটি জনকল্যাণকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল গণতান্ত্রিক উপায়ে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করা। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার পক্ষে রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এই গণতান্ত্রিক আদর্শ বলবৎ করা একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ শাসনতন্ত্রে কতকগুলি নির্দেশাত্মক নীতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং শাসকবর্গ যাহাতে উক্ত নীতি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাহার জন্যও যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতিগুলির মধ্যে প্রধান পার্থক্য হইল যে, কোন নির্দেশাত্মক নীতি সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে ক্ষুণ্ণ হইলে বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা তাহার প্রতিবিধানের কোন সুযোগ নাগরিকগণকে দেওয়া হয় নাই। সুতরাং নির্দেশাত্মক নীতি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্পূর্ণরূপে শাসন-কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এস্থলে আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন নির্দেশাত্মক নীতি বলবৎ করিতে গিয়া যদি কোন মৌলিক অধিকারের সহিত সংঘর্ষ বাধে তাহা হইলে সাধারণতঃ নির্দেশাত্মক নীতি কার্যক্ষেত্রে আর প্রযুক্ত হইতে পারিবে না। এরূপ ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার-গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে।

শাসনতন্ত্রে বর্ণিত নীতিগুলিকে চারিটি পৃথক পর্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, কতকগুলি অর্থনৈতিক আদর্শ এই নীতিগুলির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইবে এই নীতিগুলিকে কার্যকরী করিবার জন্য সচেষ্ট হওয়া।

দ্বিতীয়তঃ, শাসন বিভাগ ও আইন-প্রণয়ন বিভাগের ক্ষমতা পরিচালনা করিবার জন্য কতকগুলি নির্দেশ ও উপদেশ এই নীতিগুলির মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, কতকগুলি নাগরিক অধিকার এই নীতিগুলির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই অধিকারগুলি মৌলিক অধিকারগুলির মত আদালত কর্তৃক

বলবৎ করা না গেলেও রাষ্ট্রের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, রাষ্ট্র এরূপ-ভাবে ইহার শাসন-সংক্রান্ত ও আইন-প্রণয়ন-সংক্রান্ত কার্য পরিচালনা করিবে যাহাতে নাগরিকগণের পক্ষে এই অধিকারগুলি ভোগ করা সম্ভব হয়।

চতুর্থতঃ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও মৈত্রী সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে কতিপয় মূল নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে।

নির্দেশাত্মক নীতিগুলির বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য বর্ণনা করিয়া সংবিধানের ৩৮ ধারা হইতে বিভিন্ন নীতিগুলি নিম্নলিখিতরূপে বলা হইয়াছে।

মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন যাহাতে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এইরূপ জনহিতকর একটি সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করিবার জন্য রাষ্ট্র ফলপ্রসূরূপে সচেষ্ট থাকিবে।

৩৯ ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র বিশেষভাবে ইহার নীতি এরূপভাবে পরিচালিত করিবে :—

(ক) যাহাতে নারী ও পুরুষ সমানভাবে জীবিকা অর্জন করিতে পারে,

(খ) জাতীয় নৈসর্গিক সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ এরূপভাবে বণ্টিত হইবে যাহাতে সমষ্টিগত মঙ্গল সাধিত হয়,

(গ) দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এইরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে যাহার ফলে সম্পদ ও উৎপাদনের উপায়গুলি যেন সমষ্টির কল্যাণ ব্যাহত করিয়া কেন্দ্রীভূত না হয়,

(ঘ) স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই যেন সমান কাজের জন্য সমান মজুরি পায়,

(ঙ) স্ত্রী ও পুরুষ শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তির যেন অপব্যবহার না হয় ও কমবয়স্ক শিশুদের কাজে নিযুক্ত না করা হয় এবং বয়স ও সামর্থ্যের তুলনায় অসম কাজে যেন কোন নাগরিক অর্থনৈতিক তাগিদে নিযুক্ত হইতে বাধ্য না হয়,

(চ) শিশু ও যুবকগণ যাহাতে শোষণ ও অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পায়।

৪০ ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গঠনে সচেষ্ট থাকিবে এবং এই পঞ্চায়েতগুলিতে প্রয়োজনীয় এরূপ ক্ষমতা প্রদান করিবে যাহার বলে এইগুলি স্থানীয় শাসনপ্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করিতে সমর্থ হইবে।

৪১ ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র ইহার অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও উন্নয়নের

সীমার মধ্যে সকল নাগরিকেরই কর্ম ও শিক্ষার ব্যবস্থা, বেকার অবস্থায়, বার্ধক্যে, অসুস্থতা ও অক্ষমতার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য দান করিবার ফলপ্রসূ ব্যবস্থা করিবে।

৪২ ধারা অনুসারে রাষ্ট্র কাজের জন্য ন্যায় ও সহানুভূতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি এবং মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠা করিবে।

৪৩ ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র উপযুক্ত আইন-প্রণয়ন অথবা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংগঠন অথবা অন্য উপায় দ্বারা এরূপ ব্যবস্থা করিবে যাহাতে কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য শ্রমিকগণের বাঁচিয়া থাকিবার মতন মজুরি পাইতে পারে এবং এরূপ কর্মপরিবেশের সৃষ্টি হয় যাহার ফলে তাহারা ভদ্র জীবনযাত্রার মান, বিশ্রামভোগ ও সামাজিক ও কৃষ্টিগত সুযোগের সুবিধা পায়। কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও গ্রামাঞ্চলে সমবায়ের প্রসারের জন্য রাষ্ট্র বিশেষভাবে সচেষ্ট থাকিবে।

৪৪ ধারায় ভারতের সর্বত্র নাগরিকগণের জন্য একই দেওয়ানী বিধি প্রবর্তনের জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকিবে।

৪৫ ধারায় বলা হইয়াছে যে, সংবিধান প্রবর্তিত হইবার দশ বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্র চৌদ্দ বৎসরের অনধিক বালকবালিকাদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবে।

৪৬ ধারা মতে রাষ্ট্র দুর্বল ও অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলির বিশেষতঃ তপশীলী জাতি ও উপজাতিগুলির অর্থনৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নয়নের জন্য এবং ইহাদের সামাজিক অবিচার ও সর্বপ্রকার শোষণ মুক্ত করিবার জন্য সচেষ্ট থাকিবে।

৪৭ ধারায় উক্ত হইয়াছে যে, রাষ্ট্র জনগণের পুষ্টির, জীবনযাত্রার মানের ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকে ইহার প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিবে এবং একমাত্র ঔষধ হিসাবে ব্যবহারের ক্ষেত্র ব্যতীত স্বাস্থ্যহানিকর উত্তেজক পানীয় ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করিবার জন্য সচেষ্ট থাকিবে।

৪৮ ধারায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, যথা, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষি-ব্যবস্থাপনা, পশুপালন বিশেষতঃ উত্তম পশুপ্রজনন, গো-হত্যা নিবারণ ইত্যাদি।

৪৯ ধারায় বলা হইয়াছে যে, পার্লামেণ্ট কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় গুরুত্ব-সম্পন্ন ঐতিহাসিক ও সুরুচি-সম্পন্ন স্থান ও বস্তুসমূহ ধ্বংস, স্থানচ্যুত, হস্তান্তর বা রপ্তানি বন্ধ করিয়া এইগুলিকে সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৫০ ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগকে পৃথক্ করিবার চেষ্টা করিবে।

৫১ ধারায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কার্যকর করিবার জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকিবে :

(ক) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা,

(খ) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সম্পর্ক বজায় রাখা,

(গ) সুসংবদ্ধ জাতিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন ও সন্ধি প্রভৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং

(ঘ) শালিসীর দ্বারা আন্তর্জাতিক বিরোধগুলির মীমাংসা।

নির্দেশাত্মক নীতিগুলির প্রকৃতি—Nature of the Directive Principles.

নির্দেশাত্মক নীতিগুলি বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, প্রস্তাবনায় উল্লিখিত রাষ্ট্রের মহান উদ্দেশ্যগুলির উপর দৃষ্টি রাখিয়া নির্দেশাত্মক নীতিগুলি রচিত হইয়াছে। কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল সকলের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার (Justice, Social, Economic and Political) প্রতিষ্ঠা করা। এই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে সমাজ-ব্যবস্থায় স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব (Liberty, Equality and Fraternity) স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হইবে। এই মহৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ সরকারী শাসনকার্য পরিচালনা ক্ষেত্রে এই নীতিগুলিকে কার্যকর করিবার নির্দেশ দান করিয়াছেন যদিও এই নীতিগুলিকে আইন সাহায্যে বলবৎ করা যায় না।

এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ভারত অতি নবীন রাষ্ট্র এবং ইহার শক্তি-সামর্থ্যও সীমিত। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে এই নীতিগুলিকে

কার্যে রূপদান করা সম্ভব না হইতে পারে, তবে কালক্রমে এই লক্ষ্যগুলিকে সম্পূর্ণভাবে রূপদান করিবার দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা করা হইয়াছে। ৩৭ ধারায় একথা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে।

এ পর্যন্ত ভারত সরকার সমাজ-ব্যবস্থায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। অস্পৃশ্যতা বর্জন, স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা, দুর্বল ও অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির অর্থনৈতিক ও শিক্ষা-বিষয়ক উন্নয়নের ব্যবস্থাগুলিকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকল্পে সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে। অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকল্পেও ভারত সরকার দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন। জমিদারী প্রথার বিলোপ, ভূমি-সংস্কারমূলক নানা আইন প্রবর্তন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপায়ণ, বীমা কোম্পানী ও বড় বড় ব্যাংকগুলির জাতীয়করণ, রাজন্যভাতা বিলোপ প্রভৃতি হইতেই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংকল্প উপলব্ধি করা যায়।

ভারত সরকার যে নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে ফলপ্রসূ করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন তাহা সংবিধানের পঞ্চবিংশতি সংশোধনী আইনটি হইতে বুঝিতে পারা যায়। আদি সংবিধান অনুসারে ইহাই বিধিবদ্ধ ছিল যে, কোন মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া নির্দেশাত্মক নীতিগুলির কোনটিকেই বলবৎ করা যাইবে না অর্থাৎ মৌলিক অধিকার-বিরোধী কোন নির্দেশাত্মক নীতিই কার্যক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। সংবিধানের পঞ্চবিংশতি সংশোধন আইন দ্বারা সংবিধানের ৩৯ (খ) ও (গ) ধারা দুইটিতে বর্ণিত নির্দেশাত্মক নীতিগুলির অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত দুইটি ধারায় বলা হইয়াছে যে, (৩৯খ) দেশের সম্পদের মালিকানা ও কর্তৃত্ব যেন সর্বসাধারণের হিতার্থে বণ্টিত হয় এবং (৩৯গ) দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনার ফলে যেন দেশের সম্পদ ও উৎপাদনের উপায়গুলি অল্পসংখ্যক লোকের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইয়া জনস্বার্থ ব্যাহত না করিতে পারে। পঞ্চবিংশতি সংশোধন আইনবলে রাষ্ট্র বর্তমানে ৩৯ (খ ও গ) ধারায় বর্ণিত উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত এরূপ আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে যে আইন সংবিধানের ১৪, ১৯ ও ৩১ ধারায় বর্ণিত যথাক্রমে সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার ও সংরক্ষিত সম্পত্তির অধিকার-বিরোধী হইলেও বলবৎ করা যাইবে। কোন বিচারালয়ই এই আইনকে মৌলিক অধিকার-বিরোধী আইন বলিয়া অবৈধ ঘোষণা করিতে পারিবে না।

সুতরাং নির্দেশাত্মক নীতিগুলি শুধুমাত্র আদর্শ নহে। তবে এই নীতিগুলির পূর্ণ রূপায়ণ সময়সাপেক্ষ।

সমালোচনা—Criticism.

নির্দেশাত্মক নীতিগুলি সম্পর্কে বলা যায় যে, এই নীতিগুলি যখন বিচারালয় কর্তৃক বলবৎ করা যায় না তখন শাসনতন্ত্রে এগুলির উল্লেখ নিরর্থক হইয়াছে। অনেক সমালোচক বলিয়াছেন যে, অজ্ঞ সরল ভারতীয়গণকে বাক্যের দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিবার উদ্দেশ্যেই এই নিরর্থক আদর্শের অবতারণা করা হইয়াছে। নির্দেশাত্মক নীতিগুলি জনসাধারণের নিকট সরকারের কতকগুলি নৈতিক প্রতিশ্রুতি। কিন্তু যে প্রতিশ্রুতি পালন করিবার কোন আইনসম্মত বাধ্য-বাধকতা নাই, সে প্রতিশ্রুতির কোন মূল্যও থাকিতে পারে না, এবং সে প্রতিশ্রুতি যতই শ্রুতিমধুর হউক না কেন কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না। স্বাধীনতা অর্জনের পর দীর্ঘ উনত্রিশ বৎসর অতিক্রান্তপ্রায়। জনসাধারণ অধীর আগ্রহে ন্যায়বিচারের বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক ন্যায়-বিচারের অপেক্ষায় আছে। বার্ধক্যে, অসুস্থ অবস্থায় বা অক্ষমতার ক্ষেত্রে সাহায্য পাওয়া দূরের কথা, ক্রমবর্ধমান মূল্য, করভার ও বেকারীর সংখ্যার নিষ্পেষণে জনসাধারণের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হইয়াছে। শিক্ষাব্যবস্থা বিপর্যস্ত। অর্থনৈতিক অসাম্য হ্রাসের কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। নির্দেশাত্মক নীতিগুলি সম্পর্কে আরও বলা যাইতে পারে যে, এই নির্দেশ কে কাহাকে দিতেছে। ভারতে শাসনক্ষমতার একমাত্র উৎস হইল—ভারতের জনগণ। সুতরাং জনগণ তাহাদের নিজেদের উদ্দেশ্যে এই নীতিগুলি প্রচার করিতে পারে না। কিন্তু সরকার এই নীতিগুলিকে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন পূর্বেই তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

নির্দেশাত্মক নীতিগুলির তাৎপর্য—Significance of the Directives.

নির্দেশাত্মক নীতিগুলির সম্পর্কে শেষ বিশ্লেষণে বলা যায় যে, প্রস্তাবনায় উল্লিখিত আদর্শগুলির পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। কিন্তু একটু প্রণিধানপূর্বক

দেখিলেই এই নীতিগুলির তাৎপর্য দেখা যায়। প্রথমতঃ, গণতন্ত্র হইল দলীয় শাসন। কোন সময় দক্ষিণপন্থী, কোন সময় বামপন্থী, আবার কোন সময় বা মধ্যপন্থী দল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইতে পারে। যে দলই ক্ষমতাসীন হউক না কেন, এই নীতিগুলির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক উদ্দেশ্যগুলিকে একেবারে অবজ্ঞা করিতে পারিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, এই নীতিগুলির পশ্চাতে আইনসম্মত কোন সমর্থন না থাকিলেও ইহার একটি রাজনৈতিক ও নৈতিক সমর্থন আছে। নির্বাচন কালে ভোটদাতার নিকট এই নীতিগুলি অবহেলা করিবার জন্য ভোটপ্রার্থী দায়ী হইবে।

তৃতীয়তঃ, ভারতের শাসনতন্ত্রে নাগরিকগণের কোন অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু নির্দেশাত্মক নীতিগুলির অন্তর্ভুক্ত কতিপয় নীতি এই অর্থনৈতিক অধিকারের স্থান পূরণ করিয়া ধনী ও দরিদ্রকে সমপর্যায়ভুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, এই নীতিগুলিই হইল শাসন পরিচালনার মূলনীতি। এই আদর্শগুলি শাসনকার্যে ও আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে বলবৎ হইলে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ যে অনেক পরিমাণে সুগম হইবে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ভিত্তি হইল পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, যে শাসনব্যবস্থা নাগরিকগণের সমাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া মৈত্রীভাব আনয়ন করিতে পারে। প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে ভারতের সংবিধানে এই নীতিগুলি স্থান পাইয়াছে। এই নীতিগুলি এখনও পর্যন্ত শাসনক্ষেত্রের সর্বত্র সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্ত না হইলেও বলা যাইতে পারে যে, অনেকক্ষেত্রে শাসন কর্তৃপক্ষ এই নীতি কার্যক্ষেত্রে বলবৎ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতি—Fundamental Rights and the Directives.

নির্দেশাত্মক নীতিগুলির সহিত মৌলিক অধিকারসমূহের মূলগত পার্থক্য দেখা যায়। উভয়ের প্রকৃতি, বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য বিভিন্ন।

প্রথমতঃ, নির্দেশাত্মক নীতিগুলি এরূপ কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করে যাহা রাষ্ট্র সর্বদা কার্যে রূপায়িত করিবার প্রয়াস পাইবে, অপরপক্ষে মৌলিক অধিকারের উল্লেখ দ্বারা রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট কতিপয় কার্য করিতে বিরত থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং মৌলিক অধিকারগুলি হইল রাষ্ট্রের অবাধ ক্ষমতার বাধাস্বরূপ, আর নির্দেশাত্মক নীতিগুলি দ্বারা রাষ্ট্র সরকারকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনের উপায়স্বরূপ ইহার নীতি ও কার্য পরিচালনার জন্য নির্দেশ দান করিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, এই নীতিগুলির ত্রুটি হইল যে, মৌলিক অধিকারগুলির মত ইহারা এককভাবে কার্যকরী নহে। এই নীতিগুলির বলে কোন প্রচলিত আইন বা আইনসম্মত অধিকার ক্ষুণ্ণ করা যায় না। এই নীতিগুলি কার্যক্ষেত্রে বলবৎ করিতে হইলে এ সম্পর্কে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন হয়।

তৃতীয়তঃ, নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎ করা যায় না, কিন্তু মৌলিক অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক যথোপযুক্ত নির্দেশ দ্বারা বলবৎ করা যায়। সুতরাং মৌলিক অধিকারগুলির তুলনায় নির্দেশাত্মক নীতিগুলি শুধু মর্যাদাহীন নহে, এগুলি ফলপ্রসূও নহে।

চতুর্থতঃ, মৌলিক অধিকারের সহিত কোন আইনের বিরোধ ঘটিলে আদালতসমূহ মৌলিক অধিকারকে অগ্রাধিকার দিবে, কিন্তু নির্দেশাত্মক নীতি ও প্রচলিত কোন আইনের সংঘাতক্ষেত্রে নির্দেশাত্মক নীতি অবৈধ, সুতরাং নিষ্ফল ঘোষিত হইবে।

পঞ্চমতঃ, নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে বলবৎ করিবার জন্য সরকারকে বাধ্য করা যায় না। উদাহরণে বলা যায় যে, বেকারগণ সরকারকে চাকুরি দিতে বাধ্য করিতে পারেন না।

পরিশেষে বলা যায় যে, নির্দেশাত্মক নীতিগুলির তুলনায় মৌলিক অধিকারগুলিকে অগ্রাধিকার ও অধিক মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটিলে মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ রহিবে। কিন্তু ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের সাংবিধানিক পঞ্চবিংশতি সংশোধনী আইন দ্বারা ৩৯ (খ ও গ) ধারায় বর্ণিত নির্দেশাত্মক নীতি দুইটিকে ১৪, ১৯, ও ৩১ ধারায় বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলির সম্পর্কে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে।

দ্বাদশ শ্রেণী

সপ্তম অধ্যায়

শাসনতন্ত্র

(Constitution of the State)

শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা—Necessity of a Constitution.

প্রত্যেক দেশের শাসনব্যবস্থা শাসক-শাসিতের আইনগত সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্র-উৎপত্তির আরম্ভ হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে শাসক-শাসিতের এই সম্পর্ক বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। অতীত যুগে এই সম্পর্ক শুধু শাসকশ্রেণীর ক্ষমতারদ্ব ারা নির্ধারিত হইত। সম্পর্ক নির্ণয়ে শাসিতের ইচ্ছার কোন স্থান ছিল না। বর্তমানে গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে শাসক-শাসিতের এই সম্পর্ক একটা সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বর্তমান যুগে মানুষ আর কোন উচ্চতর ক্ষমতাবিশিষ্ট মানুষ দ্বারা শাসিত হইতে চায় না। এখন প্রবর্তিত হইয়াছে আইনের শাসন। এই শাসনব্যবস্থায় শাসিতের ইচ্ছা শুধু যে কার্যকরী হইয়াছে তাহা নয়, শাসিতের ইচ্ছানুসারেই বর্তমান যুগে শাসনব্যবস্থা গঠিত হয় ; পূর্বযুগের ক্ষমতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শাসক-শাসিত সম্পর্ক বর্তমান যুগে শাসিতের ইচ্ছার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক দেশে এই শাসক-শাসিত সম্পর্ক যাহাতে স্থায়িত্ব লাভ করে ও শাসকশ্রেণী স্বৈরাচারী হইতে না পারে, সেজন্য কতকগুলি মৌলিক বিধিনিষেধ দ্বারা শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই মৌলিক বিধিনিষেধগুলিই বর্তমান যুগে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া শাসনব্যবস্থাকে কার্যকরী রাখে।

সংজ্ঞা—Definition.

প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একটা নিজস্ব শাসনতন্ত্র থাকে। শাসনতন্ত্র ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। মানুষের দৈনন্দিন জীবন যেরূপ কতকগুলি বিধিনিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, রাষ্ট্রের কার্যকলাপও তদ্রূপ

কতকগুলি বিধিনিষেধের দ্বারা সীমায়িত। এই বিধিনিষেধগুলির অবর্তমানে রাষ্ট্র স্বৈরাচারী হইতে পারে। শাসনতন্ত্র বলিতে আমরা বুঝি কতকগুলি প্রয়োজনীয় আইন-কানুন এবং কতকগুলি বিধিনিষেধ ও প্রথা, যেগুলি অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্র শাসনকার্য পরিচালিত করে। রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনা করে সরকার। শাসনতন্ত্র নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্ধারিত করিয়া শাসনব্যবস্থা চালু রাখে—সরকারের কি কি ক্ষমতা থাকিবে ও কি-ভাবে সেই ক্ষমতাসমূহ শাসনকার্যে প্রয়োগ করা হইবে, কি নিয়ম অনুসারে সরকার গঠিত ও পরিচালিত হইবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কি সম্পর্ক বিদ্যমান থাকিবে ও সর্বোপরি শাসক ও শাসিতের কি কি অধিকার ও দায়িত্ব থাকিবে। সুতরাং শাসনতন্ত্র হইল কতকগুলি লিখিত ও অ-লিখিত আইনের সমষ্টি, যেগুলির দ্বারা একদিকে সরকারের সংগঠন ও কার্যকলাপ অপরদিকে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। কোন দেশের বর্তমান শাসনতন্ত্র বলিতে বুঝায় সেই দেশের রাষ্ট্রগঠনকালীন মূল শাসনতন্ত্র ও পরবর্তী কালের শাসনতন্ত্রের সংশোধন—এই উভয়ের সমষ্টিকে শাসনতন্ত্র বলা হয়।

শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ—Classification of Constitutions.

পূর্বতন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা শাসনতন্ত্রের দুইটি ভাগের উল্লেখ করিয়াছেন। একটি হইল **অ-লিখিত** (Unwritten), অপরটি হইল **লিখিত** (Written)। অ-লিখিত শাসনতন্ত্র কোন পূর্ব-পরিকল্পিত নিয়ম অনুযায়ী গঠিত হয় না। এই শাসনতন্ত্র বিভিন্ন প্রথা ও আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তির উপর ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। আইনসভা বা কোন প্রতিনিধিমূলক সংসদ্ দ্বারা রচিত আইন এই শাসনতন্ত্রে কমই দেখা যায়। এই শাসনতন্ত্র কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট প্রতিনিধি-সংসদ্ দ্বারা রচিত হয় না। ইহা ক্রমবিবর্তনের ফলে গড়িয়া উঠে। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই শাসনতন্ত্র কতকগুলি প্রথা এবং বিধিব্যবস্থা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের সমষ্টিমাত্র। যে প্রথা ও বিধি-ব্যবস্থাগুলি বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে, অ-লিখিত হইলেও সেগুলি লিখিত আইনের মতই কার্যকর হয়।

লিখিত শাসনতন্ত্রে প্রত্যেকটি বিষয়ই লিপিবদ্ধ থাকে। এই জাতীয় শাসনতন্ত্র পূর্ব-পরিকল্পনানুযায়ী একটি নির্দিষ্ট প্রতিনিধি-সংসদ্ দ্বারা রচিত হয়। শাসক-শাসিতের সম্পর্ক এই শাসনতন্ত্রে বিশদভাবে লিখিত থাকে। লিখিত শাসনতন্ত্র একটিমাত্র বৃহৎ আইনের দ্বারা গঠিত হইতে পারে, যেমন আমাদের ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র, অথবা ইহা বিভিন্ন সময়ে রচিত আইনের সমষ্টিও হইতে পারে। বর্তমান যুগে অধিকাংশ দেশেই লিখিত শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফরাসী দেশ, ভারত, সোভিয়েত প্রভৃতি দেশে এই লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

লিখিত ও অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের পার্থক্য সুস্পষ্ট নয় —Distinction between a Written Constitution and an Un-written one—not well-marked.

শাসনতন্ত্রের উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ সুস্পষ্ট নয়, বিজ্ঞানসম্মতও নয়। প্রথমতঃ বলা যায় যে, কোন অ-লিখিত শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণ অ-লিখিত হইতে পারে না। অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে অনেক লিখিত অংশ থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বৃটিশ শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ অ-লিখিত হইলেও সম্পূর্ণভাবে অ-লিখিত নয়। ম্যাগ্‌না কার্টা, অধিকারের সনদ (Bill of Rights) প্রভৃতি কতকগুলি লিখিত অংশ এই অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, লিখিত শাসনতন্ত্রেও অ-লিখিত অংশ থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র মূলতঃ লিখিত হইলেও ক্যাবিনেটের উৎপত্তি, রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নির্বাচন-নীতির পরিবর্তন প্রভৃতি শাসনতান্ত্রিক নিয়মগুলি অ-লিখিত প্রথার দ্বারা প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে। সুতরাং লিখিত শাসনতন্ত্রে অ-লিখিত অংশের ও অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে লিখিত অংশের অস্তিত্ব বিদ্যমান। সকল শাসনতন্ত্রই লিখিত ও অ-লিখিত বিধিব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন শাসনতন্ত্রে লিখিত অংশ বেশী, অ-লিখিত অংশ কম। আবার কোন শাসনতন্ত্রে অ-লিখিত অংশ বেশী, লিখিত অংশ কম। সুতরাং ইহাকে মূলগত পার্থক্য বলা যায় না।

তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের এইরূপ শ্রেণীবিভাগের ফলে পরোক্ষভাবে এই ভুল ধারণা জন্মিতে পারে যে, যে-দেশে লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখানকার উচ্চ আদালত আইনসভা-রচিত আইন শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া বে-আইনীরূপে বাতিল করিতে পারে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এ-কথা সত্য নয়। ফরাসী দেশের শাসনতন্ত্র লিখিত, কিন্তু সে-দেশের উচ্চ আদালত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের মত আইনসভা-প্রণীত কোন আইনকে বে-আইনী বলিয়া বাতিল করিতে পারে না।

চতুর্থতঃ, বলা হয় যে, অ-লিখিত শাসনতন্ত্র অপেক্ষা লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা ব্যক্তিস্বাধীনতা অধিকতর সুরক্ষিত করা যায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যক্তিস্বাধীনতা শাসনতন্ত্রের লিখিত প্রকৃতির উপর চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে না। বৃটিশ শাসনতন্ত্র অ-লিখিত, তাহা সত্ত্বেও বৃটিশ জাতি স্বাধীন; আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানীর লিখিত শাসনতন্ত্র হিট্‌লারের শাসনসময়ে জার্মান জাতির অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই।

কোন শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণরূপে লিখিত বা অ-লিখিত হইতে পারে না বা হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়। শাসনতন্ত্র যদি সম্পূর্ণভাবে লিখিত হয়, তাহা হইলে জাতীয় জীবনে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়। শাসনতন্ত্র জাতীয় জীবনের রাষ্ট্রনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের জীবন্ত প্রতীক। জাতীয় জীবন-ধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনদর্শন ও আদর্শ পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়া জাতীয় জীবনের অগ্রগতির পথ সুগম করিয়া দেয়। সুতরাং জাতীয় জীবনের প্রয়োজনেই শাসনতন্ত্র ধীরে ধীরে বিবর্তনের মধ্য দিয়া প্রথা ও আদালতের সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিপুষ্ট ও পূর্ণতা-প্রাপ্ত হয়।

অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের সুবিধা ও অসুবিধা—Merits and Demerits of Un-written Constitution.

অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল যে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে এই শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিয়া শাসনতন্ত্রকে সময়োপযোগী করা যায়। জাতীয় জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিয়া উহা জাতীয়

অগ্রগতির পথ সুগম করে। অ-লিখিত শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তনশীল বলিয়া ইহার সংস্কার সকল সময়ে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সাধিত হইতে পারে।

অ-লিখিত শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা যায় বলিয়া ইহার কোন স্থায়িত্ব থাকে না। প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনেও সাধারণের দাবীতে ইহা পরিবর্তিত হইতে পারে। ফলে, শাসনতন্ত্রের অনেক উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যও নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অ-লিখিত শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ প্রচলিত প্রথা ও আচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ইহার বিধিনিষেধগুলি সুস্পষ্ট হইতে পারে না। স্পষ্টতার অভাবের দরুণ শাসকগণ তাঁহাদের নিজেদের ইচ্ছামত ইহার ব্যাখ্যা করিতে পারেন ও সেজন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা অনেক সময় ব্যাহত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় অ-লিখিত শাসনতন্ত্র একেবারেই অনুপযোগী।

লিখিত শাসনতন্ত্রের সুবিধা ও অসুবিধা—Merits and Demerits of Written Constitution.

লিখিত শাসনতন্ত্রে শাসক-শাসিতের সম্পর্কের সমস্ত বিষয় সুস্পষ্টরূপে লিখিত থাকে বলিয়া ইহাতে কোন বিষয়ের সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এই সুস্পষ্টতার জন্য শাসকবর্গ ও জনসাধারণ তাহাদের ন্যায্য অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় লিখিত শাসনতন্ত্র অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার-গুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করিয়া দিয়া এই লিখিত শাসনতন্ত্র উভয় সরকারের কার্যের সীমারেখা স্থির করিয়া দেয়। অ-লিখিত শাসনতন্ত্র অপেক্ষা ইহা অধিকতর স্থায়ী।

লিখিত শাসনতন্ত্রের দোষ হইল যে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে ইহার দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব নয়। সহজে পরিবর্তন করা যায় না বলিয়া দেশে অসন্তোষের সৃষ্টি হইতে পারে। অনেক সময় জাতীয় জীবনের রাষ্ট্রনৈতিক অগ্রগতির পথে ইহা বাধা সৃষ্টি করিয়া দেশে বিদ্রোহ ঘটাইতে পারে।

নমনীয় ও অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র—Flexible and Rigid Constitution.

শাসনতন্ত্রের লিখিত ও অ-লিখিত এই শ্রেণীবিভাগ অলীক ও অবাস্তব

বলিয়া লর্ড ব্রাইস্ শাসনতন্ত্রকে নমনীয় ও অ-নমনীয় এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন-পদ্ধতি সহজ কি জটিল এই পার্থক্যের ভিত্তির উপর এই শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। যদি শাসনতন্ত্র সহজেই পরিবর্তন করা চলে অর্থাৎ দেশের আইনসভা সাধারণ আইনের মত শাসনতন্ত্র-বিষয়ক আইনও ভোটাধিক্যে যদি পরিবর্তন করিতে পারে তাহা হইলে তাহাকে নমনীয় শাসনতন্ত্র বলা হয়। এই ব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তনের জন্য কোনরূপ বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয় না। শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইন একই পর্যায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। দেশের আইনসভা উভয়বিধ আইন পরিবর্তনের অধিকারী হয়। বৃটিশ শাসনতন্ত্র নমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পার্লামেন্ট সভা সাধারণ আইন পরিবর্তন-পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক আইনগুলিও পরিবর্তন করিয়া থাকে। এজন্য কোন বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। ইংলণ্ডে শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় না ও রাজা-সহ পার্লামেন্ট সভা উভয়বিধ আইন-প্রণয়ন ও পরিবর্তনের পূর্ণ-অধিকারী।

অপরপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে অ-নমনীয় বলা হয়। এই শাসনতন্ত্রের যদি একটি সামান্যতম পরিবর্তনও করিতে হয় তাহা হইলে একটা বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। দেশের আইনসভা সাধারণ আইন-পরিবর্তন-পদ্ধতিতে শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তন করিতে পারে না। মার্কিন দেশে শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তন করিতে হইলে নিম্নলিখিত জটিল পদ্ধতির আশ্রয় লইতে হয়। কংগ্রেস-সভার দুই পরিষদের মোট সদস্যদের $\frac{২}{৩}$ অংশকে এই পরিবর্তনের প্রস্তাব সমর্থন করিতে হইবে, বিকল্পে পঞ্চাশটি রাজ্যের $\frac{২}{৩}$ রাজ্য দ্বারা এই পরিবর্তনের জন্য বিশেষ একটি সভা আহ্বান করিয়া প্রস্তাবটি সমর্থন করাইতে হইবে। এইরূপে সমর্থিত পরিবর্তনের প্রস্তাব $\frac{৩}{৪}$ রাজ্যের আইনসভা কিংবা আহূত সভায় উপস্থিত $\frac{৩}{৪}$ সংখ্যক সদস্য দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে। এই পদ্ধতি সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি অপেক্ষা বহু গুণে জটিল। সেইজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এযাবৎ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের সংখ্যা অতি অল্প। যে-দেশে অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র প্রচলিত, সেখানে শাসনতান্ত্রিক আইনগুলি সাধারণ

আইন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। শাসনতান্ত্রিক আইনগুলিকে একটা বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়।

নমনীয় শাসনতন্ত্রের সুবিধা ও অসুবিধা—Merits and Demerits of Flexible Constitution.

নমনীয় শাসনতন্ত্রের অনেকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমতঃ, শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের জন্য বিশেষ কোন অসুবিধা নাই বলিয়া জাতীয় প্রগতির সঙ্গে ইহার সমন্বয় করা যায়। শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা যায় বলিয়া বিনা রক্তপাতে শাসনতন্ত্রের আমূল পরিবর্তন করা যায়। সহজে পরিবর্তনশীল বলিয়া জনমতের দাবী পূরণ করা যায় ও তাহাতে জনমত শান্ত থাকে। লোকে ইচ্ছা করিয়া শাসনতন্ত্র ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করে না।

স্থায়িত্বের অভাব হইল এই শাসনতন্ত্রের প্রধান ত্রুটি। সদা-পরিবর্তনশীল জনমতের প্রভাবে এই শাসনতন্ত্রও পরিবর্তিত হইতে পারে। নিয়ত পরিবর্তনশীল শাসনতন্ত্র জনমতের আস্থাভাজন হইতে সক্ষম হয় না। নাগরিক অধিকার ও স্বার্থ এইরূপ পরিবর্তনশীল শাসনতন্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত হইতে পারে না। সুতরাং জনসাধারণ এই শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে স্বভাবতঃই সন্দেহপরায়ণ হইয়া উঠে।

অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ ও অপগুণ—Merits and Demerits of Rigid Constitution.

অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল ইহার স্থায়িত্ব। এই শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন শুধু জনমতের প্রভাবে হয় না। এই শাসনতন্ত্রের আইনগুলি লিখিত বলিয়া ইহা স্পষ্ট এবং ইহার মধ্যে অনিশ্চয়তা কম। দ্রুত ও সহজে পরিবর্তনশীল নয় বলিয়া জনগণের অধিকার ও স্বার্থ ইহা দ্বারা অধিকতরভাবে সুরক্ষিত হয় ও সেজন্য শাসনতন্ত্রে জনগণের আস্থা থাকে। যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র অতীব উপযোগী।

কিন্তু ইহার ত্রুটি হইল যে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা যার না বলিয়া জাতীয় অগ্রগতির পথে উহা অনেক সময় বাধা সৃষ্টি করে। ফলে জনগণের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। জাতীয় জীবনের পরিবর্তনের সহিত যদি শাসনতন্ত্রের সামঞ্জস্যবিধান না করা যায়, তাহা হইলে সে শাসনতন্ত্র কার্যকর হইতে পারে না।

শাসনতন্ত্রের আধুনিক প্রবণতা—Modern Tendencies in Constitutions.

শাসনতন্ত্রকে যেরূপ লিখিত ও অ-লিখিত ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করা যুক্তিসংগত নয়, তদ্রূপ নমনীয় ও অ-নমনীয়রূপে ইহার শ্রেণীবিভাগ করা কতদূর যুক্তিসংগত তাহা বিচারসাপেক্ষ। সংক্ষেপে বলা যায় যে, শাসনতন্ত্র শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারিত করে। শাসক-শাসিতের এই সম্পর্ক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয় হইলেও ইহার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব লাঘব হয় না। মানুষের চিন্তাধারা, প্রয়োজন ও আদর্শ ক্রমশঃ নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে এবং এই পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনও জাতীয় জীবনে অনস্বীকার্য। যেখানে এই পরিবর্তনের কোন ব্যবস্থা নাই, সেখানে শাসনতন্ত্রের মর্যাদাহানি হইবার সম্ভাবনা বর্তমান থাকে। তাই প্রত্যেক দেশের শাসনতন্ত্রে,—কি লিখিত বা অ-লিখিত, কি নমনীয় বা অ-নমনীয়,—পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ব্যবস্থা থাকা অতীব প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয়। যে শ্রেণীরই শাসনতন্ত্র হউক না কেন, সকল শাসনতন্ত্রই অল্পবিস্তর তিনটি উপাদানের সমাবেশে গঠিত হয়। প্রথমতঃ, দেখা যায় যে, প্রত্যেক শাসনতন্ত্রে অল্পবিস্তর পরিমাণে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রণীত শাসনতান্ত্রিক আইন স্থান পায়। দ্বিতীয়তঃ, প্রচলিত প্রথা ও বিধিবিধান দ্বারা শাসনতন্ত্রের অনেকাংশ পরিপুষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ, বিচারালয়গুলির সিদ্ধান্ত শাসনতন্ত্রের পরিবর্ধনে ও পরিবর্তনে অনেক সহায়তা করে। বৃটেন ও মার্কিন দেশের শাসনতন্ত্রে পার্থক্য থাকিলেও এই উভয় শাসনতন্ত্রই শেষোক্ত উপাদানটির দ্বারা প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে। কিন্তু এই সঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শাসনতন্ত্রের উপর উপরি-উক্ত তিনটি উপাদানের প্রভাব সর্বত্র সমানভাবে কার্যকর নাও হইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত হইলেও প্রচলিত প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের প্রভাব হইতে মুক্ত নয়। অপরপক্ষে, বৃটেনের শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ প্রচলিত প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রণীত আইনের প্রভাব হইতে মুক্ত নয়।

সাধারণতঃ বৃটিশ শাসনতন্ত্রকে নমনীয় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে

অ-নমনীয় বলা হয়। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই পার্থক্য মূলগত পার্থক্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বৃটিশ শাসনতন্ত্র অতি সহজেই সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতিতে পার্লামেন্ট সভা কর্তৃক পরিবর্তিত হইতে পারে, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি হইতে পৃথক্ একটি জটিল পদ্ধতি ব্যতীত পরিবর্তিত হইতে পারে না। কিন্তু এই নিয়মতান্ত্রিক জটিল পদ্ধতি ছাড়াও মার্কিন দেশের শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের অন্য পন্থা আছে ও সেই পন্থা অনুসরণ করিয়া মার্কিন দেশের শাসনতন্ত্রের সময়োপযোগী বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এ-কথা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, জাতীয় রাজনৈতিক জীবনধারার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান শাসনতন্ত্র ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ফিলাডেল্‌ফিয়ায় রচিত ও ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে গৃহীত আদি শাসনতন্ত্র হইতে বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রশ্ন হইল, এই অসংখ্য পরিবর্তন শাসনতন্ত্রের অ-নমনীয়তা সত্ত্বেও কিভাবে সম্ভব হইল? নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে মাত্র ২৫টি সংশোধন হইয়াছে। অবশিষ্ট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্ভব হইয়াছে প্রথা ও বিচারালয়ের মাধ্যমে। প্রথাগত বিধির দ্বারাই ক্যাবিনেটের উৎপত্তি হইয়াছে। বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা জাতীয় বা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস-সভার ক্ষমতা বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা ধীরে ধীরে এরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, আদি শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ তাহা কল্পনা করিতে পারিতেন না। এইরূপে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের গঠনপ্রকৃতি ও তাৎপর্য উভয়েরই পরিবর্তন হইয়াছে। সুতরাং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন-পদ্ধতি শাসনতন্ত্র-পরিবর্তনের একমাত্র পদ্ধতি বা পন্থা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। যেখানে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সহজ নয় সেখানে অন্য উপায়ে—প্রথা বা বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সহজসাধ্য করা হয়। শাসনতন্ত্র কোনক্রমে স্থাণুর মত থাকিতে পারে না। সুতরাং সকল শাসনতন্ত্রই পরিবর্তনশীল। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র বৃটিশ শাসনতন্ত্র অপেক্ষা কম নমনীয় নহে।

বর্তমান যুগে নানাকারণে শাসনতন্ত্রগুলি অ-নমনীয়তার দিকে ঝুঁকিয়া

পড়িতেছে। এমন কি সর্বাপেক্ষা অধিক নমনীয় বৃটিশ শাসনতন্ত্রও ক্রমশঃই অ-নমনীয় হইয়া উঠিতেছে। ইহার প্রধান কারণ হইল, মৌলিক অধিকার-গুলির রক্ষাকল্পে জনসাধারণ বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিতেছে ও সেইজন্য অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে এই ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করা হয়। শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তনশীল নয় বলিয়া শাসনকর্তৃপক্ষ সহসা ব্যক্তিস্বাধীনতা সংকুচিত করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এই অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতা, প্রাদেশিক সরকারগুলির ও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অব্যাহত রাখে।

শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের বিভিন্ন পদ্ধতি—Methods of Constitutional Amendment.

শাসনতন্ত্র লিখিত হউক আর অ-লিখিত হউক, নমনীয় হউক আর অ-নমনীয় হউক, জাতীয় অগ্রগতির জন্য ইহার পরিবর্তন অপরিহার্য। কিন্তু এই পরিবর্তনের পদ্ধতি সকল দেশে একপ্রকারের নয়।

নমনীয় শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনে কোনরূপ জটিলতা নাই। সাধারণ পদ্ধতিতে সাধারণ আইনের মত আইনসভাই ইহার পরিবর্তন করিতে পারে—যেরূপভাবে ইংলণ্ডে পরিবর্তিত হয়।

কিন্তু অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ, অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের জন্য সমগ্র ভোটদাতার সম্মতির প্রয়োজন হয়। সুইস্ দেশে ও অস্ট্রেলিয়ায় এই নিয়ম অনুসারে শাসনতন্ত্র পরিবর্তিত করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তনের জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলির সংখ্যাধিক্যের সম্মতি প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রস্তাব ¾ রাজ্য দ্বারা সমর্থিত হওয়া চাই। অস্ট্রেলিয়া ও সুইস্ দেশেও নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যাধিক্য ছাড়া প্রাদেশিক সরকারগুলির সংখ্যাধিক্যের সম্মতি প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, অনেক দেশে সাধারণ আইনসভা একটা নির্দিষ্ট বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে পারে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভার

উভয়কক্ষের ⅔ অংশ সভ্যের সম্মতিতে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সম্ভব হয়। ভারতের কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণ আইনসভা কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশোধন একটা খসড়া বিলের আকারে আইনসভায় পেশ করাইয়া সমগ্র সদস্যসংখ্যা ও উপস্থিত সদস্যসংখ্যার নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য দ্বারা প্রস্তাবিত সংশোধন অনুমোদন করাইতে হইবে। তারপর ভারতের রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাইলে ইহা কার্যকরী হইবে।

ভারতের শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি—Nature of the Indian Constitution.

ভারতের সংবিধানের প্রকৃতি জানিতে হইলে যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এই সংবিধান রচিত হয় তাহার সহিত একটু পরিচয় আবশ্যক। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের জন্ম হয়। এই সময় হইতে ভারতের একমাত্র রাজনৈতিক দল ভারতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতের জনগণের প্রতিনিধিগণ দ্বারা ভারতের জন্য একটি বিদেশী-প্রভাব-মুক্ত শাসনতন্ত্র রচনা করিবার জন্য প্রয়াস পান। পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেসে যোগদান করিবার ফলে এই স্বাধীনতা আন্দোলন অহিংস ও শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। কংগ্রেসের আদর্শ ছিল অখণ্ড ভারতে জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত এক পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা। কিন্তু মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে গঠিত মুসলিম লীগ ইহার দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের দাবি করিয়া কংগ্রেসের অখণ্ড ভারতের আদর্শে বাধা সৃষ্টি করিল। ১৯৩৯-১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ভারতের এই স্বাধীনতা আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে তীব্রতর হয়। অপর দিকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁহার আজাদ-হিন্দ বাহিনী লইয়া ভারতের পূর্বদ্বারে কঠিন আঘাত দিতে লাগিলেন। একদিকে ভারতের অভ্যন্তরে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতা আন্দোলন, অপরদিকে নেতাজীর ভারত আক্রমণ—এই উভয় বিপদে বিব্রত হইয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ক্লান্ত ও হীনবল ইংরাজ রাজশক্তি ভারতকে স্বাধীনতা দিতে রাজী হইল। কিন্তু এই স্বাধীনতা দান করিবার কালে ইংরেজ শাসকগণ মুসলমান সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মিঃ জিন্নার দাবির ভিত্তিতে ভারত বিভাগ করিয়া

পাকিস্তানের সৃষ্টি করিলেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের (Indian Independence Act, 1947) দ্বারা ভারতীয়গণের হস্তে বৃটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরিত করেন। স্বাধীনতা আইন পাস হওয়ার ফলে ভারত বিভক্ত হইয়া ভারত ও পাকিস্তান, এই দুইটি ডোমিনিয়নের সৃষ্টি হয় এবং এই দুইটি ডোমিনিয়নের গণপরিষদ (Constituent Assembly) স্বাধীনভাবে তাহাদের শাসনতন্ত্র রচনা করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। তদনুসারে ভারতীয় গণপরিষদ ভারতের জন্য নূতন সংবিধান রচনা করিয়া ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে ঐ সংবিধান গ্রহণ করে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী আনুষ্ঠানিকভাবে নূতন সংবিধান অনুযায়ী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

ভারতের সংবিধানের প্রকৃতি জানিতে হইলে আমাদের প্রথমতঃ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সংবিধান ভারতের সর্ব প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেস কর্তৃক রচিত হয়। ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সমস্ত রাজনৈতিক দল সে সময়ে ছিল, এই সংবিধান রচনায় তাহাদের কোন বক্তব্য ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, যে গণপরিষদ ভারতের সংবিধান রচনা করে বৃটিশ পার্লামেন্টের নির্দেশেই সেই গণপরিষদের জন্ম এবং বৃটিশ পার্লামেন্ট প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই এই গণপরিষদ শাসনতন্ত্র রচনা করে। তৃতীয়তঃ, যে গণপরিষদ কর্তৃক এই শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছে সেই গণপরিষদের সদস্যগণ ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা মাত্র চৌদ্দ জন ভোটদাতার ভোটে নির্বাচিত প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। চতুর্থতঃ, প্রাদেশিক আইনসভাগুলি কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যগণ ব্যতীতও এই গণপরিষদ বৃটিশ সরকার মনোনীত সদস্য ও দেশীয় রাজন্যবর্গ মনোনীত সদস্য লইয়া গঠিত হইয়াছিল। পঞ্চমতঃ, এই সংবিধান ভারতের জনগণের সম্মতি লাভের জন্য কখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জনগণের নিকট উপস্থিত করা হয় নাই বা জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত আইনসভার আনুষ্ঠানিক অনুমোদন লাভ করে নাই। উপরি-উক্ত কারণগুলির জন্য জনগণকে সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতার উৎস বলা কতদূর সমীচিন সে সম্পর্কে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক।

ষষ্ঠতঃ, ভারতীয় সংবিধান বোধহয় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সংবিধান। ২৫১ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই সংবিধানে ১৮ পৃষ্ঠা সূচীপত্রসহ ৩৯৫টি ধারা, ৯টি তপশীল ও ২২টি

অধ্যায় দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত আজ পর্যন্ত ৩৯টি সংশোধনী আইন ইহার কলেবর পুষ্ট করিয়াছে।

সপ্তমতঃ, ভারতের শাসনতন্ত্র যে শুধু বৃহত্তম তাহা নহে, জটিলতার দিক দিয়াও এই শাসনতন্ত্রের প্রতিযোগী বিরল। সাধারণ লোকের পক্ষে ইহার বিভিন্ন ধারা ও উপধারার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা একরূপ অসাধ্য ব্যাপার।

অষ্টমতঃ, নূতন শাসনতন্ত্রকে 'ভারতীয় সংবিধান' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইংরেজী ভাষায় রচিত হইলেও হিন্দী ও ভারতীয় অন্যান্য প্রধান ভাষাসমূহে ইহার অনুবাদ করা যাইতে পারে।

নবমতঃ, এই সংবিধানের যে জটিলতার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার দুইটি প্রধান কারণ দেখা যায়। প্রথম কারণ হইল যে, এই সংবিধান শুধুমাত্র কতকগুলি শাসনতান্ত্রিক আইনের সমষ্টিমাত্র নহে। শাসনতান্ত্রিক আইন ব্যতীত ও বহু বিবিধ বিষয় (Miscellaneous Provisions), যথা, অর্থনৈতিক, নির্বাচন-সংক্রান্ত, ভাষা-সম্পর্কিত এবং শাসন-ব্যবস্থা-বহির্ভূত নানা বিষয় এই শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে।

দ্বিতীয় কারণ হইল, এই শাসনতন্ত্র ভারতীয় শাসনতন্ত্র বলিয়া কথিত হইলেও ইহা প্রায় মৌলিকতা-বর্জিত। শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্রের ভারতে প্রযোজ্য অংশগুলি গ্রহণ করিয়া মূলতঃ এই সংবিধান রচনা করিয়াছেন। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা (Preamble) ও মৌলিক অধিকারগুলি (Fundamental Rights) মার্কিন-শাসনতন্ত্র হইতে গৃহীত এবং শাসনব্যবস্থার মূল নির্দেশাত্মক নীতিগুলির (Directive Principles of State Policy) উৎস হইল স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ড ও বর্মাদেশের শাসনতন্ত্র। গ্রেট বৃটেনের পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থার প্রভাব ভারতের শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ক্যানাডা যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শে গঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইনের দ্বারা শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ যে বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহা বর্তমান রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিবার ক্ষমতা, (Proclamation of Emergency), নিবর্তনমূলক আটক আইন (Preventive Detention) ও পরবর্তীকালে এই আইনের পরিবর্তে 'মিশা'

(Misa) নামক জরুরী আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

দশমতঃ, ভারতের সংবিধান ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় পার্লামেন্টারী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেও ইহার কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করে না।

পরিশেষে বলা যায় যে, এই সংবিধান সমগ্র ভারতে এক অখণ্ড ভারতীয় নাগরিকত্ব সৃষ্টি করিয়াছে এবং সমগ্র ভারতের জন্য একই বিচার-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

উপরে ভারতের সংবিধানের প্রকৃতি সম্পর্কে যে আলোচনা করা হইল তাহা হইল এই সংবিধানের বহিঃপ্রকৃতি। এই বহিঃপ্রকৃতি ব্যতীতও এই সংবিধানের একটি আদর্শগত প্রকৃতিও আছে যাহার আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন। সংবিধান প্রণেতাগণ ভারতে শুধুমাত্র সংসদীয় গণতন্ত্র (Parliamentary Democracy) প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। ভারত রাষ্ট্রে যাহাতে মানবাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তজ্জন্য সংবিধানে কতকগুলি আদর্শ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। এই আদর্শগুলি হইল :

১। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার।

২। চিন্তার, মতামত প্রকাশের, বিশ্বাসের, ধর্মের ও উপাসনার স্বাধীনতা।

৩। ব্যক্তিসত্তার স্বীকৃতি ও সুযোগের বিষয়ে সমতা লাভ।

৪। ব্যক্তির মর্যাদা ও রাষ্ট্রের সংহতি সুনিশ্চিত করিয়া সকলের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বর্ধিত করা।

ভারতের সংবিধান প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার দান করিয়া রাজনৈতিক ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সামাজিক ন্যায়বিচার কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে অস্পৃশ্যতা দূর করা হইয়াছে। অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে যুগপৎ নাগরিকগণের সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে এবং জনস্বার্থে ব্যক্তিগত সম্পত্তির জাতীয়করণও বৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করিয়া ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সরকার শিল্প-ব্যবসায়ের জাতীয়করণ, পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ, জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ, ক্রমবর্ধমান

হারে কর স্থাপন প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন। বিশাল ভারতের অসংখ্য অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা (Federal Government), আন্তঃরাজ্য পরিষদ (Inter-State Council), আঞ্চলিক পরিষদ (Zonal Councils), একটিমাত্র নির্বাচন কমিশন ও একটিমাত্র সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হইয়াছে।

সংবিধানের প্রস্তাবনায় আরও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারত একটি শান্তিকামী রাষ্ট্র। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে ভারত সর্বদা সচেষ্ট থাকিবে। আন্তর্জাতিক আইনকে উপযুক্ত মর্যাদা দান করিয়া আন্তর্জাতিক মৈত্রী সৃষ্টি করিবার নীতিও প্রস্তাবনায় স্থান পাইয়াছে। সাম্প্রতিককালে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী ও ইহার দ্রুত রূপায়ণের প্রচেষ্টা দেখিলে মনে হয় ভারত ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

ভারতের শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য—Salient features of the constitution.

১। প্রস্তাবনা সমন্বিত—Prefaced by a Preamble.

১। ভারতের শাসনতন্ত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল মার্কিন শাসনতন্ত্রের অনুসরণে একটি প্রস্তাবনার সংযোজনা। এই প্রস্তাবনার সাহায্যে শাসনতন্ত্র রচনার মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং সকল শ্রেণীর নাগরিকগণের জন্য সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃভাব সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে, ভারতে শাসনক্ষমতার একমাত্র উৎস হইল ভারতীয় জনগণ।

২। যুক্তরাষ্ট্রীয়—Federal.

২। ভারতের নূতন সংবিধান ভারতকে একটি যুক্তরাষ্ট্রের (Federal) ভিত্তিতে গঠিত করিয়াছে। অন্য নানাবিষয়ে বৃটিশ শাসনব্যবস্থার অনুরূপ হইলেও ভারতের শাসনব্যবস্থা মূলতঃ যুক্ত-রাষ্ট্রীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার যুক্তরাষ্ট্র এই উভয়ের গঠন-পদ্ধতির সমন্বয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে।

ক্যানাডার মতই বৃটিশ-ভারতের এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ-পদ্ধতি দ্বারা কতকগুলি স্বায়ত্তশাসনশীল রাজ্যে বিভক্ত করা হইয়াছে। অপরপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দেশীয় রাজ্যকে কেন্দ্রীকরণ-পদ্ধতির দ্বারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যে পরিণত করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা ক্যানাডার সহিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধিকতর সাদৃশ্য বিদ্যমান। ক্যানাডা ও ভারত উভয় যুক্তরাষ্ট্রে অনুল্লিখিত ক্ষমতা (Residuary Powers) কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিকতর শক্তিশালী করা হইয়াছে। উভয় যুক্তরাষ্ট্রেই শাসনক্ষমতাগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, যথা,—যুক্তরাষ্ট্রীয় (সর্বভারতীয়) তালিকা, রাজ্যতালিকা ও যুগ্ম-তালিকা। ক্যানাডায় মাত্র কৃষি ও দেশান্তরে বাস এই বিষয় দুইটি যুক্ত-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; অপরপক্ষে, ভারতে সাতচল্লিশটি বিষয় যুগ্ম-তালিকায়, সাতানব্বুইটি বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকায় ও ছেষট্টিটি বিষয় রাজ্য-তালিকায় স্থান পাইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, জরুরী অবস্থায় এই যুক্তরাষ্ট্রকে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তিত করা যায় এবং এই উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির হস্তে বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি এই বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগে রাজ্যসরকারগুলিকে বাতিল করিয়া শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন।

৩। লিখিত—Written.

ভারতের শাসনতন্ত্রের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই শাসনতন্ত্র বিস্তৃত-ভাবে লিখিত (Written)। শাসনকার্য পরিচালনা করিবার প্রধান নীতি ও নিয়মগুলি ব্যতীতও অন্যান্য বহু বিষয় এই শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ভারতীয় সংবিধানে বহু শাসন-ব্যবস্থা-বহির্ভূত বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে।

৪। সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়—Partly flexible and partly rigid.

বৃটিশ শাসনতন্ত্রের নমনীয়তা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের

কঠোরতার সমন্বয়সাধন করিয়া ভারতীয় শাসনতন্ত্র গঠিত হইয়াছে। (partly flexible and partly rigid)। আইনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতীয় শাসনতন্ত্র অনমনীয় শাসনতন্ত্রের পর্যায়ভুক্ত হয়; কেননা, সাধারণ আইনসভা সাধারণ আইন-প্রণয়নপদ্ধতিতে সর্বক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনসাধন করিতে পারে না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, ভারতের শাসনতন্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের ন্যায় চূড়ান্তরূপে অনমনীয় নহে। অনমনীয়তার মধ্যেও প্রকারভেদ আছে। ভারতে কোন শাসনতান্ত্রিক আইনের সংশোধন করিতে হইলে, ঐ সংশোধন প্রস্তাব একটি বিলের আকারে পার্লামেণ্ট সভার উভয় পরিষদের অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশের ভোটাধিক্যে গৃহীত হওয়া অপরিহার্য। কিন্তু এই দুই-তৃতীয়াংশ আবার পার্লামেন্টের উপস্থিত ও অনুপস্থিত সদস্যসংখ্যা মিলিয়া সমগ্র সদস্যসংখ্যার অর্ধেকের অধিক হওয়া চাই। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে, যথা,—রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার-গুলির মধ্যে আইনগত সম্পর্ক, শাসনতান্ত্রিক আইনের সংশোধনের বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি,—সংশোধন বিলগুলি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটাধিক্যে গৃহীত হওয়া চাই এবং তৎপরে পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত বিল রাজ্য আইনসভাগুলির অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। উভয় ক্ষেত্রেই আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়া আইনের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়।

৫। পার্লামেণ্ট-প্রধান—Parliamentary.

ভারতীয় সংবিধান ভারতে মন্ত্রিসংসদ-পরিচালিত শাসনব্যবস্থার (Parliamentary or Cabinet System) প্রবর্তন করিয়াছে। বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থার অনুকরণে ভারতে এই শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। এই শাসনব্যবস্থার বিশেষত্ব হইল যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী একজন শাসক-প্রধান থাকিলেও কার্যতঃ এই শাসনক্ষমতা একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রি-পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়। মন্ত্রিপরিষদের সহিত আইনসভার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গকে আইনসভার সদস্য হইতে হয় এবং তাঁহারা তাঁহাদের নির্ধারিত নীতি ও কার্যক্রমের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। ভারতের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিই হইলেন শাসকপ্রধান। তিনি প্রকৃত ক্ষমতার

অধিকারী। কিন্তু কার্যতঃ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদই শাসনক্ষমতা পরিচালনা করিয়া থাকেন।

৬। শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য—Supremacy of the Constitution.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতই ভারতেও শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য (Supremacy of the Constitution) পরিলক্ষিত হয়। শাসনতন্ত্র হইল সরকারের সমস্ত ক্ষমতার উৎস। শাসনতন্ত্রের এই প্রাধান্য ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক সংরক্ষিত হয়। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট ও অন্যান্য উচ্চ বিচারালয়-গুলির শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা থাকা ছাড়াও শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত মৌলিক নাগরিক অধিকারগুলি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে যাহাতে ব্যাহত না হয়, তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য সরকারী নির্দেশকে বে-আইনী ঘোষণা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। পরবর্তীকালে বিচারালয়গুলির এই ক্ষমতা সংকুচিত করা হইয়াছে।

৭। এক-নাগরিকত্ব—One-Citizenship.

ভারতের নূতন সংবিধানের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, শাসনতন্ত্র কর্তৃক ভারতীয়গণের এক-নাগরিকত্ব (One-Citizenship) স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতীয় নাগরিকত্ব ব্যতীত ভারতীয়গণের অন্য কোন প্রাদেশিক নাগরিকত্ব নাই। অনেক যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের অধিবাসিগণের দ্বিবিধ নাগরিকত্ব আছে, ফলে নাগরিকগণের আনুগত্য যুক্তরাষ্ট্র ও মূলরাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। ভারতীয় নাগরিকগণের শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়।

৮। মৌলিক অধিকার—Fundamental Rights.

গণতান্ত্রিক ভারতের শাসনতন্ত্রে স্বাভাবিকভাবেই নাগরিকগণের কতকগুলি মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, ধর্মাচরণের অধিকার, শাসনতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিকারের অধিকার প্রভৃতি হইল গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। কিন্তু এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই অধিকার-

গুলি অবাধভাবে ভোগ করা যায় না। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সরকার যে-কোন সময়ে—যথা, মিশা আইন সাহায্যে—নাগরিকগণের অধিকারভোগ স্থগিত রাখিতে পারেন।

৯। নির্দেশাত্মক নীতি—Directive Principles.

ভারতের সংবিধানে কতকগুলি নির্দেশাত্মক নীতির অন্তর্ভুক্তি এই সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কতিপয় অর্থনৈতিক আদর্শ, শাসন ও আইন-প্রণয়ন বিভাগের উদ্দেশ্যে কতিপয় নির্দেশ এবং কয়েকটি নাগরিক অধিকার লইয়া নির্দেশাত্মক নীতিগুলি গঠিত হইয়াছে। কর্মের অধিকার, বার্ধক্যে সরকারী সাহায্য পাইবার অধিকার, মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বর্জন, জাতীয় ঐতিহাসিক নিদর্শন রক্ষা করা, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা প্রভৃতি হইল কয়েকটি নীতি। কিন্তু উল্লেখযোগ্য হইল যে, মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হইলে আদালত সাহায্যে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু নির্দেশাত্মক নীতিগুলি অবহেলিত হইলে আদালত সাহায্যে এগুলি বলবৎ করা যায় না। সুতরাং নির্দেশাত্মক নীতিগুলি সরকারের সদিচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

১০। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র—Secular State.

দশমতঃ, নূতন সংবিধান অনুসারে ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Secular State)-রূপে গঠিত হইয়াছে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে এই রাষ্ট্রের নাগরিকগণ সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকারী। ভারতের সকল অধিবাসীই ভারতীয় নাগরিক ও ধর্মমতের পার্থক্য সত্ত্বেও সকলেই সমান পদমর্যাদার অধিকারী। ধর্মমতের পার্থক্যের জন্য রাষ্ট্র নাগরিকগণের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করে না।

১১। সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র—Sovereign Democratic Republic.

একাদশতঃ, ভারতের সংবিধান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (Sovereign Democratic Republic) আখ্যা দিয়াছে। ভারত কমনওয়েলথভুক্ত রাজ্যসমূহের সদস্য হইলেও বৃটিশ

রাজার আনুগত্য স্বীকার করে নাই। নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হইলেন ভারতের উচ্চতম শাসনকর্তৃপক্ষ। ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একমাত্র উৎস হইল ভারতীয় জনসাধারণ।

১২। দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তি—Merger of Native States.

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই শাসনতন্ত্র দ্বারা ভারতের পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলিকে গণসার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে ভারতের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

১৩। কেন্দ্র-প্রবণতা– Unitary Bias.

নূতন শাসনতন্ত্রের আর একটি অভিনবত্ব হইল যে, ভারতের শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচে গঠিত হইলেও কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে সর্বভারতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছে। সর্বভারতের জন্য একদফা নাগরিকত্ব, সকলের জন্য সমান অধিকার, সর্বভারতের জন্য একটিমাত্র সুপ্রীম কোর্ট ও একই দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন এবং একটি সর্বভারতীয় কৃত্যক সমগ্র দেশের ঐক্যের প্রতীক।

———

অষ্টম অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন রূপ

(Forms of Government)

অ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ—

প্রত্যেক রাষ্ট্র একই উপাদানে গঠিত বলিয়া রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু বিভিন্ন দেশে সরকারের প্রকারভেদ দেখা যায়। এই প্রকারভেদ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌ল্। তাঁহার রচনায় দুই প্রকারের শাসন-ব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায়; যথা—স্বাভাবিক ও বিকৃত (Normal and Perverted)। জনকল্যাণের জন্য যে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, সেই ব্যবস্থাকে তিনি স্বাভাবিক আখ্যা দেন, আর যেগুলি শুধু শাসকশ্রেণীর স্বার্থের জন্য পরিচালিত হয়, সেগুলিকে তিনি বিকৃত আখ্যা প্রদান করেন। তারপর রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগকারীদের সংখ্যানুসারে তিনি স্বাভাবিক ও বিকৃত এই দুইটি প্রধান শ্রেণীকে আরও কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেন।

অ্যারিস্টট্‌লের শ্রেণীবিভাগ নিম্নলিখিতভাবে বিভিন্ন আকার গ্রহণ করে :—

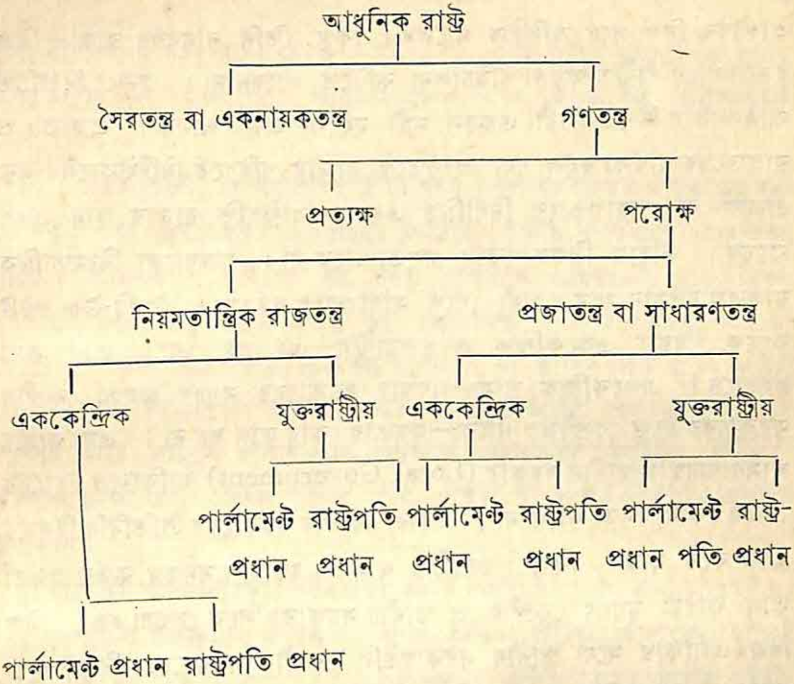
সার্বভৌমত্ব পরিচালনাকারীর সংখ্যা	স্বাভাবিক	বিকৃত
এক ব্যক্তি	রাজতন্ত্র	স্বৈরাচার
একাধিক ব্যক্তি (একটি সংসদ)	অভিজাততন্ত্র	ধনিকতন্ত্র
বহু ব্যক্তি (জনসাধারণ)	গণতন্ত্র	বিকৃত গণতন্ত্র

অ্যারিস্টট্‌লের এই শ্রেণীবিভাগের বিরুদ্ধে অনেক কঠোর সমালোচনা হইয়াছে। প্রথমতঃ, এই শ্রেণীবিভাগ কোন মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। শুধু ক্ষমতা পরিচালনাকারীর সংখ্যা অনুসারে এই শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এ যুগে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এক বা কতিপয় ব্যক্তি হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, অ্যারিস্টট্‌লের এই শ্রেণীবিভাগ স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। কারণ আধুনিককালের এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং পার্লামেন্ট-প্রধান ও রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসন-ব্যবস্থা অ্যারিস্টট্‌লের শ্রেণীবিভাগে স্থান পায় নাই। পরিশেষে বলা যায় যে, অ্যারিস্টট্‌লের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে যুক্তরাজ্য ও আফগানিস্তান রাজতন্ত্র বলিয়া একই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু কার্যতঃ একটি সংসদীয় গণতন্ত্র, অপরটি প্রায় অবাধ রাজতন্ত্র। সুতরাং বর্তমান যুগে অ্যারিস্টট্‌লের শ্রেণীবিভাগ অচল।

প্রকৃতপক্ষে অ্যারিস্টট্‌লের শ্রেণীবিভাগ নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিক লক্ষ্য রাখিয়া অ্যারিস্টট্‌ল এই শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। যে শ্রেণীর শাসন-ব্যবস্থা জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় সেগুলিকে তিনি স্বাভাবিক বলিয়াছিলেন, আর যেগুলি শাসকের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরিচালিত হয় সেগুলিকে তিনি বিকৃত আখ্যা দিয়াছিলেন। বার্কারের মতে অ্যারিস্টট্‌লের নৈতিক ভিত্তি বর্তমান যুগেও একেবারে অচল হইয়া যায় নাই। বর্তমান যুগে যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরিচিতির জন্য বিভিন্ন নামকরণ করা হয়, যথা—কল্যাণ রাষ্ট্র, যুদ্ধবাদী রাষ্ট্র, পুলিশ রাষ্ট্র, বাণিজ্যিক রাষ্ট্র, তখন পরোক্ষভাবে অ্যারিস্টট্‌লের নৈতিক মান প্রয়োগ করা হয়।

সরকারের আধুনিক রূপ—Modern Forms of Government.

মন্টেস্কু, ব্লুনস্লি, ম্যারিয়ট্ প্রভৃতি লেখকগণ নিজ নিজ অভিমত অনুযায়ী সরকারের বিভিন্ন রূপের বর্ণনা করিয়াছেন। বর্তমানে অধ্যাপক লিককের শ্রেণীবিভাগ সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ শ্রেণীবিভাগ বলিয়া পরিচিত। লিকক্ নিম্নলিখিতরূপে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন।



লিকক্ সরকারের যে বিভিন্ন রূপের বর্ণনা করিয়াছেন সেই রূপগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় আবশ্যক। লিকক্ তাঁহার শ্রেণীবিভাগে সরকারকে প্রথমতঃ দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন, যথা, স্বৈরতান্ত্রিক (Despotic) ও গণতান্ত্রিক (Democratic)। স্বৈরতন্ত্রে এক ব্যক্তির হস্তে সরকারের সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে এবং এই ক্ষমতা তিনি জনসাধারণ নিরপেক্ষভাবে নিজ ইচ্ছানুসারে পরিচালনা করেন। গণতন্ত্রে জনসাধারণই হইল ক্ষমতার প্রকৃত উৎস এবং জনসাধারণের ইচ্ছানুসারে তাহাদের নিকট দায়ী থাকিয়া সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে জনগণ রাষ্ট্রীয় কার্যে (আইন প্রণয়ন, কর স্থাপন) সরাসরি অংশ গ্রহণ করে। সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্যান্টনে এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। পরোক্ষ গণতন্ত্রে জনগণ ভোটদ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং এই নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনগণের নিকট দায়ী থাকিয়া সরকারী কার্য পরিচালনা করে। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে শাসন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হইলেন একজন বংশানুক্রমিক রাজা যিনি

আজীবন নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। কিন্তু তিনি নামসর্বস্ব রাজা—নিজ ইচ্ছানুসারে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারেন না। জনগণ নির্বাচিত আইনসভার নিকট দায়ী একদল মন্ত্রী হইলেন প্রকৃত শাসক। প্রজাতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের পার্থক্য হইল যে, প্রজাতন্ত্রে রাজার পরিবর্তে নির্দিষ্টকালের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত একজন রাষ্ট্রপতি রাজার স্থান গ্রহণ করেন। তাঁহার নিজস্ব কোন ক্ষমতা থাকে না। যুক্তরাজ্যে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বর্তমান আর ফরাসী দেশে সাধারণতন্ত্র বর্তমান। উপরি-উক্ত দুইটি রূপকে পুনরায় এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়—এই দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে—ক্ষমতার কোন ভাগ হয় না। এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার (Local Government) থাকিলেও ইহাদের নিজস্ব কোন ক্ষমতা থাকে না। ইহারা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে মাত্র। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র কর্তৃক ক্ষমতা ভাগ করিয়া যুগপৎ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারগুলিকে দেওয়া হয়। নিজ নিজ এলাকার মধ্যে স্থানীয় সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত থাকে। এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে আবার পার্লামেন্ট-প্রধান ও রাষ্ট্রপতি-প্রধান উপ-বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে। পার্লামেন্ট-প্রধান শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল যে এই ব্যবস্থায় শাসন কর্তৃপক্ষ ও আইনসভা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত থাকে—একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। আর রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনব্যবস্থায় শাসন কর্তৃপক্ষ ও আইনসভা পরস্পরের প্রভাবমুক্ত থাকিয়া কার্য পরিচালনা করিতে পারে। যুক্তরাজ্য ও মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র যথাক্রমে পার্লামেন্ট-প্রধান ও রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসন-ব্যবস্থার উদাহরণ। এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে।

এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা—Unitary and Federal Governments.

শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতাসমূহ যদি একটিমাত্র উচ্চতম কর্তৃপক্ষের হস্তে কেন্দ্রীভূত হয়, তাহা হইলে তাহাকে এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা বলা হয়। অপরপক্ষে সরকারের ক্ষমতাসমূহ যদি বিভক্ত হইয়া একাধিক কর্তৃপক্ষের

দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা বলা হয়। এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি দেখা যায়ঃ—

১। এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল সরকারের ক্ষমতাসমূহের কোনরূপ ভাগ করা হয় না। সমুদয় ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে। শাসনকার্যে সুবিধার জন্য সমগ্র দেশটিকে কতকগুলি প্রাদেশিক সরকারে ভাগ করা হয়। কিন্তু এই প্রাদেশিক বা স্থানীয় সরকারগুলির কেন্দ্রীয় সরকার-নিরপেক্ষ কোন স্বতন্ত্র অধিকার বা দায়িত্ব কিছু থাকে না। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে ইহারা কার্য পরিচালনা করে। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করিলে স্থানীয় সরকারগুলিকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং ১৯৩৫ সালের পূর্বে ভারত শাসন-ব্যবস্থা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের সমুদয় ক্ষমতা দুই ভাগে ভাগ করা হয়। সমগ্র দেশটিকে কতকগুলি প্রদেশ বা রাজ্যে বিভক্ত করিয়া তাহাদের হস্তে কতকগুলি নির্ধারিত বিষয়ের উপর স্বাধীন ক্ষমতা অর্পিত হয়। দেশের সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য বিষয়গুলি পরিচালনা করিবার ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে। অপর পক্ষে, স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়গুলি পরিচালনা করিবার ভার থাকে স্থানীয় বা আঞ্চলিক সরকারগুলির হস্তে। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সরকারগুলির স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিতে পারে। স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়গুলির শাসনব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণতঃ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে না। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় স্বাধীন ক্ষমতাবিশিষ্ট দুইটি সরকারের অস্তিত্ব বিদ্যমান। যুক্ত-রাষ্ট্রের স্থানীয় বা আঞ্চলিক সরকারগুলি এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার স্থানীয় সরকারগুলির মত কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছাধীন প্রতিনিধি মাত্র নয়। ইহাদের নিজস্ব কেন্দ্রীয় সরকার-নিরপেক্ষ ক্ষমতা থাকে।

২। এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই হইল সর্বেসর্বা—সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকারগুলির কোন নিজস্ব ক্ষমতা নাই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের কোন প্রাধান্য দেওয়া হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলি—উভয়েই শাসনতন্ত্র

কর্তৃক সৃষ্ট হয় এবং শাসনতন্ত্রই কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করিয়া দেয়। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

৩। এককেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত বা অলিখিত, নমনীয় বা অনমনীয় হইতে পারে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র সর্বদা লিখিত ও অনমনীয় হয়।

৪। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রই হইল উভয়বিধ সরকারের ক্ষমতার উৎস। সেইজন্য সকল যুক্তরাষ্ট্রেই শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য অটুট রাখিবার নিমিত্ত প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় উচ্চ বিচারালয় অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এই বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা শাসনতন্ত্র-সংক্রান্ত সর্ববিধ মতভেদের নিষ্পত্তি হয়। এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় এইরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন কোন উচ্চ বিচারালয়ের প্রয়োজন অনুভূত হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষত্ব—Marks or Characteristics of a Federal Government.

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা ইহাকে এককেন্দ্রীয় সরকার হইতে সহজে পৃথক করা যায়। ডাঃ ফাইনার যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করিয়াছেন :—

১। একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির সহ-অবস্থান—Co-existance of two Governments.

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় দেশের সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য বিষয়গুলির শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকার থাকে আর স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়গুলির শাসন-পরিচালনার জন্য কতকগুলি স্থানীয় সরকার থাকে। উভয় সরকারই শাসনতন্ত্র হইতে তাহাদের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় ও শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়গুলির উপর পরস্পরের প্রভাবমুক্ত হইয়া উহারা শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করে। কিন্তু এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলি সর্ববিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তত্বাধীন থাকে।

২। সরকারের ক্ষমতাসমূহের বিভাগ ও বণ্টন—Division and Distribution of Powers.

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের সমুদয় ক্ষমতা ভাগ করিয়া একটা নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে বন্টন করা হয়। সাধারণতঃ জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত হয়; আর স্থানীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির ভার দেওয়া হয় আঞ্চলিক সরকারগুলির উপর। উভয় সরকারই তাহাদের নির্ধারিত এলাকায় পরস্পরের প্রভাব-মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে।

৩। লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য—Supremacy of the Constitution which is Written and Rigid.

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা বিভক্ত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়। এই বন্টনকার্য শাসনতন্ত্র দ্বারা সম্পাদিত হয়। সুতরাং উভয় সরকারের ক্ষমতার উৎস বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। ভবিষ্যতে ক্ষমতার ভাগ লইয়া যাহাতে উভয় সরকারের মধ্যে কোনরূপ মতভেদ বা কলহ সৃষ্টি না হয়, সেজন্য ক্ষমতার বিভাগ সুস্পষ্টভাবে শাসনতন্ত্রে লিখিত থাকে। অলিখিত শাসনতন্ত্র অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট ও পরিবর্তনশীল বলিয়া অনেক সময় শাসনব্যাপারে নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলি নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে তাহাদের কার্যকলাপ পরিচালিত করিতে পারে, একের ক্ষমতা যাহাতে অন্যের দ্বারা ব্যাহত না হয়, সেজন্য শাসনতন্ত্র সুস্পষ্টভাবে উভয় সরকারের ক্ষমতার সীমারেখা স্থির করিয়া দেয়। সেইজন্য যুক্তরাষ্ট্রে লিখিত শাসনতন্ত্র অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র শুধু লিখিত হইলেই হয় না, এই শাসনতন্ত্র অনমনীয় হওয়াও একান্ত আবশ্যক। সহজ-পরিবর্তনীয় হইলে উভয় সরকার বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার তাহার শ্রেষ্ঠতর ক্ষমতার বলে নিজ ইচ্ছা ও সুবিধা অনুসারে যে-কোন সময়ে নির্ধারিত ক্ষমতাবন্টনের পরিবর্তন করিতে পারে।

যদি শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন একান্তই প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি ভিন্ন একটি সরকারের ইচ্ছা অনুসারে ইহার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়।

৪। নিরপেক্ষ ও স্বাধীন উচ্চ বিচারালয়ের অবস্থিতি—Existence of an independent and impartial Supreme Court.

শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য হইল যুক্তরাষ্ট্রের একটা প্রধান বিশেষত্ব। শাসনতন্ত্রের এই প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য সকল যুক্তরাষ্ট্রেরই একটি উচ্চ বিচারালয় অপরিহার্য। কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির শাসনতন্ত্র নির্ধারিত পারস্পরিক সম্পর্ক যাহাতে কোনক্রমে ব্যাহত না হয়, সেজন্য উচ্চ আদালত শাসনতান্ত্রিক আইনসমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য রক্ষা করে। অপরপক্ষে, শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগ শাসনতন্ত্রবিরোধী কার্যকলাপ দ্বারা যাহাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে না পারে, সেজন্য উচ্চ আদালত শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগের নির্দেশগুলিকে অনেক সময় বে-আইনী বলিয়া বাতিল করিতে পারে। এক কথায় উচ্চ আদালতকে শাসনতন্ত্রের রক্ষক বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

৫। দ্বিনাগরিকত্ব—Double citizenship.

যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক উভয় সরকারেরই আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকগণের দ্বিবিধ আইন মান্য করিতে হয়। যে যে বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকে, সেই সেই বিষয়গুলির জন্য প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের কেন্দ্রীয় সরকারের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করিতে হয় ও স্থানীয় ব্যাপারগুলির জন্য নাগরিকগণ যে প্রদেশের অধিবাসী, সেই প্রাদেশিক সরকারের আইন মানিতে বাধ্য থাকে। শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী ভারতের অধিবাসীদের শুধু একনাগরিকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতের নাগরিকত্ব ব্যতীত তাহাদের স্বতন্ত্র কোন প্রাদেশিক নাগরিকত্ব নাই।

৬। রাজস্বের বণ্টন-ব্যবস্থা—Separate allocation of revenues.

যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক সরকারগুলি সাধারণতঃ স্থানীয় ব্যাপারে কেন্দ্রীয়

সরকার-নিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে অর্থাৎ স্থানীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে তাহারা স্বায়ত্তশাসনশীল সরকার বলিয়া পরিগণিত হয়। সেইজন্য ক্ষমতাবন্টনের সঙ্গে রাজস্বও বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। আঞ্চলিক সরকারগুলি তাহাদের নির্ধারিত রাজস্ব দ্বারা নিজেদের শাসনকার্যের ব্যয় নির্বাহ করে।

৭। আনুগত্য ও ব্যবচ্ছেদ—**Allegiance and Secession.**

আঞ্চলিক সরকারসমূহের সম্মিলিত ইচ্ছা ও সহযোগিতার ভিত্তির উপর যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। যুক্তরাষ্ট্র একটি মাত্র সার্বভৌম ক্ষমতাবিশিষ্ট রাষ্ট্র বলিয়া বিবেচিত হয়। আঞ্চলিক সরকারগুলির নিজ নিজ সীমার মধ্যে স্বাধীনভাবে কার্য করিবার অধিকার থাকিলেও তাহারা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃত হয় না। সুতরাং প্রত্যেক আঞ্চলিক সরকারকেই মূল রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। আঞ্চলিক সরকারগুলি যে সার্বভৌম রাষ্ট্রের শুধু আনুগত্য স্বীকার করে তাহা নয়, কোন আঞ্চলিক সরকারই যুক্তরাষ্ট্র হইতে সম্পর্ক ছেদ করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। কোন আঞ্চলিক সরকারের এই দাবী স্বীকৃত হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকার বলপ্রয়োগে আঞ্চলিক সরকারের এই প্রচেষ্টা দমন করিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও সুইজারল্যাণ্ডে আঞ্চলিক সরকারের এইরূপ বিচ্ছিন্ন হইবার প্রচেষ্টা বল-প্রয়োগে দমন করা হয়। একমাত্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে আঞ্চলিক সরকারগুলির বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখিতে হইবে।

১। অবিমিশ্র ঐক্য হইল এককেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একাধিক রাষ্ট্র মিলিত হইয়া যে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠন করে সেই নবগঠিত রাষ্ট্রে অবিমিশ্র ঐক্য বা সমরূপতা থাকে না। এককেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সর্বত্র একই আইন ও একই শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কতিপয় বিষয়ে সমরূপতা থাকিলেও অনেক বিষয়ে আঙ্গিক রাজ্যগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

২। যে সমস্ত রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে, যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইলেই সেই সমুদয় আঙ্গিক রাষ্ট্রের স্বাধীন সত্তা লোপ পাইয়া তাহারা নবগঠিত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিগণিত হয়।

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দুই জাতীয় শাসন-ব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখা যায়। একদিকে কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকার, অপরদিকে রাজ্য সরকারগুলি নির্ধারিত ক্ষেত্রে স্ব স্ব শাসনকার্য পরিচালনা করে।

৪। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সাধারণ ব্যাপারগুলির শাসনভার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত থাকে, আর স্থানীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলির শাসন রাজ্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়।

৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রাকৃতিক বিবর্তনে আপনা হইতে গড়িয়া উঠে না, প্রয়োজনমত মানুষ ইহা সৃষ্টি করে। সুতরাং ইহার গঠনতন্ত্র লিখিত থাকে।

৬। যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র কর্তৃক উভয় সরকারের ক্ষমতাই ভাগ করিয়া দেওয়া হয় এবং শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়। কোন সরকারই নির্ধারিত পদ্ধতির সাহায্যে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন ব্যতীত নিজ ইচ্ছানুযায়ী অন্যের ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

৭। শাসনতন্ত্রের সংশোধনপদ্ধতি শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ করা থাকে। এই কারণে যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার ক্ষমতার অধিকারী কর্তৃপক্ষ সার্বভৌম ক্ষমতার আধার বলিয়া পরিগণিত হয়।

৮। যুক্তরাষ্ট্র হইল আঙ্গিক রাজ্যগুলির একটি স্থায়ী সমবায়। সন্ধি-সমবায় বা সন্ধিবন্ধন রাষ্ট্রগুলির মত অস্থায়ী নহে।

যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপ্রণালী—Formation of Federation.

দুইটি ভিন্ন পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। অনেক সময়ে কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্র শাসনকার্যের সুবিধার জন্য অথবা বৈদেশিক আক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার নিমিত্ত সর্বসম্মতিক্রমে একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে। নবগঠিত কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে তাহারা সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা অর্পণ

করিয়া অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি (Residuary Powers) আঞ্চলিক সরকারগুলির কর্তৃত্বাধীনে রাখে। এইরূপে বহু রাষ্ট্রের স্থলে একটি মাত্র জাতি-সমন্বিত একটি যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এই পদ্ধতিকে কেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি (Process of Centralisation) বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই পদ্ধতিতে গঠিত হইয়াছে। আদি তেরটি উপনিবেশ কতকগুলি বিষয়ে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ কয়িয়া একটি যুক্তরাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে কতকগুলি আঞ্চলিক শাসন-ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করিয়া সরকারের সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও নবগঠিত আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে। এই জাতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতা সাধারণতঃ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়; অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে থাকে। এই পদ্ধতিকে বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি (Process of Decentralisation) বলা হয়। ক্যানাডার যুক্তরাষ্ট্র এইভাবে গঠিত হয়। ক্যানাডায় একটি এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। এই এককেন্দ্রীয় সরকারকে নয়টি পৃথক্ প্রাদেশিক সরকারে ভাগ করিয়া কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ের শাসন-পরিচালনা করিবার ভার তাহাদের হস্তে ন্যস্ত হয়। অবশিষ্ট সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী করা হয় কেন্দ্রীয় সরকারকে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রগুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যে সমস্ত যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে গঠিত হইয়াছে সেখানে বিকেন্দ্রীভাবের প্রাবল্য দেখা যায় এবং এইজন্য সেখানকার কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাগুলির নির্দিষ্ট গণ্ডি স্থির করিয়া আঞ্চলিক সরকারগুলির প্রাধান্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করা হয়। আবার ক্যানাডা যুর্ক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতিতে গঠিত যুক্তরাষ্ট্রগুলি কেন্দ্রীভাবের প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়। এই জাতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য বজায় রাখা হয়। ভারত প্রভৃতি কয়েকটি যুক্তরাষ্ট্র এই উভয় পদ্ধতির সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থার সাফল্যের উপায়—Conditions essential to the success of a Federal Union.

যে পদ্ধতিতেই গঠিত হউক না কেন, যুক্তরাষ্ট্র-ব্যস্থায় দুইটি বিপরীতমুখী ভাবের সমন্বয় দেখা যায়। একটি হইল কেন্দ্রীভাব (Centripetal tendency), অপরটি হইল বিকেন্দ্রীভাব (Centrifugal tendency)। একটিতে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলিকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া একটি সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত করে, অপরটিতে তাহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জীবিত রাখিতে চেষ্টা করে। পরস্পর-বিরোধী এই দুইটি শক্তির প্রকৃত সমন্বয় সাধন করিতে পারিলে যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও সাফল্যের জন্য কতকগুলি বাহ্যিক পরিবেশ ও আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে ভৌগোলিক ঐক্য (Geographical contiguity) থাকা একান্ত আবশ্যক। ভৌগোলিক নৈকট্যের অবর্তমানে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশগুলি দূরত্বের দ্বারা যদি বিচ্ছিন্ন হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কোন ভাবের আদান-প্রদান হইতে পারে না। ফলে জাতীয়তাবোধ বাধাপ্রাপ্ত হয়। অংশগুলি বিচ্ছিন্ন থাকিলে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজধানী-নির্বাচন-ব্যাপারেও যথেষ্ট অসুবিধা হয়। এক অঞ্চলের লোক দূরত্বের জন্য অপর অঞ্চলে গিয়া, জাতীয় ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। পূর্বতন পাকিস্তান রাষ্ট্রে এই অসুবিধা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই রাষ্ট্রের পূর্ব-অঞ্চল রাজধানী-সমন্বিত পশ্চিম পাকিস্তান হইতে সহস্র মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। এইজন্য ভৌগোলিক নৈকট্যের অভাবে শাসনব্যবস্থার নানাবিধ জটিল সমস্যা দেখা গিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য নির্ভর করে ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উপর। বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসিগণ ভাষা, ধর্ম বা সাংস্কৃতিক ঐক্য সত্ত্বেও জাতীয়তাবোধ দ্বারা যদি অনুপ্রাণিত না হয়, তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়।

তৃতীয়তঃ, এই জাতীয়তাবোধ নির্ভর করে কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত বা ভাবগত ঐক্যের উপর। সুতরাং উপরি-উক্ত ঐক্যগুলি বিশেষ করিয়া ভাবগত ঐক্য যুক্তরাষ্ট্রগঠনে একটি অপরিহার্য উপাদান বলিয়া পরিগণিত হয়।

চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়িত্বের জন্য বিভিন্ন অঞ্চল বা প্রদেশগুলির মধ্যে আয়তনের, সম্পদের ও বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক অধিকারের সমতা থাকা একান্ত অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। আয়তন ও সম্পদের সমতা সব সময়ে কার্যকরী করা সম্ভব হয় না, কিন্তু প্রদেশগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সমতা (Political equality) বা অন্ততঃপক্ষে আনুপাতিক সমতা রক্ষা করা অত্যন্ত আবশ্যক। প্রদেশগুলি আয়তনে ও লোকসংখ্যায়, ক্ষুদ্র হউক, আর বৃহৎ হউক, জাতীয় ব্যাপারে তাহাদের সমান অধিকার থাকা চাই। এই সমতার অভাব হইলে একাধিক বৃহৎ প্রদেশ সম্মিলিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশগুলির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মান যুক্তরাষ্ট্রে এই রাজনৈতিক সমতার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রদেশ প্রুসিয়া ভোটাধিক্যের বলে সমগ্র জার্মান দেশের স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। সমতার অভাবেই জার্মান যুক্তরাষ্ট্র স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ক্যানাডায় প্রত্যেকটি আঞ্চলিক সরকারকে জাতীয় রাজনৈতিক ব্যাপারে সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়তন, সম্পদ বা জনসংখ্যা নির্বিচারে প্রত্যেকটি প্রদেশ জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের উচ্চপরিষদ্ সিনেট সভায় দুইজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে। ক্যানাডার সিনেট সভা প্রত্যেক প্রদেশ হইতে ছয়জন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। কোন প্রাদেশিক সরকারকেই সংখ্যাধিক্যের বলে অন্যান্য অংশ অপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী করা যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের প্রধান অন্তরায়।

পঞ্চমতঃ, একটি উচ্চতর আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এই আদর্শ হইল ঐক্যবদ্ধ জাতিগঠন। জাতীয়তাবোধ ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবোধের সমন্বয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী মনোভাবের মধ্যে যাহাতে সংঘর্ষ না হয়, সেজন্য জনগণের মধ্যে উপযুক্ত রাজনৈতিক শিক্ষা ও সহনশীলতা থাকা চাই। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা জটিল ও নানা সমস্যাপূর্ণ। নাগরিকগণেরও যুগপৎ কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য যে অনেক পরিমাণে নাগরিকদের শিক্ষা, কর্মদক্ষতা ও রাজনৈতিক চেতনার উপর নির্ভর করে, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের উপাদানগুলি কি ভারতে বর্তমান—Are those conditions present in India ?

এই সম্পর্কে স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের উপাদানগুলি কি বর্তমান আছে ? ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের রাজ্য পুনর্গঠন আইনের ভিত্তিতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সম-পর্যায়ভুক্ত ১৪টি রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লইয়া গঠিত হইয়াছিল। বর্তমানে সিকিমসহ রাজ্য-সংখ্যা হইল ২২টি, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হইল ৯টি। যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার সাফল্যের অন্যতম প্রধান উপাদান হইল যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যগুলির ভৌগোলিক ঐক্য। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং আমিনদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ ব্যতীত অন্যান্য প্রধান অংশগুলির মধ্যে এই ভৌগোলিক ঐক্য বিদ্যমান আছে এবং প্রত্যেকটি অংশের সহিত অপরাপর অংশের ঘনিষ্ঠ যোগ-সূত্রের ফলে ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক সংস্পর্শ ও আদান-প্রদান সম্ভব করিয়া জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করিয়াছে। অধিকন্তু এই ভৌগোলিক ঐক্যের জন্য ভারত তাহার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের দ্বিতীয় উপাদান হইল অধিবাসিগণের মধ্যে জাতি-গত, ভাষাগত, ধর্মগত, অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিগত ঐক্যের অবস্থিতি। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসিগণের মধ্যে এরূপ কোন ঐক্য নাই। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও বিভিন্ন ভাষা-ভাষী বহু জাতি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাস করে। এই ভাষাগত ও ধর্মগত বিভেদ অনেক সময় যে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। অপরপক্ষে এই বিভিন্ন জাতিগুলি এরূপ মিশ্রভাবে পরস্পরের সহিত একই ভৌগোলিক পরিবেশে বাস করে যে, এই বিভিন্ন জাতিগুলিকে একত্র সমাবেশ করিয়া ধর্মভিত্তিক বা ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন করাও সম্ভব নহে।

কিন্তু এই বিভেদ থাকা সত্ত্বেও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই বিভিন্ন জাতিগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া একই ভৌগোলিক পরিবেশে পরস্পরের সন্নিকটে বাস করিবার ফলে তাহাদের জীবনযাত্রা প্রণালী, চিন্তাধারা এবং অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিগত জীবন একই ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-

নির্বিশেষে এক নাগরিকত্ব প্রবর্তন করিয়া এবং ভারতের সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া এই অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টিতে সাহায্য করিয়াছে। জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মগত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, সুইস্ যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে যদি এক জাতীয়তা-বোধ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতের ক্ষেত্রে এক জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি না পাইবার কোন সংগত কারণ নাই।

ভারতের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় জাতীয়তাবোধ যে নাই, ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। বৃটিশ শাসকগণ কর্তৃক অনুসৃত দুষ্ট বিভেদমূলক শাসন-নীতির (Divide and rule) ফলে এই জাতীয়তাবোধ এখনও পর্যন্ত দুর্বল, কিন্তু এই জাতীয়তাবোধ ক্রমশই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। ভারতের বিভিন্ন অংশগুলি বুঝিতে পারিয়াছে যে, একতাই তাহাদের প্রধান বল এবং বিভেদই হইল তাহাদের ধ্বংসের কারণ। একতাবৃদ্ধির জন্য বর্তমান ভারত সরকার বিভিন্ন রাজ্যের পারস্পরিক মতভেদ ও বিবাদ মীমাংসার জন্য আঞ্চলিক পরামর্শ সভা গঠন করিয়াছেন ও প্রায়শই রাজ্যগুলির শাসনকর্তাদের সম্মিলিত বৈঠকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব দূর হইয়া সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টিতে সাহায্য করিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এমন কি সুদূর আন্দামান দ্বীপে পূর্ব-পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা এই সহযোগিতামূলক মনোভাবের পরিচায়ক। পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা আজ সর্বভারতীয় সমস্যা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। সুতরাং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যে যুক্তরাষ্ট্রসুলভ জাতীয় ঐক্য নাই একথা বলা আদৌ সমীচীন নহে।

যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়িত্বের জন্য বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে আয়তনের, সম্পদের ও বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক সমতা বা অন্ততঃপক্ষে আনুপাতিক সমতা থাকা একান্ত আবশ্যক। ভারতের ক্ষেত্রে এই সমতার একান্ত অভাব দেখা যায়। মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যগুলি আয়তনে, লোকসংখ্যায় ও সম্পদে অন্যান্য রাজ্যগুলি হইতে শুধু বৃহত্তর নয়, রাজনৈতিক দিক দিয়া দেখিতে গেলেও ভারতের পার্লামেন্ট সভায় এই রাজ্যগুলির

প্রতিনিধি সংখ্যা অনেক বেশী। সুতরাং এই রাজ্যগুলি ইচ্ছা করিলে সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির অভিমতকে অগ্রাহ্য করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি মূলনীতি হইল আঙ্গিক রাজ্যগুলির সমানাধিকার এবং এই সমানাধিকার নীতি স্বীকৃত না হইলে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য অসম্ভব। ভারতের ২২টি আঙ্গিক রাজ্য সম-ক্ষমতাপন্ন হইলেও মার্কিন বা ক্যানাডার যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যগুলির ন্যায় ইহাদের সমান প্রতিনিধিত্বের দাবী স্বীকৃত হয় নাই। প্রতিনিধিত্বের দিক দিয়া শুধুমাত্র আনুপাতিক সমতা রক্ষিত হইয়াছে।

পরিশেষে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য নাগরিকগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা, দায়িত্ববোধ ও কর্মপটুতা একান্ত আবশ্যক। ইহা ছাড়া, যেহেতু আঙ্গিক রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্রের সম-অংশীদার সেই হেতু প্রত্যেকেরই সমান কর্মদক্ষতার অধিকারী হওয়া চাই। যুক্তরাষ্ট্র একটা জটিল শাসন-ব্যবস্থা। নাগরিকগণ যদি জটিল শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনাকার্যে অনভিজ্ঞ হন তাহা হইলে এই শাসন-ব্যবস্থা সাফল্যলাভ করিতে পারে না। ভারতে স্বাধীনতা লাভের পর কিছুদিন পর্যন্ত অভিজ্ঞ ও কর্মদক্ষ শাসকের অভাবে শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রে বিদেশীয়গণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে এই অসুবিধা অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। দেশরক্ষা বিভাগে স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী আজ প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়গণ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। শাসন, চিকিৎসা, শিক্ষা, কৃষি, বন প্রভৃতি বিভাগগুলিও সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়গণই পরিচালনা করিতেছেন। শুধু মূলধনের মালিক ও যন্ত্র-বিশেষজ্ঞরূপেই বর্তমানে বিদেশীয়গণের সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং এদিক দিয়া দেখিতে গেলেও বলা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও কর্মপটুতা ইতিমধ্যেই শিশুরাষ্ট্র ভারত তাহার আয়ত্তাধীন করিয়াছে। সুতরাং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য সুনিশ্চিত।

যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ক্ষমতাবণ্টনের নীতি ও পদ্ধতি—Principle and Method of Distribution of Powers in a Federal Union.

নীতি

যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সমগ্র শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। এই ক্ষমতাবন্টনের মূলনীতি হইল যে, জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি এবং যে-সকল বিষয় সম্পর্কে একই রকমের আইন-কানুন ও শাসনব্যবস্থা প্রয়োজন, সেই সকল বিষয়ের ভার সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে। অপরপক্ষে, শুধু স্থানীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি অর্থাৎ যে সকল বিষয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন আইন-কানুন ও পরিচালনা-ব্যবস্থা দরকার সেই সব বিষয়ের ভার আঞ্চলিক সরকারগুলির উপর দেওয়া হয়। এই নীতি অনুসারে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, বৈদেশিক সম্পর্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য, মুদ্রানীতি, ডাক ও তার বিভাগ, যুদ্ধ ও শান্তি প্রভৃতি বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে দেওয়া হয় এবং শিক্ষা, সমবায়, কৃষি, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রাদেশিক সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে।

এই রীতি অনুযায়ী সকল যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বন্টন করা হইলেও কোন্ বিষয়টি জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট আর কোন্ বিষয়টি স্থানীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট এ-সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। বিবাহ-বিচ্ছেদ, দেউলিয়া ও শ্রমিকসংঘ-সংক্রান্ত বিষয়গুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর ন্যস্ত আছে, কিন্তু ক্যানাডায় এই বিষয়গুলির ভার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দেওয়া হইয়াছে। ফলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের সৃষ্টি হইয়া আন্তঃপ্রাদেশিক সম্পর্ক তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

অস্ট্রেলিয়া, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি কয়েকটি দেশে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে কয়েকটি বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রাদেশিক সরকারগুলি তাহাদের নিজস্ব প্রতিনিধি দ্বারা পৃথকভাবে প্রাদেশিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট অনেক ব্যাপারে গ্রেট বৃটেনের সহিত বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে; সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ইউক্রেন, বাইলো-রাশিয়া প্রভৃতি কয়েকটি প্রাদেশিক সরকারকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে তাহাদের কার্যকলাপ পরিচালনা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানেও ইহাদের পৃথক প্রতিনিধি আছে।

পদ্ধতি

উপরি-উক্ত ক্ষমতাবন্টনের নীতি বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে কার্যকরী করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাবন্টনে সাধারণতঃ দুইটি নীতি অনুসৃত হয়।

প্রথমতঃ যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার কোন্ কোন্ বিষয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করিবে, শাসনতন্ত্রে বিশদভাবে তাহার উল্লেখ থাকে। প্রাদেশিক সরকার-গুলিকে অবশিষ্ট অনুল্লিখিত ক্ষমতাগুলির অধিকারী করা হয়। এই প্রণালীতে ক্ষমতার বন্টন কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা সূচিত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাবন্টনের এই প্রণালী কার্যকরী করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, ক্যানাডায় অন্য প্রণালীতে ক্ষমতার বন্টন হইয়াছে। এই প্রণালী অনুযায়ী স্থানীয় সরকারগুলিকে কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী করিয়া অবশিষ্ট অনুল্লিখিত বিষয়গুলির কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। ফলে, এই জাতীয় যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার অধিকতর শক্তিশালী হয়।

অধুনা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাবন্টনে এক তৃতীয় প্রণালী অনুসৃত হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতা শাসনতন্ত্রে সুনির্দিষ্টভাবে লিখিত থাকে। ইহা ছাড়া, শাসনতন্ত্রে কতকগুলি যুগ্ম বিষয়ের (Concurrent List) উল্লেখ থাকে, যে বিষয়গুলির উপর উভয় সরকার একই সঙ্গে আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। কিন্তু উভয় সরকারের প্রণীত আইন পরস্পর-বিরোধী হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থা বলবৎ হইয়া প্রাদেশিক সরকারের ব্যবস্থা বাতিল হয়। ক্যানাডার কৃষি ও দেশান্তরে বাসের নিয়ম (Immigration) যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত এবং ভারতে ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্যবিধি, শ্রমিকসংঘ, বিদ্যুৎ, ছাপাখানা, সংবাদপত্র প্রভৃতি সাতচল্লিশটি বিষয় যুগ্ম তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব—Federal Control over Local Governments.

যুক্তরাষ্ট্র প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অল্পবিস্তর পরিমাণে কেন্দ্রীয়

সরকারের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয়। সকল যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর আধিপত্য সমান হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রাদেশিক সরকারগুলিতে প্রজাতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা বলবৎ করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে দেওয়া হইয়াছে। অন্তর্বিপ্লব বা প্রাদেশিক বিদ্রোহ নিরোধ করিবার ক্ষমতাও কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। ক্যানাডা ও ভারতে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ কেন্দ্রীয় শাসক-প্রধান কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। উভয় দেশে অনেক ক্ষেত্রে প্রাদেশিক আইনগুলি কেন্দ্রীয় শাসকপ্রধানের সম্মতিসাপেক্ষ। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক সরকার কর্তৃক রচিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও রাজস্ব-সংক্রান্ত বিধিগুলি কেন্দ্রীর সরকারের সম্মতিসাপেক্ষ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশে আইন বলবৎ ও রাজস্ব আদায় করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের উপর নির্ভর না করিয়া স্বতন্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, আবার জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশে উপরি-উক্ত বিষয়গুলির জন্য অনেক সময় প্রাদেশিক সরকারগুলির সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক প্রবণতা—Modern Tendencies in Federations.

যুক্তরাষ্ট্র বলিতে দেশের সাধারণ সম্পর্কিত কাজের জন্য কেন্দ্রে অবস্থিত একটি জাতীয় সরকার ও স্থানীয় শাসন-সম্পর্কিত কাজের জন্য কিছু সংখ্যক স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকারের এক সঙ্গে অবস্থিতি বুঝায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র কর্তৃক উভয় সরকারের কার্যক্ষেত্র সুনির্ধারিত থাকিলেও বর্তমানে মার্কিনী, ক্যানাডীয় বা মিশ্র—সকল যুক্তরাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থায়ই একদিকে যেরূপ কেন্দ্রে অবস্থিত জাতীয় সরকারের ক্ষমতার প্রাবল্য দেখা যায় অপর দিকে তদ্রূপ স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকারগুলির গুরুত্ব হ্রাস পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্রে অবস্থিত জাতীয় সরকারগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ ইহা নহে যে, তাহারা প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতা হরণ করিয়া অধিকতর শক্তিশালী অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীতও নূতন ক্ষমতা পাইয়া শক্তিশালী হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই দ্রুত ক্ষমতা বৃদ্ধি

হওয়ায় অনেকে মনে করেন যে, কালক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের এইরূপ ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পর্যবসিত হইবে।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের এই পরিণতি ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত হয় না। প্রায় কোন যুক্তরাষ্ট্রই এ পর্যন্ত এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পরিণত হয় নাই। জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হইল যে, এই সরকারগুলি ইহাদের শাসনতন্ত্র-প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি বিশেষভাবে সম্প্রসারণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি কয়েকটি যুক্তরাষ্ট্র কিছু নূতন ক্ষমতা পাইয়াও অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় জাতীয় সরকারের ক্ষমতাবৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে অধ্যাপক হওয়ার (Prof. Wheare) চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যুদ্ধ (War), অর্থনৈতিক সংকট (economic depression), রাষ্ট্রের সমাজসেবামূলক কার্যের প্রসার (Growth of social services) এবং শিল্প ও পরিবহন জগতে অভূতপূর্ব পরিবর্তন (Mechanical revolution in transport and industry)।

বর্তমান যুদ্ধ হইল সর্বাত্মক যুদ্ধ। এই জাতীয় যুদ্ধ পরিচালনার জন্য দেশের যাবতীয় শক্তি ও সম্পদ এক-নিয়ন্ত্রণাধীন করা একান্ত আবশ্যক এবং জাতীয় সরকারই হইল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাহা সাফল্যের সহিত এই কার্য করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক যুদ্ধগুলি এত ব্যয়সাধ্য যে, একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই এই বিপুল ব্যয়ভার বহন করিতে সক্ষম। উপরি-উক্ত কারণে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আধুনিক যুগে প্রায় কোন দেশই অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাবমুক্ত নহে। অর্থনৈতিক সংকটকালে একমাত্র কেন্দ্রে অবস্থিত জাতীয় সরকারই জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত আর্থিক ও রাজস্ব সম্পর্কিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া সংকটমুক্ত হইতে পারেন। এ কারণে জাতীয় সরকারের প্রাধান্য ও ক্ষমতাবৃদ্ধি স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে।

সমাজসেবামূলক কার্য বলিতে সাধারণতঃ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত কার্যগুলিকে বুঝায়। প্রায় প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রে এই কার্যগুলি স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর ন্যস্ত থাকে। কিন্তু এই সমাজসেবামূলক

কার্যগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে হইলে প্রাদেশিক সরকারগুলির জাতীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য ও উপদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। মার্কিন, সোভিয়েত, ভারত প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রে সমাজসেবামূলক কার্যের জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলি জাতীয় সরকারগুলির নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য পায়। এই ব্যবস্থার দ্বারাও জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে আন্তঃরাজ্য ভৌগোলিক বাধা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইয়াছে। আন্তঃরাজ্য নানা জাতীয় সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও কৃষ্টিগত সংস্থা গঠিত হইয়া বিভিন্ন প্রদেশের জনগণের মধ্যে একাত্মবোধ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য-সংক্রান্ত সমস্যাগুলি স্থানীয় সমস্যা হইতে জাতীয় সমস্যায় পরিণত হইয়াছে এবং এই কারণে এই সমস্যাগুলির স্থানীয় স্বার্থ অপেক্ষা জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে সমাধান করিবার প্রয়োজন হয়। তাই স্থানীয় ব্যাপারেও জাতীয় সরকারের সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ও সহযোগিতা অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, বর্তমান রাষ্ট্রগুলি হইল সমাজসেবামূলক সংগঠন এবং এই কার্য একান্তরূপেই পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনানুযায়ী পরিচালিত হয়। পরিকল্পনার (Planning) সাফল্য কেন্দ্রীকরণ, সংযোগ ও বিভিন্ন অংশের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। এ কারণেও কেন্দ্রে অবস্থিত জাতীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কিন্তু জাতীয় সরকারের এই ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য ইহা মনে করা যুক্তিযুক্ত নয় যে, প্রাদেশিক সরকারগুলিকে এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রাদেশিক সরকারের পর্যায়ে পরিণত করিবার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় জাতীয় সরকারগুলি প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতা ক্রমশঃই অপহরণ করিতেছে। আসল কথা হইল যে, প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে জাতীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলিকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকে।

এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার গুণ—Merits of Unitary Government.

এককেন্দ্রীয় ব্যবস্থায়, কি শাসনব্যাপারে বা কি আইন-প্রণয়নে, কেন্দ্রীয়

সরকারের অবাধ আধিপত্য থাকে। সেইজন্য দেশের সর্বত্র একই প্রকারের আইন প্রচলিত হয়; শাসনপদ্ধতিতেও সর্বত্র একই নীতি অনুসৃত হয়। সুতরাং অখণ্ডতার জন্যই এককেন্দ্রীয় সরকার যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হয়। দ্বিতীয়তঃ, আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য-পরিচালনায় বা বৈদেশিক ব্যাপারে এককেন্দ্রীয় সরকারকে আঞ্চলিক সরকারগুলির মতামতের উপর নির্ভর করিতে হয় না। জরুরী ব্যাপারে তাই দ্রুত সিদ্ধান্ত করা এককেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সহজসাধ্য। তৃতীয়তঃ, দেশে একটিমাত্র শাসন-ব্যবস্থা চালু থাকার জন্য কোন বিষয়ে মতভেদ বা অনৈক্যের সম্ভাবনাও কম থাকে। চতুর্থতঃ, দেশের শাসনকার্য একটিমাত্র সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয় বলিয়া ব্যয়সংকোচ করা সম্ভব হয়।

অপগুণ—Demerits.

বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এককেন্দ্রীয় সরকারের উপযোগিতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। এই শাসন-ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক আদর্শকে কার্যকর করা সম্ভব হয় না। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্যের জন্য আঞ্চলিক সরকারগুলির আদৌ কোন ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং স্থানীয় ব্যাপারগুলির শাসনপরিচালনায়ও স্থানীয় লোকের কোনরূপ কর্তৃত্ব থাকে না। ফলে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অধিকন্তু কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠনে বাধা দেয়।

দ্বিতীয়তঃ, এককেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান দোষ হইল যে, কেন্দ্রীয় সরকার দূরে অবস্থিত বলিয়া বিভিন্ন অঞ্চলগুলির নানাবিধ স্থানীয় সমস্যার দ্রুত সমাধান হওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। শাসনব্যাপারে কোনরূপ অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা না থাকার দরুণ জনগণও রাজনৈতিক ব্যাপারে কোনরূপ উৎসাহ বোধ করে না। তৃতীয়তঃ, শাসন পরিচালনার সমস্ত ভার একটিমাত্র সরকারের হস্তে ন্যস্ত বলিয়া ইহার উপর অত্যধিক পরিমাণে কার্যের চাপ পড়ে। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে কোন কার্যই সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব—Merits of Federal Government.

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হইতে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, এই

শাসন-ব্যবস্থা দ্বারা বিচ্ছিন্ন দেশকে একত্রিত করা সম্ভব হয়; অথচ এই একত্রীকরণের দরুণ বিভিন্ন অঞ্চলগুলির বৈশিষ্ট্যের কোনরূপ হানি হয় না। এইরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে আঞ্চলিক বৈচিত্র্যকে অস্বীকার না করিয়াও বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, একটি বিরাট নানা ভাষাভাষী ও নানা জাতি-অধ্যুষিত দেশকে কতকগুলি অঞ্চলে ভাগ করিয়া আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা যাইতে পারে। ইহাতে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয় ঐক্যের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ ঘটিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, এই শাসনব্যবস্থার ফলে প্রত্যেকটি অঞ্চল নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুসারে নিজেদের প্রয়োজনমত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়া স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধান করিতে পারে। এইজন্য তাহাদের দূরবর্তী কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করিতে হয় না। চতুর্থতঃ, গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্যকর করিবার একমাত্র পন্থা হইল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার শাসনকার্যে জনগণকে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকতর সুযোগ দেয়। এই সুযোগের ফলে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায়। তাহারা শাসনব্যাপারে উৎসাহী হয়। পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় শাসনকার্যের নানাবিধ উৎকর্ষ সাধিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বিভাগ হওয়ার দরুণ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর শাসনকার্যের সমস্ত ভার থাকে না। এইরূপে শাসনব্যাপারে গুরুভার-মুক্ত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলিতে অধিকতর মনোযোগ দিয়া সেগুলির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বলতা—Demerits.

যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান দুর্বলতা হইল যে, বিভিন্ন অঞ্চলগুলির জন্য পৃথক্ পৃথক্ শাসন-ব্যবস্থা চালু থাকার নিমিত্ত শাসন-ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত জটিল ও ব্যয়সংকুল হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, ক্ষমতাবিভাগের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হইয়া পড়ে, ফলে আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থায় ও বিশেষ করিয়া বৈদেশিক ব্যাপারে সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। সমস্ত আঞ্চলিক সরকারগুলির মত অনুসারে সর্বসম্মত নীতি নির্ধারণ করা অনেক সময় অসম্ভব

হইয়া পড়ে। ফলে, জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলেও কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তৃতীয়তঃ, এই শাসন-ব্যবস্থায় কয়েকটি বৃহৎ অঞ্চল একত্রিত হইয়া শক্তিশালী একটি দল গঠন করিতে পারে। এই দল ইচ্ছা করিলে রাষ্ট্রীয় সরকারের কার্যে বাধা দিতে পারে। চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলগুলি পৃথক্ হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার প্রয়াসও পাইতে পারে।

উপরি-উক্ত দুর্বলতাগুলি থাকা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা দিন দিন জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। উল্লিখিত দুর্বলতাগুলিকে বাস্তবক্ষেত্রে কোথায়ও সক্রিয়ভাবে কার্যকরী হইয়া উঠিতে দেখা যায় না। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলগুলির বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার উদাহরণ আধুনিক কালে বিরল। পরন্তু, যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা হইল একমাত্র শাসন-ব্যবস্থা, যাহার দ্বারা জাতীয় ঐক্য ও আঞ্চলিক স্বাধীনতা—এই দুইটি বিপরীত শক্তির সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর হইয়াছে। মার্কিন দেশে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হইলে সে দেশ আজ জগৎসভায় এত উচ্চ আসনের অধিকারী হইতে পারিত না। সুইজারল্যাণ্ডের বিভিন্ন ক্যান্টনগুলি একত্রিত না হইলে ইয়ুরোপ মহাদেশের শান্তি আরও বহুবার বিঘ্নিত হইত।

ক্যানাডায় যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হইলে ইংরাজ ও ফরাসী জাতি এক অখণ্ড জাতিরূপে ক্যানাডায় সুখে ও সপ্রীতিতে বাস করিতে পারিত না। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন, যেদিন বিশ্বরাষ্ট্রসমূহকে এই যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ করা সম্ভব হইবে সেদিন জগতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি—Nature of the Indian Federation.

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উপজাতি-অধ্যুষিত কয়েকটি বিশেষ এলাকা ব্যতীত ভারতরাষ্ট্রের আঙ্গিক অংশগুলিকে রাজ্য বলা হয়। দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। পূর্ব-অবস্থিত কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র তাহাদের পৃথক রাষ্ট্রীয় সত্তা পরিত্যাগ করিয়া নূতন এক সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে। ইহাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি বলা হয়। অপরপক্ষে একটি এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকে কতকগুলি আঙ্গিক রাজ্যে বিভক্ত করিয়া একটি

যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হইতে পারে। ক্যানাডার যুক্তরাষ্ট্র এই পদ্ধতিতে গঠিত হইয়াছে। গঠনপদ্ধতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রকে ক্যানাডার যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতের যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন ও ক্যানাডীয়—এই উভয় পদ্ধতির সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে। বৃটিশ-শাসিত ভারতে মূলতঃ এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। নূতন শাসনতন্ত্র এই এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে কতকগুলি 'ক' শ্রেণীর আঙ্গিক রাজ্যে প্রবর্তিত করিয়া ক্যানাডীয় পদ্ধতিতে একটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। অপরপক্ষে বৃটিশ-শাসিত ভারত সরকারের ক্ষমতা-বহির্ভূত দেশীয় রাজ্যগুলিকে 'খ' ও 'গ' শ্রেণীর আঙ্গিক রাজ্যে পরিবর্তিত করিয়া পূর্বতন বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলির সমবায়ে এক নূতন যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং গঠনপদ্ধতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অভিনবত্ব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশে যে সমুদয় আঙ্গিক রাজ্য লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তাহারা সমক্ষমতা ও সমমর্যাদার অধিকারী। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের যুক্তরাষ্ট্র চারিটি বিভিন্ন শ্রেণীর আঙ্গিক রাজ্য লইয়া গঠিত হইয়াছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সম্পর্কে এই বিভিন্ন শ্রেণীর রাজ্যগুলির ক্ষমতা ও মর্যাদার তারতম্য পরিলক্ষিত হইত। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এমন কতকগুলি বিশেষ অংশ আছে যেগুলি সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বলিয়া পরিচিত। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যগুলির সহিত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পনেরটি প্রধান আঙ্গিক রাজ্য ব্যতীত অন্য তিন শ্রেণীর উপ-বিভাগের সহিত একটি ক্ষীণ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইত। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পনেরটি প্রধান আঙ্গিক রাজ্য ব্যতীতও স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র, স্ব-শাসিত প্রদেশ ও জাতীয় অঞ্চল বলিয়া পরিচিত তিন শ্রেণীর উপ-বিভাগ আছে এবং এই প্রত্যেকটি উপ-বিভাগের পৃথক প্রতিনিধি নির্বাচন অধিকার বর্তমান।

তৃতীয়তঃ, ক্ষমতা-বিভাগের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অভিনবত্ব প্রকটিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া

সাধারণতন্ত্র হইতে পৃথক পদ্ধতিতে ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য-সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভাগ করা হইয়াছে। মার্কিন দেশের ও অস্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার শাসনতন্ত্র নির্ধারিত নির্দিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী, আর রাজ্যসরকারগুলিকে অনুল্লিখিত ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে। সুইস্ দেশেও শাসনতন্ত্র কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতাসমূহ ব্যতীত অবশিষ্ট ক্ষমতা-সমূহের অধিকারী হইল ক্যান্টন সরকারগুলি। কিন্তু ভারতের শাসন-তন্ত্র ক্যানাডীয় পদ্ধতি অনুসারে সরকারের সমুদয় ক্ষমতাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা এই তিন ভাগে ভাগ করিয়াছে। ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারই হইল অনুল্লিখিত ক্ষমতার অধিকারী। ভারতে রাজ্যসরকারগুলির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অস্ট্রেলিয়ার রাজ্যসরকারগুলির শাসনতন্ত্রের ন্যায় কোন নিজস্ব শাসনতন্ত্র নাই; যাহা তাহারা নিজ ইচ্ছা-নুসারে সংশোধন করিতে পারে। এ বিষয়ে ভারতের রাজ্যগুলির পদমর্যাদা ক্যানাডীয় যুক্তরাষ্ট্রের সদস্য প্রদেশগুলির অনুরূপ। ভারতের রাজ্যসরকার-গুলির গঠনপদ্ধতি ও ক্ষমতাসমূহ ভারতের শাসনতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়।

চতুর্থতঃ, ভারতের শাসনতন্ত্রের একটি সম্পূর্ণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা আদৌ অনমনীয় নহে। প্রয়োজন ক্ষেত্রে এই শাসন-ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সহজেই পরিবর্তিত করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষ অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য বহু ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। এই বিশেষ ক্ষমতার বলে রাষ্ট্রপতি ও কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টসভা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্য-সরকারগুলির উপর প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহ পরিচালনা করিতে পারিবেন। অন্য কোন দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের এরূপ ক্ষমতা-বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয় না।

পঞ্চমতঃ, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীকরণের এরূপ আতিশয্য দেখা যায়, যাহা অস্ট্রেলিয়া এমন কি ক্যানাডা বা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায়ও দেখা যায় না। ভারতে যে সর্বভারতীয় নিয়োগ সংসদ (Union Public Service Commission) আছে, তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য সম্পাদনের জন্য লোক নিয়োগ করে। কিন্তু সর্বভারতীয়

নিয়োগ সংসদ কর্তৃক মনোনীত কর্মচারী রাজ্যসরকারগুলির শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র ভারতের (যুক্তরাষ্ট্রীয় ও রাজ্য সম্পর্কিত) জন্য একটিমাত্র নির্বাচন সংসদ (Election Commission) আছে। এই সংসদ সমুদয় নির্বাচন ব্যাপার পরিচালনা করেন। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত কেন্দ্রীয় প্রধান হিসাব পরীক্ষক রাজ্যসরকারগুলিরও আয়-ব্যয়ের পরীক্ষা করিয়া থাকেন। চতুর্থতঃ, রাজ্যপালগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং রাজ্যপাল ইচ্ছা করিলে রাজ্য আইনসভাগুলি কর্তৃক অনুমোদিত খসড়া আইনগুলিকে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। একমাত্র ক্যানাডা ব্যতীত অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। উপরি-উক্ত কেন্দ্রপ্রাধান্য ভারতের রাজ্যসরকার-গুলির দুর্বলতা ও অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট পদমর্যাদা সূচিত করে।

ষষ্ঠতঃ, সমগ্র ভারতে এক অখণ্ড ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইস্ দেশে নাগরিকগণের দ্বি-বিধ নাগরিকত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের নাগরিকত্ব অর্জন বা বর্জন সম্পর্কিত আইন-প্রণয়ন ও পরিবর্তন করিবার একমাত্র অধিকারী হইল পার্লামেন্ট সভা। এতদ্ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভারতের শাসনতন্ত্র অনমনীয় হইলেও ইহাই একমাত্র শাসনতন্ত্র যাহার পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতের শাসনতন্ত্র সমগ্র ভারতের জন্য একই প্রকারের ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্যবিধি প্রবর্তন করিয়াছে এবং সমগ্র ভারতের জন্য একই বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের ন্যায় শুধুমাত্র শাসনতন্ত্রের রক্ষক নহে। ইহা ভারতের রাজ্যগুলি হইতে আনীত আপীল মামলার বিচার করিবার সর্বোচ্চ আদালত।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রচলিত সংজ্ঞা আছে, ভারতে প্রতিষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্র সে সংজ্ঞা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীভাবের আতিশয্যের জন্য ইহাকে একটি নিখুঁত যুক্তরাষ্ট্র আখ্যা না দিয়া যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ একটি শাসন-ব্যবস্থা বলা অতিকতর যুক্তিযুক্ত। ভারতের অতীত ও বর্তমান ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে

বিচার করিলে মনে হয় যে, শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ এই নবীন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অসংখ্য অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিবার প্রচেষ্টা রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা আনয়ন করিবে। সকল যুক্তরাষ্ট্রেই অল্পবিস্তর পরিমাণ কেন্দ্রপ্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এমন কি যুক্তরাষ্ট্রগুলির মধ্যে আদর্শস্থানীয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও বর্তমান-যুগে এই কেন্দ্রপ্রাধান্য বিচার বিভাগীয় নির্দেশ দ্বারা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের ক্ষেত্রে এই কেন্দ্রপ্রাধান্য অপরিহার্য। যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রকে এককেন্দ্রীয় রাষ্ট্র হইতে পৃথক করা যায়, যথা, ক্ষমতার বিভাগ, লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র, নিরপেক্ষ উচ্চ বিচারালয়—তৎসমুদয়ই ভারতে বর্তমান। একমাত্র কেন্দ্রপ্রাধান্যের জন্য ইহাকে যুক্তরাষ্ট্র আখ্যা না দেওয়া সমীচীন নহে।

ভারতের শাসনতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য—Federal and Unitary Features of the Indian Constitution.

ভারতের শাসনতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অন্তরালে এই শাসনতন্ত্রে এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার একাধিক নিদর্শন বর্তমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ, এই শাসনতন্ত্র এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এই শাসনতন্ত্রে স্থান পাইলেও ইহার কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য—Federal Features.

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় এই যুক্তরাষ্ট্রেও কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভাগ ও বন্টন (Division and Distribution of Powers) হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, একটি বিশদভাবে লিখিত শাসনতন্ত্র কর্তৃক ক্ষমতা বিভক্ত হইয়াছে। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের ন্যায় ভারতের শাসনতন্ত্র শুধু লিখিত নয়, সাধারণভাবে বলিতে গেলে এই শাসনতন্ত্র অনমনীয়ও বটে।

তৃতীয়তঃ, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মত ভারতেও একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিচারালয় শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত বিবাদের মীমাংসা করে। চতুর্থতঃ, এই শাসনন্ত্রের কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণে রাজস্ব বন্টনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুততাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য—Unitary Features.

ভারতের শাসনতন্ত্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি হইতে ইহার মূলতঃ এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রবণতা প্রকটিত হয়।

প্রথমতঃ, বলা যায় যে, ভারতের শাসনতন্ত্র একটি পূর্ণাঙ্গ লিখিত শাসনতন্ত্র।

এই শাসনতন্ত্র দ্বারা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের গঠন, প্রকৃতি ও কার্যক্ষেত্র নির্ধারিত হয় নাই, পরন্তু রাজ্যসরকারগুলিও এই একই শাসনতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। রাজ্যসরকারগুলির নিজস্ব কোন পৃথক শাসনতন্ত্র গঠন বা পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা নাই। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সদস্য রাজ্যগুলির রাজনৈতিক সমতা (Political equality of States); ভারতের যুক্তরাষ্ট্রে এই নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করা হয় নাই। তৃতীয়তঃ, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা-বন্টন-নীতি যেরূপভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির শাসনভার অর্পিত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। চতুর্থতঃ, ভারতের শাসনতন্ত্রে একটি সুদীর্ঘ যুগ্ম বিষয়ের তালিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং ক্ষমতাবন্টন ব্যাপারে অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এই উভয় ব্যবস্থা দ্বারা রাজ্যসরকারগুলির যুক্তরাষ্ট্রসুলভ স্বাধীন সত্তা ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। পঞ্চমতঃ, সমগ্র ভারতের জন্য একদফা নাগরিকত্ব, একটি মাত্র আপীল আদালত ও একটি মাত্র নির্বাচন সংসদ প্রতিষ্ঠা দ্বারা এই শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য সুচিত হয়। ষষ্ঠতঃ, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে অনায়াসে এককেন্দ্রীয়

শাসন-ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্যসরকারগুলির শাসনকার্য পরিচালিত হইতে পারে। অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থায় এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। পরিশেষে ভারতের শাসনতান্ত্রিক আইন অনুসারে ভারতের যে-কোন রাজ্যের সীমানা কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট সভা কর্তৃক পরিবর্তিত হইতে পারে। উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি হইতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, ভারতের যুক্তরাষ্ট্র মূলতঃ এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার আদর্শে গঠিত হইয়াছে।

পার্লামেণ্ট-প্রধান বা মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকার—Parliamentary or Cabinet Form of Government.

মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকারের শাসনবিভাগের সমুদয় ক্ষমতা একটি মন্ত্রিসভার হস্তে ন্যস্ত থাকে এবং মন্ত্রিসভাই এই সমুদয় ক্ষমতা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। কিন্তু এই শাসন-ব্যবস্থায় আইনতঃ সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হইলেন একজন নামসর্বস্ব রাজা কিংবা নির্বাচিত একজন রাষ্ট্রপতি। রাজা বা রাষ্ট্রপতির নামে সমস্ত কার্য পরিচালিত হইলেও তাঁহার নিজস্ব কোন ক্ষমতা থাকে না। মন্ত্রিসংসদই শাসন পরিচালনা করেন। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতারা মন্ত্রিসংসদ গঠন করিয়া আইনসভার অনুমোদনে সমস্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। মন্ত্রিসংসদ তাঁহাদের নীতি ও কার্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। মন্ত্রিসভার কার্য যদি আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ করিতে হয়। মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকারের বৈশিষ্ট্য হইল, শাসনবিভাগীয় ও আইনবিভাগীয় ক্ষমতার একত্র সমাবেশ। এই ব্যবস্থায় ক্ষমতার কোনরূপ স্বাতন্ত্র্যবিধান করা হয় না। মন্ত্রিগণকে আইনসভার সদস্য হইতে হয়। আইনসভার সদস্য হিসাবে তাঁহারা আইন প্রণয়ন করিতে পারেন, সরকারের আয়-ব্যয় নির্ধারণ করিতে পারেন ও শাসনবিভাগীয় সমুদয় কার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আইনসভা যদি মন্ত্রিগণের উপর অনাস্থা প্রকাশ করে, তাহা হইলে মন্ত্রিমণ্ডলীর হয় পদত্যাগ করিতে হয় নতুবা আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই নূতন নির্বাচনের ফলের উপর মন্ত্রিসংসদের অস্তিত্ব নির্ভর করে। নূতন নির্বাচনে যদি বিরোধী দল

সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, তাহা হইলে তাহাদের পদত্যাগ বাধ্যতামূলক হয়। সুতরাং এই শাসন-ব্যবস্থায় প্রকৃত শাসকগোষ্ঠী অর্থাৎ মন্ত্রিসংসদ প্রত্যক্ষভাবে আইনসভার নিকট এবং পরোক্ষভাবে নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট দায়ী থাকেন—এইজন্য ইহাকে দায়িত্বশীল সরকার (Responsible Government) বলা হয়। এই শাসন-ব্যবস্থায় শাসনবিভাগ ও আইন-বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা দেখিতে পাওয়া যায়।

মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকারের উৎপত্তি হয় ইংলণ্ডে ও অন্যান্য দেশসমূহ ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থার অনুকরণে প্রয়োজন অনুসারে এই শাসন-ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন করিয়া নিজ নিজ দেশে প্রবর্তন করিয়াছে। ফরাসী দেশ, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে এই শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। সাধারণ নির্বাচনের পর আইনসভায় যে রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দল মন্ত্রিসংসদ গঠন করে। দলের প্রধান নেতা প্রধানমন্ত্রিরূপে পরিচিত হইয়া মন্ত্রিমণ্ডলীর সংহতি বজায় রাখেন। মন্ত্রিসংসদ আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন ও আইনসভা কর্তৃক তাঁহাদের কার্য নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া এই সরকারকে আইনসভা-প্রধান (Parliamentary Government) বলা হয়।

রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার—Presidential or Non-Parliamentary Government.

রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার একজন রাষ্ট্রনায়ক নির্দিষ্ট কালের জন্য পরিচালনা করেন। এই শাসন-ব্যবস্থায় শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ শাসনতন্ত্র অনুসারে আইনসভার কর্তৃত্বাধীন নহে। অপরপক্ষে, আইনসভাও শাসন-কর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত হইয়া কার্য পরিচালনা করে। এই শাসন-ব্যবস্থা ক্ষমতার প্রায় সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যবিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে নামমাত্র যোগাযোগ থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিভাগের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ হইলেন রাষ্ট্রপতি। তিনি জনগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে চারি বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইয়া

থাকেন। তাঁহার এই চারি বৎসর কার্যকালের মধ্যে কেহই তাঁহাকে অপসারিত করিতে পারে না। তাঁহার সহকারী মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণকে তিনি নিয়োগ করেন এবং বরখাস্তও করিতে পারেন। মন্ত্রিগণ তাঁহার অধস্তন কর্মচারী। রাষ্ট্রপতির নির্দেশ ব্যতীত তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিমত বা দায়িত্ব কিছুমাত্র নাই। রাষ্ট্রপতির সহিত আইনসভার প্রত্যক্ষ কোন যোগসূত্র নাই। তিনি আইনসভার সদস্য নহেন ও আইন-প্রণয়নে তাঁহার প্রত্যক্ষ কোন প্রভাব নাই। আইনসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে না। এক কথায়, রাষ্ট্রপতিকে গ্রেট্ বৃটেনের মন্ত্রিসংসদের ন্যায় আইনসভার উপর নির্ভর করিতে হয় না। অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার শাসনতন্ত্রানুমোদিত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে। এইজন্য আইনসভার নিকটে তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই। অপরপক্ষে, আইনসভার কার্যেও রাষ্ট্রপতি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নাই।

মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের পার্থক্য—Points of difference between Parliamentary and Presidential Froms of Government.

১। মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসন-ব্যবস্থায় নামসর্বস্ব বংশানুক্রমিক একজন রাজা বা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকেন। ইনি শাসনতান্ত্রিক আইনানুসারে রাষ্ট্রের প্রধান শাসনকর্তৃপক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইলেও কার্যতঃ ইনি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী নহেন। ইংলণ্ডের রাজা, ভারতের রাষ্ট্রপতি ও ক্যানাডার গভর্ণর-জেনারেল ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, রাষ্ট্রপতি শুধু নামসর্বস্ব শাসক-প্রধান নহেন, পরন্তু তিনি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ভোটদাতাগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

২। মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকারের প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হইল মন্ত্রিসংসদ। মন্ত্রিসংসদের নির্ধারিত কার্যকাল থাকিলেও তৎপূর্বে আইনসভার অনাস্থা প্রস্তাবে ইঁহারা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে পারেন, কিন্তু

রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রপতির নির্বাচনপদ্ধতি ও কার্যকালের স্থায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে শাসনতান্ত্রিক আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়। বিশেষ বিচারব্যবস্থা ব্যতীত রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায় না।

৩। মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রিমণ্ডলী আইনসভার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল—যতদিন তাঁহারা আইনসভার আস্থাভাজন থাকেন ততদিন পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণরূপে আইনসভা-নিরপেক্ষ ও আইনসভার প্রভাবমুক্ত থাকিয়া তাঁহার শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত কার্যকাল পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন। আইনসভার আস্থা বা অনাস্থা প্রস্তাবে তাঁহার পদমর্যাদা বা কার্যকাল ক্ষুণ্ণ হয় না।

৪। মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রিসংসদ সাধারণতঃ সংখ্যা-গরিষ্ঠ দলের নেতৃবর্গের দ্বারা গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী এই নেতৃবর্গের শীর্ষস্থানীয় হইলেও প্রধানমন্ত্রিসহ সমুদয় সদস্য সমপর্যায়ভুক্ত সহকর্মী। মন্ত্রি-সংসদের সিদ্ধান্তগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দ্বারা স্থিরীকৃত হয়।

অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসন-ব্যবস্থায় একমাত্র রাষ্ট্রপতিই হইলেন শাসনক্ষমতার অধিকারী—সুতরাং তাঁহার মন্ত্রণাসভার সদস্যগণ তাঁহার আজ্ঞাবহ অধস্তন কর্মচারী মাত্র। এক রাষ্ট্রপতি স্বয়ং ব্যতীত দলের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী অন্যান্য নেতৃবর্গ সাধারণতঃ আইনসভার সদস্য থাকেন—কদাচিৎ তাঁহাদের মন্ত্রণাসভায় দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রণাসভার সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন ও রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন। মন্ত্রণাসভার সিদ্ধান্তগুলি একমাত্র রাষ্ট্রপতির মতামতের উপর নির্ভর করে।

৫। মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসন-ব্যবস্থায় শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে ক্ষমতার কোন স্বাতন্ত্রীকরণ পরিদৃষ্ট হয় না। মন্ত্রিসংসদের সমুদয় সদস্যকে আইনসভার সদস্য হইতে হয় এবং আইনসভার সদস্য হিসাবে তাঁহারা আইন-প্রণয়ন, নীতি-নির্ধারণ ও আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। ইঁহারা আইনসভার নিকট ইঁহাদের কার্যের জন্য দায়ী থাকেন—আবার আইনসভার সহিত মতভেদ হইলে আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন।

অপরপক্ষে রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসন-ব্যবস্থায় শাসনবিভাগ ও আইনসভার মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি প্রযুক্ত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি আইনসভার সদস্য নহেন। তিনি বে-সরকারী সদস্যের সাহায্য ব্যতীত আইন-প্রণয়ন কার্যে যোগদান করিতে পারেন না বা প্রত্যক্ষভাবে আইন-প্রণয়ন কার্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না। তিনি আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন না বা আইনসভাও বিশেষ বিচারপদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইল রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকারের সুবিধা ও অসুবিধা—Merits and Demerits of Cabinet Government.

মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসন-ব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হইল যে, শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শাসনকার্য বিনা বাধায় সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রিসংসদ আইনসভার নিকট তাঁহাদের কার্যের জন্য দায়ী থাকেন বলিয়া শাসন-ব্যবস্থায় কোনরূপ শৈথিল্য বা স্বেচ্ছাচারিতার সম্ভাবনা থাকে না। মন্ত্রিসভা যে শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহা সংখ্যাধিক্যের বলে আইনসভার অনুমোদন লাভ করে। দলগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মন্ত্রিসংসদের সর্বদাই দলের নীতি অনুযায়ী কার্য করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, জনগণের স্বার্থবিরোধী কোনরূপ কার্য করিলে ভবিষ্যতে ইঁহারা জনগণের সমর্থনলাভে বঞ্চিত হইতে পারেন—এইজন্য জনস্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীন থাকা বা জনমত উপেক্ষা করা ইঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। চতুর্থতঃ, এই শাসন-ব্যবস্থায় পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ আছে। আলাপ-আলোচনার দ্বারা মতভেদ দূর করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলিয়া এই শাসন-ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ় হয়। পঞ্চমতঃ, মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকার সহজেই প্রয়োজনমত পরিবর্তন করা যায় বলিয়া জরুরী অবস্থায় ইহা বিশেষ কার্যকরী হয়। ইংলণ্ডে যুদ্ধকালে সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা বা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতে কোনরূপ বেগ পাইতে হয় না।

উল্লিখিত সুবিধাগুলি থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসন-ব্যবস্থায়

কতকগুলি মারাত্মক ত্রুটি দেখা দেয়। মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যগণ যদি একমত না হইতে পারেন, তাহা হইলে শাসন-ব্যবস্থা পদে পদে ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা থাকে। বিশেষ করিয়া আপৎকালে এই ঐকমত্যের অভাবে শাসন-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত দেশে অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব আছে, সে সমস্ত দেশে মন্ত্রিমণ্ডলী পুনঃপুনঃ পরিবর্তনের ফলে শাসন-ব্যবস্থায় কোনরূপ প্রকৃত প্রগতিশীল নীতি অনুসৃত হইতে পারে না। ফরাসী মন্ত্রিসভার এইটি ছিল প্রধান ত্রুটি। দলীয় সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দল গঠনের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটিলেই মন্ত্রিসভার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। সুতরাং এই শাসন-ব্যবস্থার বিশেষ কোন স্থায়িত্ব নাই। তৃতীয়তঃ, এই শাসন-ব্যবস্থার দুর্বলতা দুই দিক দিয়া প্রকটিত হয়। ইংলণ্ডে এই শাসন-ব্যবস্থা মন্ত্রিসংসদের বিশেষ করিয়া প্রধানমন্ত্রীর একনায়কত্বে পর্যবসিত হইয়াছে। মন্ত্রিসংসদের আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা থাকায় আইনসভা বর্তমানে একটি তাঁবেদার আইন-সভায় পরিণত হইয়াছে। ফলে, মন্ত্রিসংসদ সর্ববিষয়ে অবাধ কর্তৃত্বের অধিকারী হইয়াছে। ফরাসী দেশে আবার আইনসভার হস্তে মন্ত্রিসংসদকে ইচ্ছামত অপসারিত করিবার ক্ষমতা থাকায় সেখানে কোন মন্ত্রিসংসদই স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না।

রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসন-ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা—Merits and Demerits of Presidential Government.

রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের প্রধান গুণ হইল যে, ইহা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী শাসন-ব্যবস্থা। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাষ্ট্রপতি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ঐ সময় পর্যন্ত তিনি নিজের নীতি অনুসরণ করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, জরুরী অবস্থায় বা জটিল পরিস্থিতিতে যেখানে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যক সেখানে রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার অধিকতর উপযোগী। তৃতীয়তঃ, এই শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রিমণ্ডলীকে আইনসভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের কার্যকলাপের জন্য জবাবদিহি করিতে হয় না, সুতরাং মন্ত্রিমণ্ডলী একাগ্রচিত্তে শাসন পরিচালনা কার্যে মনঃসংযোগ করিতে পারেন। ইহাতে শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হয়। চতুর্থতঃ, আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারেও

আইনসভা শাসনকর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত হইয়া দেশের প্রয়োজন অনুসারে আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

কিন্তু এই শাসন-ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে, আইনসভা ও শাসন-বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের জন্য ইহারা সহযোগিতার ভিত্তিতে কার্য পরিচালনা করিতে পারে না। কোন কারণে যদি শাসন-কর্তৃপক্ষের সহিত আইনসভার মতবিরোধ বা সংঘর্ষ হয়, তাহা হইলে শাসন-ব্যবস্থায় অচল পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে। ফলে, জাতীয় স্বার্থের হানি হইবার সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়তঃ, এই শাসন-ব্যবস্থায় শাসনকর্তৃপক্ষ দায়িত্বহীন হইয়া পড়িতে পারে। যে নির্দিষ্টকালের জন্য রাষ্ট্রপতি জনগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন, সেই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে পদচ্যুত করা যায় না। রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যের জন্য কাহারও নিকট তাঁহার কার্যকালে দায়ী নহেন। জনগণ বা আইনসভা বা মন্ত্রিসংসদ তাঁহার কার্যের জন্য কৈফিয়ৎ তলব করিতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে তাঁহার খুশিমত শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ, এই শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র না থাকার ফলে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইতে পারে না। কিন্তু রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হইয়া দলীয় ভিত্তিতে শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন হওয়ার ফলে বর্তমানে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হইয়া শাসনকার্য অনেক পরিমাণে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত হইতেছে।

ভারত সরকারের প্রকৃতি—পার্লামেণ্ট-প্রধান অথবা রাষ্ট্রপতি-প্রধান? —Nature of the Indian Government—Parliamentary or Presidential?

ভারতের সংবিধান অনুসারে সর্বভারতের জন্য একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং তিনিই হইলেন শাসন বিভাগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। কিন্তু রাষ্ট্রপতি হইলেন ভারত রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ন্যায় তাঁহার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই। ভারতের রাষ্ট্রপতির সমুদয় ক্ষমতাই মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত।

শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ ভারতের জন্য একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করিলেও সমগ্র শাসন-ব্যবস্থাকে বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থার অনুরূপ পার্লামেন্ট-প্রধান বা মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসন-ব্যবস্থা গঠন করিয়াছেন। এই শাসন-ব্যবস্থার মূলকথা হইল শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার কোন পৃথকীকরণ করা হয় না, পরন্তু এই দুই বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা থাকে। অপর পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসন-ব্যবস্থায় এই উভয় বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার প্রত্যক্ষ পৃথকীকরণ আছে এবং আইনসভা শাসন বিভাগ নিরপেক্ষভাবে ইহার কাজ করে এবং শাসন বিভাগও আইনসভা নিরপেক্ষভাবে ইহার কার্য পরিচালনা করে। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আইনসভার সদস্যগণের মধ্য হইতেই শাসন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ মন্ত্রিসংসদের সদস্যগণ নির্বাচিত হন। মন্ত্রীগণকে অবশ্যই আইনসভার সদস্য হইতে হইবে এবং আইনসভার সদস্য হিসাবে তাঁহারা আইন প্রণয়ন, কর স্থাপন প্রভৃতি আইন প্রণয়ন বিষয়ক-কার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারেন। প্রয়োজন ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভার নেতা প্রধানমন্ত্রী আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারেন। অপর পক্ষে আইনসভার সদস্যগণও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে, সমালোচনা দ্বারা এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া মন্ত্রী-সংসদকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারে। অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে লইয়া মন্ত্রীসংসদ গঠিত হয় বলিয়া আইনসভা ও শাসন বিভাগের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা খুব স্বল্প। ভারতে একজন রাষ্ট্রপতি থাকিলেও ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা ও রাজ্যগুলির শাসন-ব্যবস্থা পার্লামেন্ট-প্রধান প্রথায় পরিচালিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসংসদ আইনসভার অনুমোদনে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সুতরাং ভারতের শাসন-ব্যবস্থা পার্লামেন্ট-প্রধান—রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসন-ব্যবস্থা নহে।

রাজতন্ত্র (Monarchy): যে শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের সমস্ত শাসন ক্ষমতা একজন বংশানুক্রমিক রাজার হস্তে ন্যস্ত থাকে, সেই শাসন-ব্যবস্থাকে রাজতন্ত্র বলা হয়। এই ব্যবস্থায় রাজাই হইলেন রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় সর্বজন-শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। রাজতন্ত্র সাধারণতঃ জন্মগত উত্তরাধিকারের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ রাজার জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজা হন। পুত্রসন্তান না থাকিলে

কন্যা পিতার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারেন। কদাচিৎ রাজা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হইতে পারেন। প্রাচীন রোম ও পোলাণ্ড দেশে এইরূপ নির্বাচিত রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব দেখা যায়।

রাজতন্ত্র আবার দুই প্রকারের হইতে পারে—অসীম ক্ষমতা-বিশিষ্ট বা অবাধ রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) ও নিয়মতান্ত্রিক বা সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র (Constitutional or Limited Monarchy)। অসীম ক্ষমতা-বিশিষ্ট রাজতন্ত্রে একমাত্র রাজার ইচ্ছায় শাসনকার্য পরিচালিত হয়। এই শাসন-ব্যবস্থায় শাসিতের ইচ্ছার কোন স্থান নাই। এই শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপ ফরাসী দেশের রাজা চতুর্দশ লুইয়ের উক্তি হইতে বুঝা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমিই রাষ্ট্র' (I am the State)। সুতরাং এই শাসন-ব্যবস্থায় রাজা ও রাষ্ট্রে কোনও ভেদ থাকে না। বর্তমানে অবশ্য এ জাতীয় রাষ্ট্র ক্রমশই বিলীন হইতেছে।

অবাধ রাজতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল যে, রাষ্ট্রীয় চরম ক্ষমতা এক হস্তে ন্যস্ত থাকার ফলে শাসন ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়। রাজা প্রজাবৎসল হইলে তাঁহার নিজ উদ্যমে তিনি প্রজার বহু হিত সাধন করিতে পারেন। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজা জনগণের মধ্যে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়া তাহাদিগকে আইন-শৃঙ্খলা মানিবার শিক্ষা দিতে পারেন।

কিন্তু এতগুলি গুণ থাকা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, শাসন-ব্যবস্থার যতগুলি প্রকারভেদ আছে তাহার মধ্যে এইটিই হইল নিকৃষ্টতম। কারণ, এই শাসন-ব্যবস্থায় ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোন সুযোগ নাই। রাজা প্রজার সর্ববিধ হিত সাধন করিলেও স্বাধীনতা ও সাম্যের অভাবে জনসাধারণের ব্যক্তিত্ব পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। শাসনকার্যে প্রজাগণের অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা না থাকার ফলে তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা ও রাজনৈতিক বুদ্ধি বিকাশ লাভ করিতে পারে না। এই শাসন-ব্যবস্থায় সু-নাগরিকের সৃষ্টি হইতে পারে না। আত্মপ্রত্যয় ও আত্মসম্মানবোধের অভাবে জনসাধারণ ক্রীতদাসের পর্যায়ে পরিণত হয়।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে একজন রাজা শাসন-ব্যবস্থার শীর্ষ স্থানে অবস্থান করিলেও তাঁহার কোন ক্ষমতা থাকে না। তিনি নামসর্বস্ব রাজারূপে বিরাজ

করেন। তাঁহার সমস্ত ক্ষমতাই জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের দ্বারা গঠিত মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়। রাজার ক্ষমতা ও পদমর্যাদা প্রথা-ভিত্তিক আইন অথবা শাসনতন্ত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়। এইজন্য এই শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয় রাজা রাজত্ব করেন কিন্তু শাসন করেন না। (The King reigns but does not govern) যুক্তরাজ্যে এখনও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বর্তমান।

প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র—Republic.

যে শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণই হইল রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ও যে শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণের ইচ্ছা পরোক্ষভাবে কার্যকরী হয়, তাহাকে প্রজাতন্ত্র বলা হয়। গঠনের দিক দিয়া প্রজাতন্ত্রের সহিত নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের একটা প্রভেদ থাকিলেও ক্ষমতার দিক উভয় শাসন-ব্যবস্থায়ই সার্বজনীন সার্বভৌমত্ব সূচিত হয়। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে একজন জন্মগত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রতিষ্ঠিত রাজা থাকেন, কিন্তু তাঁহার কোন ক্ষমতা থাকে না। প্রজাতন্ত্রে নির্দিষ্টকালের জন্য নির্বাচিত একজন রাষ্ট্রনায়ক থাকেন। ভারত একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার বিশাল ক্ষমতা আইনসভার তত্ত্বাবধানে মন্ত্রিমণ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত হয়।

প্রজাতন্ত্রী ভারত—India as a Republic.

ভারতের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি প্রজাতন্ত্র বা সাধারণ-তন্ত্র রূপে ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রজাতন্ত্রে সমস্ত ক্ষমতার উৎস হইল জনগণ। এই শাসন-ব্যবস্থায় স্বৈরাচারী শাসন বা বংশানুক্রমিক রাজার কোন স্থান নাই। প্রজাতন্ত্রে শাসন-ব্যবস্থার বিভিন্ন রূপ থাকিলেও এই শাসন-ব্যবস্থায় জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সরকার গঠন করেন এবং এই সরকার জনস্বার্থে শাসন পরিচালনা করেন ও ইহার কার্যের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। ইংলণ্ডে বংশানুক্রমিক রাজা রাষ্ট্রের প্রধান হইলেও তিনি ক্ষমতা-বিহীন নামসর্বস্ব রাষ্ট্র-প্রধান। প্রকৃত শাসন ক্ষমতা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সরকার পরিচালনা করে। এইজন্য বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থাকে একটি আবরণ-যুক্ত সাধারণতন্ত্র (Veiled Republic) বলা হয়।

ভারতে কোন বংশগত রাজা নাই। পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত একজন রাষ্ট্রপতি হইলেন শাসনক্ষমতার আধার। কিন্তু জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সরকার গঠন করিয়া জনমত অনুসারে প্রকৃত শাসনক্ষমতা পরিচালনা করে। সুতরাং ভারতকে একটি প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র বলিতে আপত্তির কোন সংগত কারণ থাকিতে পারে না।

ভারত কমনওয়েল্থের সদস্য এবং এই কারণে বৃটিশ রাজার আনুগত্য স্বীকার না করিলেও কমনওয়েল্থের সদস্য হিসাবে তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে। বৃটিশ রাজার এই নেতৃত্ব স্বীকৃতির ফলে প্রজাতন্ত্রী ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কিনা বলিয়া প্রশ্ন উঠিতে পারে। এ সম্পর্কে ভারতের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী নেহরুর উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন যে, আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে কমনওয়েল্থটি কোন অর্থেই একটি অভিভাবক-রাষ্ট্র (Super State) নহে। আমরা রাজাকে এই স্বাধীন রাষ্ট্রসংঘের নেতৃত্বের প্রতীক বলিয়া বিবেচনা করিতে স্বীকৃত হইয়াছি। কিন্তু এই সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রসমূহ সম্পর্কে রাজার কোন কর্তব্য নাই। ভারতের শাসনতন্ত্র অনুসারে বলা যায় যে, আমরা রাজার কোন আনুগত্য স্বীকার করিব না। ভারত সম্পর্কে বৃটিশ রাজার আদৌ কোন ক্ষমতা নাই—এমন কি ভারতের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারেও রাজার নাম উচ্চারিত হয় না। রাজার নেতৃত্ব শুধু একটি ধারণা মাত্র। ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারগণ মনে করেন যে, স্বাধীনভাবে যদি এই স্বাধীন বৃটিশ জাতির সহিত আরও কিছুদিন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা যায় তাহা হইলে শিশুরাষ্ট্র ভারত আরও অধিকতর লাভবান হইবে। তাই ভারত স্বেচ্ছায় কমনওয়েল্থভুক্ত রাষ্ট্রের সদস্য রহিয়াছে ও প্রয়োজন হইলে স্বেচ্ছায় কমন্‌ওয়েল্থ ত্যাগ করিবে। ভারতকে কমনওয়েল্থে রাখিবার উদ্দেশ্যেই 'বৃটিশ কমনওয়েলথ' হইতে 'বৃটিশ' শব্দটি বাদ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং কমনওয়েল্থ সদস্যভুক্ত হওয়ার ফলে ভারতের সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রী প্রকৃতি কোনমতে ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

নবম অধ্যায়

গণতন্ত্র (Democracy)

গণতন্ত্র-প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—Democracy—Direct and Indirect or Representative.

'গণতন্ত্র' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল গণ-শাসন। Demos শব্দটির অর্থ হইল জনগণ ও Kratia শব্দটির অর্থ হইল ক্ষমতা। সুতরাং গণতন্ত্র হইল এমন একটি শাসন-ব্যবস্থা যে শাসন-ব্যবস্থায় জনগণই হইল সকল ক্ষমতার অধিকারী। এই শাসন-ব্যবস্থায় স্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি অ্যাব্রাহাম লিন্‌কন্ অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, জনসাধারণকে লইয়া জনসাধারণের কল্যাণে জনসাধারণ কর্তৃক যে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় তাহাকেই গণতন্ত্র বলা হয় (A Government of the people, for the people and by the people)। জনসাধারণকে লইয়া ও জনসাধারণের কল্যাণে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইতে পারে, কিন্তু জনসাধারণ দ্বারা শাসনকার্য কিভাবে পরিচালিত হইতে পারে ইহা চিন্তার বিষয়।

প্রাচীন গ্রীক ও রোম দেশের জনগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিত। তখনকার রাষ্ট্রগুলি ক্ষুদ্রকায় নগর-রাষ্ট্র ছিল। জনসংখ্যাও ছিল স্বল্প। আর জনসংখ্যার বেশীর ভাগ ছিল ক্রীতদাস, স্ত্রীলোক ও মজুর শ্রেণীর লোক। ইহাদের বর্জন করিয়া পূর্ণবয়স্ক স্বাধীন নাগরিকগণই আইনসভার সদস্যরূপে রাষ্ট্রপরিচালনা-কার্যে অংশ গ্রহণ করিত। শুধু নাগরিকদের সম্পর্কে গ্রীক শাসন-ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক বলা হইত। সুতরাং প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের (Direct Democracy) বৈশিষ্ট্য হইল প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক স্বাধীন ব্যক্তির রাষ্ট্রপরিচালনায় অংশ গ্রহণ। তাহারা একত্রে মিলিত হইয়া আইন-প্রণয়ন ও কর ধার্য করিত। আধুনিককালে সুইস দেশের চারিটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্যান্টনে এই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলবৎ দেখা যায়। এই

শাসন-ব্যবস্থায় আইনানুগ সার্বভৌম ও রাজনৈতিক সার্বভৌমের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।

বর্তমান রাষ্ট্রগুলি আয়তনে ও লোকসংখ্যায় নগর-রাষ্ট্র হইতে বহুগুণ বৃহত্তর। ইহাদের সমস্যাগুলি অনেক বেশী জটিল। লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে একত্রিত হইয়া শাসন পরিচালনা-কার্যে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করা বর্তমান যুগে সম্ভব নয়। ইহা ছাড়া, সাধারণ নাগরিকদের সেরূপ অপর্যাপ্ত সময়ও নাই, যোগ্যতাও নাই। সেইজন্য আধুনিককালে পরোক্ষ গণতন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। পরোক্ষ গণতন্ত্রের (Indirect or Representative Democracy) বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই শাসন-ব্যবস্থায় আইনানুগ সার্বভৌম ও রাজনৈতিক সার্বভৌম, একে অপর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। পরোক্ষ-গণতন্ত্রে পূর্ণবয়স্ক ও নির্দিষ্ট যোগ্যতার অধিকারী জনগণ একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া শাসন-ব্যবস্থা এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হস্তে ন্যস্ত করে। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সরকার গঠন করিয়া নির্বাচকমণ্ডলীর মতানুযায়ী শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করে। শাসন-কর্তৃপক্ষের কার্যে যদি নির্বাচকমণ্ডলী সন্তুষ্ট না হয় তাহা হইলে নির্দিষ্ট কার্যকাল অতিবাহিত হইলে নির্বাচকমণ্ডলী নূতন শাসন-কর্তৃপক্ষ গঠন করিতে পারে। এইরূপে জনসাধারণ পরোক্ষভাবে শাসন-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং কোন শাসন-ব্যবস্থাই শুধুমাত্র ভোট দ্বারা প্রকাশিত জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেই গণতন্ত্র আখ্যা পাইতে পারে না। জনগণের এই সম্মতি সক্রিয় ও সদা-জাগ্রত হওয়া চাই। যে সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ সক্রিয়ভাবে শাসন-ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, একমাত্র সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক আদর্শ সার্থক হয়। বর্তমান গণতন্ত্র সম্পর্কে আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। বর্তমানে গণতন্ত্র বলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসন বুঝায়। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন হইলেও এই শাসন-ব্যবস্থায় সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের মতামত উপেক্ষিত হয় না। তাহারা নির্ভয়ে তাহাদের আইনসম্মত অধিকার ভোগ করিতে পারে।

গণতন্ত্র—স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী—Democracy—Liberty, Equality and Fraternity.

এখন দেখা যাউক গণতন্ত্র কি? বর্তমানে গণতন্ত্রের যে সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ধারিত হইয়াছে তদনুসারে জনগণের কল্যাণে জনগণ দ্বারা পরিচালিত জনগণের শাসন গণতন্ত্র নামে অভিহিত হয়। স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী হইল গণতন্ত্রের আদর্শ এবং এই আদর্শত্রয় জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। স্বাধীনতা ও সাম্য এই দুইটি গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য শর্ত এবং এই দুইটি আদর্শের পূর্ণ পরিণতি হইল মৈত্রী বা ভ্রাতৃভাব।

আধুনিক গণতন্ত্রের শাসন কাঠামোর বৈশিষ্ট্যগুলি হইল: প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচন দ্বারা পরোক্ষ গণশাসন প্রতিষ্ঠা, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, দায়িত্বশীল সরকার, ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে পরিবর্তন (alternation of power) এবং ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার সাহায্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ।

দেশের আইনানুসারে নির্ধারিত প্রাপ্তবয়স্ক ভোটদাতাগণের দ্বারা আঞ্চলিক ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মধ্যে যাঁহারা দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচনের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন তাঁহারা সরকার গঠন করিয়া দলের সমর্থনে শাসনকার্য পারিচালনা করেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বিরোধী দল হিসাবে সরকারের সমালোচনা করিয়া জনমত জাগ্রত রাখে। সরকার গঠনকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ইহার জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের ফলে জনসমর্থন হারাইলে বিরোধী দল পুনঃনির্বাচনের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া বিকল্প সরকার গঠন করে। সুতরাং এই শাসন-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হইল জনসমর্থন। এই শাসন-ব্যবস্থায় সরকার যে শুধু জনগণ অথবা তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের নিকট দায়ী তাহা নহে, এই শাসন-ব্যবস্থায় কোন রাজনৈতিক দলই দীর্ঘস্থায়ী হইয়া দলীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বারা গণতন্ত্রের স্বাভাবিক ও সাবলীল গতি রুদ্ধ করিবার সুযোগ পায় না। গণতন্ত্রের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হইবার অর্থ হইল গণতন্ত্রের অপমৃত্যু। ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ক্ষমতাসীন দলের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া গণতান্ত্রিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

গণতন্ত্র হইল জনগণের শাসন। সুতরাং যত অধিক সংখ্যায় ও অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে জনগণকে শাসন-ব্যবস্থার সহিত যুক্ত করা যায়, গণতন্ত্র হয় তত

ব্যাপক। গণতন্ত্রের নীতি হইল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation of Power)। বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ হইল কেন্দ্রীয় সরকার ব্যতীত নানা স্তরের স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান গঠন এবং এই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্থানীয় শাসন ব্যাপারে আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বারা স্বাবলম্বী ও দায়িত্বশীল করিয়া তোলা। কেন্দ্রীয় পরামর্শ ও কেন্দ্রীয় সাহায্য কাম্য হইলেও এই স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকাই হইল গণতন্ত্র-সম্মত নীতি। মানুষের রাজনৈতিক জীবনে স্বাধীনতা ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠাও সুরক্ষিত করাই হইল প্রকৃত গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য।

উপরে গণতন্ত্রের যে রূপরেখার বর্ণনা দেওয়া হইল তাহা শুধু গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোর একটি চিত্র। এই গণতান্ত্রিক কাঠামোর অন্তরালে অ-গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, গণতন্ত্র-বিরোধী অর্থনৈতিক ও বিচার ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিয়া সামগ্রিকভাবে গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের ও সাফল্যের অন্তরায় ঘটায়। সুতরাং সমাজব্যবস্থায়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও দেশের বিচার ব্যবস্থায় যাহাতে স্বাধীনতা ও সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সাহায্যে সে পরিবেশ সৃষ্টি না হইলে শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জন প্রতি এক ভোট প্রবর্তিত করিয়া স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না অর্থাৎ পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা-বিহীন স্বাধীনতা ও সাম্য অর্থহীন।

গণতন্ত্রে সামাজিক ক্ষেত্রে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-স্ত্রী-পুরুষ ও সংগতি নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তিসত্তার সমান স্বীকৃতি, মূল্য ও মর্যাদা প্রদান করা হয় এবং ইহার ফলে আত্ম ও পর অধিকার সম্পর্কে সম-অনুভূতিশীল এক বলিষ্ঠ মানবগোষ্ঠী জন্মলাভ করে। সকলেই যদি সমান স্বাধীনতা ও সমান সুযোগ পায় তাহা হইলে সকলেই পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে সম-অনুভূতিশীল হয়। ইহার ফলে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্বভাবজাতভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

সমাজব্যবস্থায় স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠার অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্যকর করা পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের তাৎপর্য হইল কাজ করিয়া জীবিকা অর্জনের অধিকার। গণতন্ত্রে সকলেই কাজ করিয়া গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে জীবিকা অর্জনের সুযোগ পায়। গণতন্ত্রে ব্যক্তিমাত্রই অনশন,

বেকার ও সহানুভূতিহীন মালিকের ভয়মুক্ত থাকিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া সমাজকে উপকৃত করিতে পারে এবং প্রতিদানে সমাজও ব্যক্তিকে তাহার কাজের ন্যায্য মূল্য প্রদান করিতে কার্পণ্য করে না। অর্থনৈতিক গণতন্ত্র হইল সেই ব্যবস্থা যে ব্যবস্থার ফলে সমাজে সকলের জন্য পর্যাপ্তের ব্যবস্থা না হওয়ার পূর্বে মুষ্টিমেয় লোক অনাবশ্যক আধিক্যের অধিকারী হইতে পারিবে না। ("There must be sufficiency for all before there is superfluity for the few.")

গণতন্ত্রের আর একটি অপরিহার্য শর্ত হইল যে, এই ব্যবস্থায় সকলেরই সমভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুবিচার পাইবার অধিকার স্বীকৃত ও সুরক্ষিত করা হয়। গণতন্ত্রে বিচার ব্যবস্থা এরূপভাবে পরিকল্পিত ও পরিচালিত হয় যে, ধনী ও নির্ধন, অভিজাত ও অনভিজাত সকলেই প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থাবান থাকিয়া সমভাবে সুবিচার পাইতে পারে। ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায় যেন অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের ন্যায় অধিকতর সুবিচার ক্রয় করিতে না পারে।

এতদ্ব্যতীত গণতন্ত্রের আর একটি রূপ আছে যাহার অবর্তমানে গণতন্ত্র অসম্পূর্ণ থাকে। এই রূপটি হইল ইহার পররাষ্ট্র সম্পর্কিত অথবা আন্তর্জাতিক রূপ। গণতন্ত্র হইল স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর স্রষ্টা ও রক্ষক। যে গণতন্ত্র স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর স্রষ্টা ও রক্ষক হিসাবে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সাহায্যে ব্যক্তিসত্তার চরম বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির দাবি রাখে সেই গণতন্ত্রের পক্ষে পররাষ্ট্র সম্পর্কে যুদ্ধবাদ নীতি গ্রহণ করিয়া সভ্যতা বিধ্বংসী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া মারাত্মক গণতন্ত্র বিরোধী কার্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যে গণতন্ত্র পররাষ্ট্রের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রতি উদাসীন সে গণতন্ত্র আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা ও সাম্যের রক্ষক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সুতরাং গণতন্ত্র ও যুদ্ধবাদ পরস্পর-বিরোধী, কারণ গণতন্ত্র হইল সৃষ্টিকামী (creative) আর যুদ্ধবাদ হইল ধ্বংসাত্মক (Destructive)। দেশের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র যেরূপ সাম্যের ভিত্তিতে সকলের জন্য সমানাধিকার সৃষ্টি করিয়া মৈত্রী স্থাপন করিতে সাহায্য করে আন্তর্জাতিক জীবনেও তদ্রূপ সাম্যের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল রাষ্ট্রের সমানাধিকার সৃষ্টি দ্বারা বিশ্ব-মৈত্রী স্থাপনে সাহায্য করে।

গণতন্ত্রের গুণ—Merits of Democracy.

অধুনা গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহার প্রথম কারণ হইল যে, এই শাসনব্যবস্থায় শাসকগোষ্ঠী শাসিতের নিকট দায়ী থাকে। ইহাতে স্বৈরাচারের সম্ভাবনা দূরীভূত হয়। জনগণ দ্বারা নির্বাচিত ও জনগণের নিকট দায়ী বলিয়া শাসন-কর্তৃপক্ষকেও সর্বদা সতর্ক থাকিয়া সুদক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, এই শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকই তাহার ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিবার সুযোগ পায়। জনস্বার্থ এই শাসনব্যবস্থায় যেরূপভাবে সংরক্ষিত হয়, অন্য কোন শাসনব্যবস্থায় তাহা সম্ভব হয় না।

তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্র প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দিয়া তাহার ব্যক্তিত্ববিকাশের সহায়তা করে। প্রত্যেক ব্যক্তিই ভাবিতে শিখে যে, সে রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য অংশ। এই মনোভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া জনগণ দেশকে ভালবাসিতে শিখে এবং তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ফলে, তাহাদের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয়।

চতুর্থতঃ, এই শাসনব্যবস্থায় সমষ্টিগত জীবনের সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণ সাধিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—এই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নিজ সামর্থ্যমত সমষ্টিগত কল্যাণসাধনে সাহায্য করে। ফলে, ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়েই লাভবান হয়।

পঞ্চমতঃ, এই শাসনব্যবস্থা মানুষের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীর ভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানুষে মানুষে ভেদ দূর করিতে সাহায্য করে। কোন ব্যক্তিবিশেষের বা দলবিশেষের শাসন স্থায়ী হইতে পারে না। লর্ড ব্রাইসের মতে এই শাসনব্যবস্থার প্রধান কৃতিত্ব হইল যে, মূঢ় ও মূক জনগণকে ভোটদান ক্ষমতা প্রদানপূর্বক ইহা তাহাদিগকে স্ব স্ব অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে আত্মসচেতন করিয়া তাহাদের মনুষ্যত্ববিকাশে সাহায্য করে।

গণতন্ত্রের দোষ—Demerits.

গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইলেও ইহা একেবারে

দোষবিমুক্ত নয়। গণতন্ত্রের বিপক্ষে অনেক যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, বলা যায়, গণতন্ত্র সংখ্যাধিক্যের উপরই গুরুত্ব আরোপ করে, গুণের উপর নয়। গণতন্ত্র সাম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শাসন-ব্যবস্থায় 'জন প্রতি এক ভোট' এই নীতি প্রবর্তিত হইয়া যোগ্যতার সমাদর হ্রাস পাইয়াছে। ফলে, এই শাসনব্যবস্থা অক্ষম বিকৃত গণতন্ত্রে পর্যবসিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, গণতন্ত্র বলিতে সংখ্যাধিক্যের শাসন বুঝায়। আর এই সংখ্যাধিক্য গঠিত হয় অক্ষম ও অশিক্ষিত লোকের দ্বারা। সুতরাং অক্ষম ও অশিক্ষিত লোক দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা কখনই সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্রকর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে না। এই ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের আদর্শ ক্ষুণ্ন হয়।

তৃতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় কোন শ্রেণীবিভাগ স্থান পায় না। সকল মানুষই সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, গণতন্ত্রের কার্য পরিচালিত হয় মুষ্টিমেয় চতুর ও বিবেকবর্জিত লোক দ্বারা। ইহারা ছলে-বলে-কৌশলে অজ্ঞ জনসাধারণের ভোট সংগ্রহ করিয়া প্রধানতঃ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে।

চতুর্থতঃ, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সার্বজনীন কল্যাণের জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, যে সম্প্রদায় বা যে-দল সংখ্যাধিক্যের জোরে শাসন-ক্ষমতা অধিকার করিয়াছে তাহারাই নিজেদের সুবিধার জন্য আইন প্রণয়ন করে। সুতরাং এইরূপ আইনের দ্বারা সার্বজনীন স্বার্থ সংরক্ষিত না হইয়া দলগত স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

পঞ্চমতঃ, মেইন, লেকি প্রমুখ লেখকগণ ইহার কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে গণতন্ত্র অধ্যাত্ম জীবনের উৎকর্ষের প্রতিকূলতা করে। সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি যেগুলির চর্চা অধ্যাত্ম জীবনগঠনের সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হয়, সেগুলি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সমাদৃত হয় না। অজ্ঞলোক পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত জ্ঞান ও গুণের বিকাশ সম্ভব হয় না।

ষষ্ঠতঃ, এই শাসনব্যবস্থার প্রধান দোষ হইল যে, ইহা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। নির্বাচকদের ইচ্ছার উপর এই শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্ব নির্ভর করে,

সুতরাং নির্বাচকমণ্ডলীর খুশিমত সরকার পরিবর্তিত হয়। স্বল্পকালস্থায়ী সরকার কোন সুদূরপ্রসারী নীতি বা জনহিতকর গঠনমূলক কার্য করিতে পারে না। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌ল্ ইহাকে বিকৃত গণতন্ত্র আখ্যা দিয়াছিলেন। আধুনিককালে ওয়েল্‌স্ বলেন যে, এই শাসনব্যবস্থা এত ভঙ্গুর যে, ইহাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বিনষ্ট করা যায়।

পরোক্ষ গণতন্ত্রব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ —Methods of Direct Democracy as applied to Indirect Democracy.

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কাল হইতে গণতন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের আস্থা হ্রাস পাইতে থাকে। নানাকারণে গণতন্ত্রের ভিত্তি শিথিল হইতে থাকে। প্রথম কারণ হইল, নির্বাচনের পর নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কার্য করেন। দ্বিতীয়তঃ, অবস্থার পরিবর্তনে জনমত এত দ্রুত পরিবর্তিত হয় যে, নির্বাচিত প্রতিনিধির পক্ষেও সকল সময়ে জনমতের সহিত সমান গতিতে চলিয়া তাহাদের মতের মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এতদ্ব্যতীত শিক্ষাবিস্তারের ফলে জনমতও অনেকটা সুসংবদ্ধ ও সুশিক্ষিত হইয়া প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত কারণে অনেক দেশেই আইন-প্রণয়নে ও শাসনকার্যে জনগণ যাহাতে প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে, সেজন্য কতকগুলি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। এই উপায়ে জনগণ শাসনব্যবস্থায় প্রতিনিধিগণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া মিলিতভাবে তাহাদের মতামত কার্যকর করিবার সুযোগ পাইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ড, স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের শাসনতন্ত্রে এই প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থান পাইয়াছে। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চারিটি প্রকারভেদ হইতে পারে, যথা—

গণনির্দেশাধিকার—Refereudum.

ইহার অর্থ হইল যে, কতকগুলি ক্ষেত্রে আইনের খসড়াকে চূড়ান্তভাবে আইনে পরিণত করিতে হইলে সে খসড়া-আইন জনগণের সংখ্যাধিক্য

দ্বারা অনুমোদিত হওয়া চাই। আইনসভা কর্তৃক প্রবর্তিত খসড়া-আইন জনসাধারণের নিকট বিবেচনার্থে প্রেরিত হয়। যদি জনসাধারণ অধিক ভোটে খসড়াটি সমর্থন করে তাহা হইলে সেটি আইনে পরিণত হয়। আইন-সভার আর পৃথক অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। জনগণের এই নির্দেশ অধিকার বাধ্যতামূলক (Compulsory) বা ঐচ্ছিক (Optional) হইতে পারে। কোন্ কোন্ বিষয়ে এই নির্দেশাধিকার বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহৃত হইবে শাসনতন্ত্রে তাহার উল্লেখ থাকে। সাধারণতঃ শাসনতান্ত্রিক আইনের সংশোধন, বা গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ আইন, বা অর্থ-সংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রে এই অধিকার বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা হয়। ঐচ্ছিক গণনির্দেশ গ্রহণ করা হয় তখনই যখন (ক) একটি নির্দিষ্টসংখ্যক নির্বাচক এই অধিকার দাবী করে, অথবা (খ) আইনসভার একাংশ ইহার দাবী করে, বা (গ) শাসন-পরিষদ্ এই দাবী করে।

গণ-প্রস্তাব অধিকার—Initiative.

অনেক সময় আইনসভা হয়ত কোন বিষয়ে আইন-প্রণয়ন করিতে অনিচ্ছুক বা উদাসীন থাকিতে পারে। সেইজন্য জনগণই আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে অগ্রণী হয়। নির্বাচকমণ্ডলী যদি কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন মনে করে, তাহা হইলে তাহারা সেই আইনের একটা খসড়া আইনসভায় বিবেচনার্থ পাঠাইতে পারে। আইনসভা সেই খসড়া নির্বাচক-মণ্ডলীর নিকট বিবেচনা করিবার জন্য পুনরায় পাঠাইতে পারে। যদি জন-সাধারণ সেই খসড়াটি ভোটাধিক্যে অনুমোদন করে তাহা হইলে তাহা আইনে পরিণত হইবে। আইন-প্রণয়নের এই সরাসরি অধিকার দুই প্রকারের হইতে পারে। নির্বাচকমণ্ডলী যে খসড়া-আইনটি আইনসভার নিকট পেশ করিবে, সেটি যদি পূর্ণাঙ্গ হয় অর্থাৎ বিস্তারিত বিবরণ-সমন্বিত হয় তাহা হইলে তাহাকে সুপরিকল্পিত গণ-প্রস্তাব বা Formulated Initiative বলা হয়। বিস্তারিত বিবরণবর্জিত আইনের প্রস্তাবকে অসম্পূর্ণ প্রস্তাব বা Unformulated Initiative বলা হয়। সুইজারল্যাণ্ডে শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাপারে উপরি-উক্ত দুই প্রকারের গণ-প্রস্তাব প্রয়োগ করা হয়। পঞ্চাশ হাজার ভোটদাতা মিলিতভাবে যদি শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তনের

কোন প্রস্তাব করে, আর এই প্রস্তাবটি যদি বিস্তারিত বিবরণ-সমন্বিত খসড়া আকারে আইনসভার নিকট পেশ হয় তাহা হইলে ইহাকে সুপরিকল্পিত প্রস্তাব বলা হয়।

গণভোট—Plebiscite.

গণভোট অনেকটা গণনির্দেশাধিকারের অনুরূপ। গণভোট দ্বারা শাসন-কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করিবার নিমিত্ত জনমত গ্রহণ করে। সাধারণতঃ শাসনবিভাগীয় সমস্যার সমাধানকল্পে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে জনমত গ্রহণ করা হয় গণ-নির্দেশাধিকারের মাধ্যমে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবিভাগের সময় আসাম রাজ্যের শ্রীহট্ট জেলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইবে, না পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইবে, ইহা নির্ণয়ের জন্য গণভোট গ্রহণ করা হইয়াছিল।

প্রত্যাবর্তনের আদেশ—Recall.

কোন কোন দেশে ভোটদাতৃগণ যদি নির্বাচিত প্রতিনিধির আচরণে সন্তুষ্ট না হন বা নির্বাচিত প্রতিনিধি যদি তাঁহার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে ভোটদাতৃগণ তাঁহার পদত্যাগ দাবী করিতে পারেন। পুনর্বার ভোট গ্রহণ করিয়া এই প্রত্যাবর্তনের দাবী কার্যকরী করা হয়। ঐ প্রতিনিধিকে অপসারিত করিতে হইলে কিছু সংখ্যক ভোটদাতা তাঁহার অপসারণের দাবী করিবেন এবং যদি ভোটদাতৃগণ দ্বিতীয়বার ভোটে তাঁহাকে নির্বাচন না করিয়া অন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করেন তাহা হইলে তাঁহাকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পদত্যাগ করিতে হইবে।

উপরি-উক্ত উপায়গুলি গণতন্ত্রের সাফল্য সূচিত করে। এই উপায়গুলির মধ্যে গণনির্দেশাধিকার ও গণ-প্রস্তাব-অধিকার গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সমধিক সাহায্য করিয়াছে। এই গণতান্ত্রিক উপায়গুলি সুইস দেশে বহুদিন হইতে কার্যকরী করা হইয়াছে ও সুইস আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অধুনা স্বাধীন আয়ার প্রভৃতি দেশ ইহার অনুকরণ করিয়াছে। গণনির্দেশ ও গণ-প্রস্তাব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি অন্যটির পরিপূরক। গণ-প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হইল অপ্রস্তাবিত আইনের সূচনা করা আর গণনির্দেশের উদ্দেশ্য

হইল প্রস্তাবিত আইনকে না-মঞ্জুর করা। আইনসভা যে আইন প্রণয়ন করিতে অনিচ্ছুক, গণ-প্রস্তাব আইনসভাকে সেই জাতীয় আইন প্রণয়ন করিতে বাধ্য করে। অপরপক্ষে জনমতের বিরুদ্ধে যদি আইনসভা কোন আইন জনগণের উপর প্রবর্তিত করিতে উদ্যোগী হয়, তাহা হইলে গণনির্দেশ প্রয়োগ করিয়া সেরূপ আইনকে কার্যকরী করিতে দেওয়া হয় না। সুতরাং উভয় পদ্ধতিই জনমতের বিজয় ঘোষণা করে।

গণতান্ত্রিক উপায়গুলির গুণাগুণ—Merits and Demerits of the Direct Methods)

গণতান্ত্রিক উপায়গুলির প্রধান গুণ হইল যে, উহারা সাধারণ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ব্যক্তিকেও শাসনকার্যে অধিকতর উৎসাহী করিয়া তাহাকে তাহার অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে। জনগণ যদি তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে সতত সজাগ থাকে, তাহা হইলে আইনসভা বা শাসন-কর্তৃপক্ষ তাহাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হয় না। কোন কায়েমী স্বার্থ বা দলবিশেষ তাহাদের স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে কোন আইন প্রবর্তন করিতেও পারে না।

কিন্তু এই উপায়গুলি সম্পূর্ণ দোষবিমুক্ত নহে। আইন-প্রণয়নে বা শাসনকার্যে এই উপায়গুলি অবলম্বিত হইলে আইনসভার বা শাসন-কর্তৃপক্ষের আর কোন দায়িত্ব থাকে না। আইনসভা একটি বিতর্কসভায় পরিণত হয়, ফলে আইন-প্রণয়নে অনেক গলদ থাকিয়া যায়। বর্তমানকালে শাসনব্যবস্থায় এত বিভিন্ন প্রকারের জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে যে, সে সমস্যাগুলির সমাধান করিবার মত শিক্ষা, বুদ্ধি ও জ্ঞান সাধারণ লোকের নিকট হইতে আশা করা যায় না। আইন-প্রণয়ন ব্যাপারেও সূক্ষ্ম জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। সেইজন্য কি শাসনব্যাপারে, কি আইন-প্রণয়সে অভিজ্ঞ ও কর্মপটু লোকের প্রয়োজন। গণপ্রবর্তিত আইন সকল সময়ে জনহিতকর নাও হইতে পারে। ক্ষুদ্রকায় সুইস দেশে এই প্রদ্ধতিগুলি কার্যকরী হইয়াছে বলিয়া বৃহদায়তনের অন্য দেশেও যে কার্যকরী হইবে তাহার আদৌ কোন নিশ্চয়তা নাই।

গণতন্ত্রের সাফল্যের উপাদান—Conditions essential for the success of Democracy.

গণতন্ত্র একটি বিশেষ প্রকারের শাসনব্যবস্থা, যে ব্যবস্থা সার্বজনীন অধিকারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রাজতন্ত্রে, অভিজাততন্ত্রে বা একনায়ক তন্ত্রে এক ব্যক্তির হস্তে অথবা মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে; কিন্তু গণতন্ত্রে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় জনসাধারণের দ্বারা। সুতরাং গণতন্ত্রের সাফল্য যে জনসাধারণের বিচারবুদ্ধি, দায়িত্ববোধ ও কর্মদক্ষতার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে একথা সহজেই অনুমেয়। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মতে গণতন্ত্রের সাফল্য তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: প্রথমতঃ, দেশের জনসাধারণের শাসনকার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার মত সামর্থ্য ও ইচ্ছা থাকা চাই। দ্বিতীয়তঃ, নাগরিক অধিকার রক্ষাকল্পে জনসাধারণের সর্বদা সজাগ থাকিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, জনসাধারণকে তাহাদের নাগরিক কর্তব্য পালনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গণতন্ত্রের সাফল্য অনেক পরিমাণে নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করিবার দৃঢ়সংকল্প ও কর্তব্য-পালনে তৎপরতা—এই দুইটি গুণের উপর নির্ভর করে। নাগরিকগণ যদি তাহাদের কর্তব্য-পালনের কথা ভুলিয়া গিয়া শুধু অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্র কার্যকর হইতে পারে না। অপরপক্ষে, নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে যদি তাহারা সতর্ক না হয় তাহা হইলে গণতন্ত্র ধীরে ধীরে অভিজাততন্ত্র বা একনায়তকতন্ত্রে পর্যবসিত হইতে পারে। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্য জনগণের অধিকার রক্ষার দৃঢ় সংকল্প ও কর্তব্য-পালনের ঐকান্তিক ইচ্ছার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। যেখানে জনগণ রাজনৈতিক ব্যাপারে উদাসীন এবং রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে নির্বাক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে, সেখানে গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রে পর্যবসিত হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব। এই মনোভাবের অবর্তমানে গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না। জাতি-ধর্ম-ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলকেই সাধারণ হিতার্থে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। গণতন্ত্রের সাফল্যের আর একটি আবশ্যিক উপাদান

হইল জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতা ও আপসমূলক মনোভাব। সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ দল যদি এইরূপ মনোভাব দ্বারা পরিচালিত না হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্রের মূল আদর্শ ব্যাহত হয়। এজন্য চাই বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন শিক্ষিত নাগরিক। সু-শিক্ষার বিস্তার ব্যতীত সু-নাগরিকের সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার করিয়া তাহাদের মধ্যে কর্তব্যবুদ্ধি ও বিচারবোধ সঞ্চারিত করিতে হইবে। গণতন্ত্রের ভিত্তি হইল জনমত। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা জনমতকে সুসংবদ্ধ ও শিক্ষিত করিতে পারিলে গণতন্ত্র পরিচালনার আর অন্তরায় থাকিতে পারে না।

বর্তমান যুগে ল্যাস্কি প্রমুখ অনেক লেখকের মতে অর্থনৈতিক সাম্যের অভাব গণতন্ত্রের সাফল্যের পথে একটা প্রধান অন্তরায় বলিয়া পরিগণিত হয়। ধনবন্টন-ব্যবস্থায় অত্যধিক বৈষম্য থাকিলেও গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না। সুতরাং গণতন্ত্র যাহাতে সফল হইতে পারে সেজন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে সকলে যাহাতে সমান অধিকার পায় তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ—Future of Democracy.

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে নানা কারণে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উপর জনসাধারণের আস্থা হ্রাস পাইয়াছিল। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যুদ্ধোত্তরকালীন অবস্থায় কোন দেশেই জাতীয় জটিল সমস্যাসমূহের সন্তোষজনক সমাধান করিতে সক্ষম হয় নাই। সেজন্য কোন কোন দেশে একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব হয়। অপরপক্ষে, কোন কোন রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণ গণ-প্রস্তাব, গণনির্দেশ, গণভোট প্রভৃতি অধিকারগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয়। এই সমস্ত কারণে লোকের মনে স্বভাবতঃই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। কিন্তু উপরি-উক্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভুল বলিয়া বর্তমানে প্রমাণিত হইয়াছে। একনায়কতন্ত্র একটা সাময়িক পরিবর্তন মাত্র। কোন দেশেই একনায়কতন্ত্র চিরস্থায়ী হইতে পারে না। আধুনিককালে জার্মানি ও ইতালী ইহার

প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের একনায়কতন্ত্র অনেকদিন হইতে জনকল্যাণের অনুকূল বলিয়া আজও পর্যন্ত তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। পৃথিবীতে বিভিন্ন যুগে স্বৈরতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, ধনতন্ত্র, প্রভৃতি শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় মানুষের সাধারণ অধিকারগুলি যেভাবে স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হইয়াছে অন্য কোন শাসনব্যবস্থায় তাহা সম্ভব হয় নাই। সত্য বটে গণতন্ত্র এখনও পর্যন্ত মানুষকে সম্পূর্ণরূপে অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয় নাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বলিতে হইবে এই শাসনব্যবস্থা পূর্বতন শাসনব্যবস্থাসমূহ হইতে নানাদিক দিয়া উৎকৃষ্টতর। বার্ণস্ তাঁহার 'Democracy' নামক পুস্তকের একস্থলে বলিয়াছেন যে, মোটরগাড়ী সব সময়ে ভাল কাজ করে না বলিয়া গো-যান ব্যবহার করা যেরূপ নির্বোধের কার্য, আধুনিক গণতন্ত্রের দোষ-ত্রুটির জন্য গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিহার করিয়া ভিন্ন জাতীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা তদ্রূপ নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আসল কথা হইল আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষসাধন করা। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে প্রথমতঃ ধনতান্ত্রিক প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া ইহার প্রকৃত সার্বজনীন রূপ কার্যকর করা একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। গণতন্ত্রের মূল কথা হইল স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব। সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই নীতি কার্যকরী না হওয়া পর্যন্ত গণতন্ত্র সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যদি গণতান্ত্রিক নীতি প্রযুক্ত না হয় তাহা হইলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'জন প্রতি এক ভোট' নীতির দ্বারা প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সুতরাং সমাজ-জীবন মহত্তর করিবার উদ্দেশ্যে গণতন্ত্রের সাফল্য একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু জনসাধারণ উপলব্ধি করিয়াছে যে, একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই ব্যক্তিত্ববিকাশের চরম সুযোগ প্রদান করিতে পারে। তাই আজ পৃথিবীর সর্বত্র গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার জন্য গণদাবী উত্থিত হইয়াছে। এই দাবী প্রতিরোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। সুতরাং গণতন্ত্রের জয় অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী।

প্রাচীনকালে গণতন্ত্র ও আধুনিক গণতন্ত্র—Ancient and Modern Democracies.

প্রাচীন যুগেও গণতন্ত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রীক ও রোমকগণের গণতন্ত্র সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধারণা ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগের গণতন্ত্র প্রাচীনকালের গণতন্ত্র হইতে অনেক বিষয়ে পৃথক্।

প্রথমতঃ, প্রাচীন যুগের গণতন্ত্র ছিল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। পূর্ণবয়স্ক স্বাধীন নাগরিকগণ শাসনব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিত। কিন্তু বর্তমান যুগের গণতন্ত্র হইল পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক। পূর্ণবয়স্ক নাগরিকগণ বর্তমান যুগে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া তাহাদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন রাষ্ট্রগুলি ছিল ক্ষুদ্রকায় নগর-রাষ্ট্র। আয়তনে ও লোকসংখ্যায় বর্তমান রাষ্ট্র অপেক্ষা সেগুলি বহুগুণে ক্ষুদ্রতর ছিল। নাগরিকগণ যাহাতে শাসনকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিতে পারে, সেজন্য জনসংখ্যা নির্ধারিত করা হইত। বর্তমান রাষ্ট্র আয়তনে ও লোকসংখ্যায় বিশালকায়। সুতরাং বর্তমান রাষ্ট্রের আয়তন বা লোকসংখ্যা সংকুচিত করিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

তৃতীয়তঃ, প্রাচীনকালে রাষ্ট্রের মুষ্টিমেয় বিশ্রামভোগী, পরজীবী অভিজাতসম্প্রদায় নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইত ও তাহারাই নাগরিক সুখ-সুবিধার অধিকারী ছিল। স্ত্রীলোক, মজুর-সম্প্রদায় ও ক্রীতদাসগণ পরনির্ভরশীল বলিয়া নাগরিক অধিকারে বঞ্চিত ছিল। বর্তমান গণতন্ত্রে মানুষে মানুষে এতটা ভেদ দেখা যায় না। সকলেরই সমান নাগরিক অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয়।

চতুর্থতঃ, প্রাচীনকালের গণতন্ত্রে রাষ্ট্রকে ব্যক্তির উপর স্থান দেওয়া হইত। ব্যক্তি রাষ্ট্রের একটি অকিঞ্চিৎকর অংশ বলিয়া পরিগণিত হইত। সুতরাং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ব্যক্তিকে রাষ্ট্রবেদীমূলে বলি দেওয়া হইত। রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যক্তি-স্বাধীনতা কখনও স্বীকৃত হয় নাই। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব শুধু রাষ্ট্রের জনকল্যাণ-ক্ষমতার দ্বারাই সমর্থিত হয়।

পঞ্চমতঃ, প্রাচীন যুগের গণতন্ত্রে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন পার্থক্য

করা হইত না। বর্তমান যুগে এই পার্থক্য সুস্পষ্ট। এখন সরকার শুধু রাষ্ট্রপ্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালনা করে।

পরিশেষে বলা যায়, প্রাচীন যুগের গণতন্ত্রগুলিকে প্রকৃত গণতন্ত্র বলিয়া অভিহিত করা যায় না। যে গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের অধিকাংশ অধিবাসী একটি নিকৃষ্ট স্তরের জীব বলিয়া পরিগণিত হইত, যে শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন স্থান ছিল না, তাহাকে বর্তমান গণতন্ত্রের মাপকাঠিতে প্রকৃত গণতন্ত্র বলা যায় না। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে বর্তমানে গণতন্ত্রের অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্রের সকল স্থায়ী অধিবাসীই নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হয় ও বর্তমান গণতন্ত্র সর্ববিধ উপায়ে নাগরিক অধিকার রক্ষাকল্পে তৎপর থাকে।

একনায়কতন্ত্র—Dictatorship.

একনায়কতন্ত্র-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন যে, একনায়কতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র সমধর্মী। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাহা নয়। একনায়কতন্ত্রের আলোচনা করিলে এই সত্যটি উপলব্ধি করা যাইবে। বিগত প্রথম মহাসমরের পরবর্তী কালে একনায়কতন্ত্রের অভ্যুদয় হয়। যুদ্ধোত্তরকালে ইয়ুরোপের কয়েকটি দেশের পরিস্থিতির এত অবনতি ঘটে যে, ঐ সমস্ত দেশে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সর্বত্র বেকার-সমস্যা, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির আত্মনির্ধারণ-অধিকার প্রভৃতি সমস্যাগুলির সমাধানে তৎকালীন সরকারগুলির অক্ষমতা প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত অনেক দেশে বহু রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকায় রাষ্ট্রনায়কেরা তাঁহাদের দলীয় নীতি বিসর্জন দিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার জন্য একমত হইতে পারেন না। আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার জন্য শাসনব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে। ফলে, জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। লোকের ধারণা জন্মে যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আর অবস্থার উন্নতি করিতে সক্ষম নয়। দেশের এই পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব হয়। যুদ্ধোত্তরকালে অনেক দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও

অর্থনৈতিক অবস্থার এত দ্রুত অবনতি ঘটে যে, একনায়কতন্ত্র একান্ত অপরিহার্য হইয়া উঠে।

একনায়কতন্ত্র তিন প্রকারের হইতে পারে, যথা সামরিক (Military), সাম্যবাদী (Communist) ও ফ্যাসিবাদী (Fascist)। সামরিক একনায়কতন্ত্র বহু পুরাতন হইলেও বর্তমান যুগেও এই শাসনব্যবস্থা লোপ পায় নাই। যখনই সেনাবাহিনীর কোন অধিনায়ক সৈন্যগণের সাহায্যে শাসনক্ষমতা হস্তগত করিয়া সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করেন তখন এই শাসনব্যবস্থাকে সামরিক একনায়কতন্ত্র বলা হয়। ফরাসী দেশে নেপোলিয়নের শাসন, স্পেন দেশে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর শাসন ও অতি আধুনিককালে পাকিস্তানে ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের শাসন ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

একনায়কতন্ত্রের মূলনীতি হইল একজাতি, একরাষ্ট্র ও একনায়ক। একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা একক নেতার হস্তে কেন্দ্রীভূত হয় ও রাষ্ট্রের সকল কার্যকলাপ একক নায়কের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রের বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলিকে যে-কোন উপায়েই হউক একত্রিত করিয়া দেশকে একটা উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইতে একনায়কতন্ত্র সাহায্য করে। একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার অধীনে একটিমাত্র দল থাকে ও নেতা হইলেন দলের সর্বময় কর্তা। দেশে অন্য কোন রাজনৈতিক দল থাকিতে দেওয়া হয় না—বলপ্রয়োগ করিয়া অন্য দলগুলিকে বিনষ্ট করা হয়।

অবাধ দলীয় কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠার জন্য দলের নেতা ব্যক্তির সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন। এই উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষা, সাহিত্য, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, বেতার প্রভৃতি সব কিছুই রাষ্ট্রকর্তৃক পরিচালিত হয়। একনায়কতন্ত্রের অধীনে ব্যক্তিগত ইচ্ছার কোন স্থান নাই। ব্যক্তিগত জীবন সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের অধীনে আনা হয়।

একনায়কতন্ত্র-অনুসারে রাষ্ট্র সর্বশক্তিসম্পন্ন এবং ব্যক্তির রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দূরের কথা, কোন অধিকারও থাকিতে পারে না। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র ও দলীয় নেতৃত্ব অভিন্ন হইয়া রাষ্ট্রের ইচ্ছা নেতার ইচ্ছায় পর্যবসিত হয়। রুশিয়ায় সাম্যবাদী, ইতালীতে ফ্যাসিবাদী ও জার্মানীতে নাৎসীবাদী সিদ্ধান্তের উপর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রুশিয়ার

এই সাম্যবাদী একনায়কতন্ত্র ইহার গঠনমূলক কার্য দ্বারা পৃথিবীর বহুদেশে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র—Democracy and Dictatorship.

গণতন্ত্রের মূলনীতি হইল স্বাধীনতা ও সাম্য। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে এই নীতির কোন স্থান নাই। গণতন্ত্রে একই রাষ্ট্রে বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব সম্ভবপর, কিন্তু একনায়কতন্ত্রে অকটিমাত্র দল থাকে। অন্য দলের অস্তিত্ব আদৌ বরদাস্ত করা হয় না। গণতন্ত্র পারস্পরিক সম্মতি, সুবিধা ও অসহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর একনায়কতন্ত্র হইল দলীয় স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত ; সেইজন্য একনায়কতন্ত্রে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী, জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও দলীয় স্বার্থ জাতীয় স্বার্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু দলগত এই দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বার্থ যদি বিকৃত হয়, তাহা হইলে শুধু দলগত স্বার্থের হানি হয় তাহা নয়, সমস্ত জাতীয় জীবন এই বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা বিপর্যস্ত হইতে পারে। রুশীয় একনায়কতন্ত্রে এবং নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। কার্যতঃ যাহাই হউক না কেন, রুশীয় একনায়কতন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল ধনিক শ্রেণীকে নির্মূল করিয়া শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠা করা। অপরপক্ষে, নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল কোন সম্প্রদায়কে উৎখাত না করিয়া সকলের মধ্যে সমন্বয় সাধনপূর্বক জাতীয় স্বার্থকে পরিপুষ্ট করা। কার্যক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদী বা নাৎসীবাদী একনায়কতন্ত্র এবিষয়ে কতদূর সাফল্য অর্জন করিয়াছিল, তাহা অবশ্য বিচারসাপেক্ষ।

একনায়কতন্ত্রের গুণ—Merits of Dictatorship.

একনায়কতন্ত্র সম্বন্ধে সকলেই স্বভাবতঃ একটা বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করে। বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করিবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ থাকিলেও একনায়কতন্ত্রের যে কোন গুণ নাই, একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। একনায়কতন্ত্রের পক্ষে বলা যাইতে পারে যে, এই শাসনব্যবস্থায় জাতীয় ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্রে যে দল বা উপদলের অস্তিত্বের উল্লেখ করিয়া জনমতের প্রাধান্য প্রমাণ করা হয়, তাহা বহুক্ষেত্রেই কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা

হয় এবং দলগত বিরোধ জাতীয় স্বার্থকে অনেক সময়ে ক্ষুণ্ণ করে। প্রায় সকল গণতান্ত্রিক দেশেই জনগণ দলের নেতাকে অন্ধভাবেই অনুসরণ করিয়া থাকে। রাজনৈতিক দলগুলি শেষ পর্যন্ত নেতার যন্ত্রস্বরূপ হইয়া পড়ে। একনায়কতন্ত্র জটিল সমস্যাসমূহের দ্রুত সমাধান করিতে পারে, যাহা গণতন্ত্রে সকল সময়ে সম্ভব হয় না। জরুরী অবস্থায় একনায়কতন্ত্র জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণে অধিকতর কার্যকরী হয়। মানুষের নৈতিক উৎকর্ষসাধনেও একনায়কতন্ত্রের অবদান উপেক্ষণীয় নয়। সোভিয়েত দেশে এই একনায়কতন্ত্র জনগণকে অনেক ক্ষেত্রে স্বদেশপ্রেমিক করিয়া তাহাদের আত্মত্যাগ দ্বারা জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার শিক্ষা দিয়াছে। একনায়কতন্ত্রে যে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়, তাহা বলা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও সার্বজনীন শিক্ষাবিস্তারে জার্মানী, ইতালী ও বিশেষ করিয়া সোভিয়েত দেশ একনায়কতন্ত্রের অধীনে অতি অল্পকালের মধ্যে যে উন্নতিসাধন করিয়াছে, তাহা গণতন্ত্রে কোথায়ও সম্ভব হয় নাই। অনেকে মনে করেন যে, একনায়কতন্ত্র পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু একথা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য কখনই নয়। বর্তমান যুগে কোন রাষ্ট্রই সম্পূর্ণভাবে জনমতকে উপেক্ষা করিয়া শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। একনায়কতন্ত্রের কার্যাবলী যদি ক্রমাগত জনস্বার্থবিরোধী হয়, তাহা হইলে তাহার অবসান অবশ্যম্ভাবী। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। সুতরাং একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরাচার একার্থবোধক হইতে পারে না।

দোষ—Demerits.

একনায়কতন্ত্রের পক্ষে যতই যুক্তি দেখান হউক না. কেন, তাহা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, এই শাসনব্যবস্থা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্যক্তিত্ববিকাশের সুবিধা দান যদি রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে কোন ক্ষেত্রেই একনায়কতন্ত্র সমর্থনযোগ্য নয়। একনায়কতন্ত্র যে শেষ পর্যন্ত শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। মানুষ আইনের শাসন মানিতে চায়, কোন ব্যক্তিবিশেষের শাসনের প্রতি স্বাধীন চিন্তাশীল মানুষের শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। একনায়কতন্ত্র এই ব্যক্তিবিশেষের শাসনই প্রতিষ্ঠিত করে, সুতরাং জনকল্যাণকর হইলেও

এই শাসনব্যবস্থা কাম্য নহে। অনগ্রসর ও অপরাধপ্রবণ জনগণ শাসনের পক্ষে সহায়ক হইলেও একনায়কতন্ত্র জ্ঞানী, গুণী ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমূহের ব্যক্তিত্ববিকাশের অন্তরায় বলিয়া বিবেচিত হয়। অনেক সময় এই একনায়কত্ববাদ উগ্র জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে ব্যগ্র হয়। সুতরাং একনায়কতন্ত্র আন্তর্জাতিক শান্তি বিনষ্ট করিয়া যুদ্ধ অনিবার্য করিয়া তুলে। জার্মানী ও ইতালির একনায়কতন্ত্রের এই ছিল প্রধান দোষ। এই দোষের জন্যই তাহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল।

দশম অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ

(Organs of Government)

আইনসভা—The Legislature.

সরকারের সমুদয় কার্য সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয় ও এই তিনটি কার্য পরিচালনা করিবার জন্য প্রত্যেক সরকারই তিনটি বিভাগ লইয়া গঠিত হয়। বিভাগ তিনটি হইল—আইনসভা, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ। অনেক লেখক আবার নির্বাচকমণ্ডলীকে সরকারের চতুর্থ বিভাগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলী আইনসম্মতভাবে সরকারের দৈনন্দিন কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া সাধারণতঃ ইহাকে সরকারের একটি বিভাগ বলিয়া গণ্য করা হয় না।

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইনসভার প্রাধান্য সর্বত্র স্বীকৃত হয়। আইনসভার কার্যের বিশদ আলোচনা করিলে ইহার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

আইনসভার কার্য—Functions of the Legislature.

আইনসভার প্রধান কার্য হইল আইন প্রণয়ন করা (Legislation)। আইনসভাকে বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা ও সতর্কতা অবলম্বন করিয়া আইন প্রণয়ন করিতে হয়। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণের সমবেত ইচ্ছা প্রতিফলিত হয় আইনসভার মাধ্যমে। আইনসভা-প্রণীত আইন অনুসারে শাসনবিভাগ শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং বিচারবিভাগ আইনের ব্যাখ্যা করে ও সেই অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনা করে। সুতরাং আইনসভার কার্য হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। আইনসভা অনুপযোগী পুরাতন আইনগুলিকে বাতিল করিতে পারে, বা পুরাতন আইনগুলির সংশোধন করিতে পারে এবং দেশের প্রয়োজন অনুসারে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নূতন আইন প্রবর্তন করিতে পারে।

আইনসভা বিশেষ বিচার-বিবেচনা না করিয়া কোন আইন অনুমোদন করে না। শাসনকর্তৃপক্ষের মত আইনসভা কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। এইজন্য আইন-প্রণয়নকার্য একটি জটিল ও দীর্ঘ পদ্ধতির মধ্য দিয়া সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা আছে। আইন কার্যকর হইলে জনস্বার্থের উপর তাহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে পারে, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক না করিয়া কোন আইনই বলবৎ করা যায় না। বিরোধীদলের মতামত, জনমত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণপূর্বক নানা পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত আইন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং আইন-প্রণয়ন ব্যাপারের একটা প্রধান অঙ্গ হইল বিশেষ বিচার-বিবেচনা করা (Deliberation)। এইজন্য বিশেষরূপে বিচার-বিবেচনা করা আইনসভার আর একটি কার্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

সরকারী আয়-ব্যয়ের আলোচনা ও মঞ্জুরী করা আইনসভার আর একটি প্রধান কার্য। সরকারের আয় কি পরিমাণে হইবে, কি কি কর ধার্য করা হইবে এবং করপদ্ধতি কি হইবে ও কিভাবে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের জন্য আদায়ীকৃত রাজস্ব ব্যয় করা হইবে, এই সকল বিষয় আইনসভার অনুমোদনসাপেক্ষ। এক কথায়, শাসনকর্তৃপক্ষ ও বিচারবিভাগকে আইনসভা কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ব্যয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়।

সরকারী ব্যয় নির্বাহের জন্য নানাভাবে জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ আহরণ করা হয়। অর্থের অপচয় ও ব্যয়বাহুল্য রদ করিবার উদ্দেশ্যে প্রায় সকল দেশের আইনসভা সরকারী আয়-ব্যয়ের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। সরকারী আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আইনসভা শাসনবিভাগীয় নীতি ও বিভিন্ন কার্যকলাপ সুনিয়ন্ত্রিত করে।

ইংলণ্ডে সরকারী হিসাব সংস্থা (Public Accounts Committee), ব্যয়ের হিসাব সংস্থা (Estimates Committee) এবং হিসাব পরীক্ষক প্রধান সংস্থা (Office of the Comptroller and Auditor General) সাহায্যে পার্লামেন্টের এই নিয়ন্ত্রণ কার্য বলবৎ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কংগ্রেস সভা প্রয়োজনীয় কর আহরণ ব্যবস্থা ও ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি যে পরিমাণ অর্থ সরকারী ব্যয় নির্বাহের জন্য দাবী করেন

কংগ্রেস সাধারণতঃ তদপেক্ষা কম পরিমাণে অর্থ মঞ্জুর করে। উদ্দেশ্য হইল যে, সরকারকে পুনরায় অর্থের জন্য আইনসভার দ্বারস্থ হইতে হইবে এবং এইরূপে ব্যয়ের পরিমাণ পুনরায় আইনসভা কর্তৃক পরীক্ষিত হইবে। কংগ্রেসের এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সাধারণতঃ সাধারণ হিসাব সংস্থা (General Accounting office) দ্বারা পরিচালিত হয়।

ভারতেও বৃটিশ ব্যবস্থার অনুরূপভাবে সরকারী আয়-ব্যয়ের উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পরিচালিত হয়। এখানেও সরকারী হিসাব সংস্থা, ব্যয়ের হিসাব সংস্থা এবং হিসাব পরীক্ষক প্রধান সংস্থার মাধ্যমে পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ কার্য বলবৎ করা হয়।

এতদ্ব্যতীত মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগ প্রত্যক্ষভাবে ইহার শাসনকার্য ও শাসননীতির জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। আইনসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়া মন্ত্রিসংসদকে অপসারিত করিতে পারে। প্রশ্নোত্তরের দ্বারা ও অন্য নানা উপায়ে আইনসভা শাসন-কর্তৃপক্ষের কার্য নিয়ন্ত্রিত করে। রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থায় আইনসভা পরোক্ষভাবে শাসনকর্তৃপক্ষের কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগগুলি সিনেট সভার অনুমোদন-সাপেক্ষ। উভয় পরিষদের অনুমোদন ব্যতীত রাষ্ট্রপতি যুদ্ধঘোষণা করিতে পারেন না।

অনেক দেশে আইনসভার হস্তে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবার অধিকার ন্যস্ত থাকে। ইংলণ্ডে পার্লামেন্ট সভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস সভার শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা না থাকিলেও পরিবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার ক্ষমতা আছে। ভারতেও পার্লামেন্ট সভা এবং বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভাগুলি শাসনতন্ত্র সংশোধন ব্যাপারে অংশগ্রহণ করে।

আইনসভা অনেক ক্ষেত্রে শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা পরিচালনায় কিছু অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বড় বড় সরকারী চাকুরীতে রাষ্ট্রপতি যে সকল নিয়োগ করেন তাহা উচ্চ পরিষদের অনুমোদন-সাপেক্ষ। পররাষ্ট্রের সহিত সম্পাদিত চুক্তিও উচ্চ পরিষদের অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত বৈধ বলিয়া বিবেচিত হয় না ও সেগুলিকে বলবৎ করা যায় না। অনেক দেশে আইনসভা নির্বাচনক্ষমতার অধিকারী থাকে।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতিগণ আইনসভার দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি আইনসভার নির্বাচিত সদস্যবর্গের ভোটে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সুইজারল্যাণ্ড ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বিচারপতিগণ আইনসভার দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

ইহা ছাড়া আইনসভার কিছু বিচারবিভাগীয় কার্যও সম্পাদন করিতে হয়। মন্ত্রী অথবা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদিগকে অভিযুক্ত করিবার ও বিচার করিবার ক্ষমতা আইনসভার হস্তে ন্যস্ত থাকে। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাঁহার বিচার করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট সভার হস্তে ন্যস্ত। সুতরাং আইন প্রণয়ন ব্যতীতও আইনসভার আরও নানাবিধ কার্য করিতে হয়।

শাসনকর্তৃপক্ষ—The Executive.

ব্যাপক অর্থে শাসনকর্তৃপক্ষ বলিতে শাসনব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিশবিভাগের অধস্তন কর্মচারী পর্যন্ত বুঝায়। আইন-পরিষদ্ ও বিচারবিভাগ ব্যতীত সরকারী কার্যে নিযুক্ত সমুদয় কর্মচারীই শাসনবিভাগের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া সাধারণতঃ পরিচিত হয়। সংকীর্ণ অর্থে শাসনকর্তৃপক্ষ বলিতে শাসনবিভাগের নীতি ও কার্যক্রমনির্ধারক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ্ বুঝায়।

শাসনকর্তৃপক্ষের শ্রেণীবিভাগ ও নিয়োগ-পদ্ধতি—Classification and Appointment of the Executive.

শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বংশানুক্রমিক একজন রাজা অথবা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হইতে পারেন।

বংশানুক্রমিক রাজা (Hereditary King) অথবা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি (Elected President) নামসর্বস্ব (Nominal) শাসনকর্তৃপক্ষ হইতে পারেন। ইংলণ্ডের বংশানুক্রমিক রাজা ও ভারতের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি নামসর্বস্ব শাসনকর্তৃপক্ষের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যখন শাসনকর্তৃপক্ষের আইনসভার সহিত যোগসূত্র থাকে ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে আইনসভা-প্রধান শাসনকর্তৃপক্ষ

(Parliamentary Executive) বলা হয়। ইংলণ্ডে এই শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে। শাসনকর্তৃপক্ষের যদি আইনসভার সহিত কোন প্রকার প্রত্যক্ষ যোগসূত্র না থাকে এবং আইনসভাও যদি শাসনকর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই শাসনব্যবস্থাকে রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনকর্তৃপক্ষ (Non-Parliamentary Executive) বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই শাসন-ব্যবস্থা চালু দেখিতে পাওয়া যায়।

শাসনবিভাগীয় কার্য—Functions of the Executive.

শাসনবিভাগ সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার কার্য সম্পাদন করে :—

১। শাসনবিভাগীয় কার্য—Administrative Functions.

শাসনবিভাগের প্রধান কার্য হইল আইনসমূহ প্রয়োগ করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করা এবং দেশে যাহাতে আইন ও শৃংখলা বজায় থাকে সেজন্য জনসাধারণকে আইন মানিতে বাধ্য করা। আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করিবার জন্য শাসনকর্তৃপক্ষকে পুলিশবাহিনী পরিচালনা করিতে হয় এবং আইনভঙ্গকারীদের বিচারালয় কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করিবার নিমিত্ত কারাবাসের ব্যবস্থা করিতে হয়।

২। কূটনৈতিক ক্ষমতা—Diplomatic Power.

বর্তমান যুগে প্রত্যেক রাষ্ট্রের নানা কারণে অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিতে হয়। এক রাষ্ট্রের সহিত অপর রাষ্ট্রের কি সম্পর্ক হইবে তাহা শাসনবিভাগ স্থির করে। বৈদেশিক ব্যাপারসমূহ নিষ্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের সহিত দূতবিনিময় করে ও এই দূতের মাধ্যমেই রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক আদান-প্রদান সম্পন্ন হয়। ইহা ছাড়া, বৈদেশিক শক্তির সহিত চুক্তি সম্পাদন করা ও সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়া প্রভৃতি যাবতীয় কার্য শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।

৩। সামরিক ক্ষমতা—Military Power.

পররাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া যুদ্ধকার্য পরিচালনা করা শাসন-বিভাগের আর একটি প্রধান ক্ষমতা। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য শাসনবিভাগ

স্থলবাহিনী, নৌ-বাহিনী এবং বিমানবাহিনী গঠন করিয়া তাহাদের পরিচালনা করে। যুদ্ধ সমাপ্ত করিয়া শান্তি স্থাপন করিবার ক্ষমতাও শাসন-কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণা করা বা যুদ্ধ পরিচালনা করিবার ব্যয়ের জন্য শাসনকর্তৃপক্ষকে আইন-পরিষদের অনুমোদন লাভ করিতে হয়।

৪। সাধারণ ও জরুরী আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা—Legislative and Ordinance-making Power.

শাসকর্তৃপক্ষের কিছু আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাও থাকে। মন্ত্রি-সংসদ্-চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসংসদের প্রত্যেকটি সদস্য আইনসভার সদস্য হিসাবে আইনসভায় আইন-প্রণয়নের প্রস্তাব করিতে পারেন। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতারাই মন্ত্রিসংসদ্ গঠন করেন। সুতরাং মন্ত্রিমণ্ডলী কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া আইনগুলি সহজেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনে আইনে পরিণত হয়। অনেক সময় আইনসভা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মন্ত্রিসংসদ্ প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসনকর্তৃপক্ষ পরোক্ষ উপায়ে আইন-প্রণয়নকার্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত, আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত আইন শাসনকর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে বাতিল করিতে বা স্থগিত রাখিতে পারে। আপৎকালে শাসনকর্তৃপক্ষ জরুরী আইন প্রবর্তন করিতে পারে।

৫। বিচারবিষয়ক ক্ষমতা—Judicial Power.

শাসনকর্তৃপক্ষের কিছু কিছু বিচারবিষয়ক ক্ষমতাও থাকে। অধিকাংশ দেশে উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণ শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। উর্ধ্বতন শাসনকর্তৃপক্ষের দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা করিবার ক্ষমতাও থাকে।

স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ—Permanent Civil Service.

স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ হইল শাসনবিভাগের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রত্যেক দেশেই এই স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ লইয়া শাসনবিভাগ গঠিত হয়। শাসন-

বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ স-মন্ত্রিপরিষদ্ রাজা বা রাষ্ট্রপতি। মন্ত্রিপরিষদ্ নির্ধারিত কালের জন্য নির্বাচিত বা নিযুক্ত হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং নির্দিষ্ট কাল অন্তে কার্যভারমুক্ত হন এবং নূতন শাসকগণ নিযুক্ত হন। ঊর্ধ্বতন শাসনকর্তৃপক্ষ রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করেন এবং তাঁহারা নির্ধারিত নীতি ও কার্যের জন্য পরোক্ষভাবে জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকেন। এইরূপে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসকগণ শাসিতের নিকট দায়ী থাকেন। কিন্তু নীতি নির্ধারণ ও কার্যক্রম স্থির করাই শাসন পরিচালনার একমাত্র কাজ নহে। নির্ধারিত নীতি ও কার্যক্রমকে কার্যে রূপায়িত করিবার জন্য আর এক দল দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মচারীর প্রয়োজন। এই কর্মচারিগণের শুধু দক্ষ ও কর্মকুশল হইলেই চলে না—তাঁহাদের কার্যের স্থায়িত্বও থাকা আবশ্যক। নতুবা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদের পরিবর্তনের সঙ্গে এই কর্মচারিবৃন্দের পরিবর্তন ঘটিলে শাসনবিভাগের কার্য একেবারেই অচল হয়। সেইজন্য প্রত্যেক দেশের শাসনব্যবস্থায় দুই শ্রেণীর শাসক দেখা যায়—প্রথম শ্রেণীর শাসকগণ শাসনবিষয়ক নীতি নির্ধারণ করিলেও নির্ধারিত কার্যকালের জন্য নিযুক্ত হন। দক্ষতা অপেক্ষাও দায়িত্বশীলতা হইল এই শ্রেণীর শাসকবর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর শাসকগণ দক্ষতা ও কর্মকুশলতার ভিত্তিতে দীর্ঘকালের জন্য নিযুক্ত হন। দায়িত্বশীলতা অপেক্ষা কর্মকুশলতাই হইল এই শ্রেণীর শাসকবর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইঁহারা নির্দিষ্ট বয়সে নিযুক্ত হইয়া একটা নির্দিষ্ট বয়সে কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই শ্রেণীর কর্মচারিগণ যাহাতে নিরপেক্ষভাবে দক্ষতার সহিত সরকারী কার্য পরিচালনা করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে ইঁহাদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বেতন প্রভৃতি একটি নিরপেক্ষ নিয়োগ সংসদ কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়। সুশাসনব্যবস্থা দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতা এই দুইটি গুণের উপর নির্ভর করে এবং শাসনবিভাগের এই দুইটি অঙ্গের সুসামঞ্জস্যের উপর শাসনব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে।

বিচারবিভাগ ও ইহার কার্য—**The Judiciary and its Functions.**

লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন যে, কোন দেশের শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ নির্ধারণ করা যায় একমাত্র সেই দেশের বিচারব্যবস্থার উৎকর্ষ দ্বারা। একটু

প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই উক্তিটির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনগুলিকে যথাযথভাবে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের ভার থাকে বিচারকদের উপর। বিচারপতিগণ শুধু যে আইনগুলি প্রয়োগ করিয়া দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করেন তাহা নয়, প্রয়োজনমত তাঁহারা প্রচলিত আইনগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া এরূপভাবে প্রয়োগ করেন যাহাতে দোষী ব্যক্তি যথাযথভাবে দণ্ডিত হয় ও নির্দোষ ব্যক্তি অব্যাহিত পায়। বিচারকার্য একটা লৌকিক ব্যবস্থামাত্র নহে। অপরাধীর উদ্দেশ্য ও অপরাধের গুরুত্ব সঠিকভাবে পরিমাপ করিয়া শাস্তিবিধান করা উচিত। বিচারব্যবস্থা এরূপভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যে, একাধিক অপরাধী অব্যাহিত লাভ করুক, কিন্তু একজনও নির্দোষ ব্যক্তি যেন শাস্তি না পায়। সুতরাং দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা-রক্ষা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রক্ষাকল্পে ন্যায় বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সর্বত্র স্বীকৃত হয়।

বিচারপতিগণ আইনের প্রয়োগ করেন ও আইনের কি ব্যাখ্যা হওয়া উচিত তাহা স্থির করেন। এইরূপে ব্যাখ্যাত আইনগুলি প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। একাধিক বিচারক যখন তাঁহাদের পূর্ববর্তী বিচারক-কর্তৃক ব্যাখ্যাত আইন অনুরূপ ক্ষেত্রে অনুসরণ করেন, তখন এই নূতন ব্যাখ্যা দ্বারা নূতন আইন সৃষ্টি হয়। বিচারকগণ অন্য আর এক প্রকারে আইন সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যদি কোন বিরোধের বিষয় প্রচলিত আইনের গণ্ডির মধ্যে না পড়ে, তাহা হইলে বিচারকগণ তাঁহাদের বিবেক ও ন্যায়বুদ্ধি অনুসারে সেই সমস্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি করিয়া নূতন আইন সৃষ্টি করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতিগণকে আর এক প্রকারের কার্য সম্পাদন করিতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য হইল শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাখ্যা করা। যুক্তরাষ্ট্রে শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার অথবা আঞ্চলিক সরকারগুলির শাসনতন্ত্র দ্বারা নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করিয়া অপরের কার্যক্ষেত্রে যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে, সেইজন্য যুক্তরাষ্ট্রীয়

বিচারালয়ের উভয় সরকারের কার্যকলাপ শাসনতন্ত্র-বহির্ভূত ও বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিবার ক্ষমতা থাকে।

বিচারকগণ নির্দিষ্টক্ষেত্রে প্রয়োজনমত আইন-পরিষদ্ ও শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে আইন সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত প্রদান করিয়া থাকেন। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভারতীয় উচ্চ বিচারালয়ের অভিমত জানিবার জন্য যে-কোন বিষয় উপস্থিত করিতে পারেন।

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি—Theory of Separation of Powers.

রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইল রাষ্ট্রান্তর্গত জনসমষ্টির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করা। এই কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে সমাজ-মধ্যে এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে, যে পরিবেশে ব্যক্তিমাত্রই স্বীয় স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলির পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়। এইজন্য রাষ্ট্র ব্যক্তিকে কতকগুলি অধিকার অর্পণ ও কর্তব্যের নির্দেশ দান করে। রাষ্ট্র-নির্ধারিত আইনের সাহায্যেই এই অধিকার ও কর্তব্য বলবৎ করা যায়; সুতরাং আইন-প্রণয়ন, আইন বলবৎ ও পক্ষপাতশূন্যভাবে আইন প্রয়োগ করা হইল রাষ্ট্রের কার্য।

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের প্রয়োজনীয়তা—Necessity for Separation of Powers.

সরকারের কার্যাবলীকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা, আইনবিষয়ক, শাসনবিষয়ক ও বিচারবিষয়ক। এই তিন শ্রেণীর কার্য তিনটি পৃথক্ বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়। আইনসভার প্রধান কার্য হইল আইন প্রণয়ন করা। শাসনবিভাগ এই আইনগুলিকে বলবৎ করে, এবং বিচারবিভাগ আইনগুলির ব্যাখ্যা করে ও বিচারার্থ আনীত বিরোধসমূহের নিষ্পত্তির জন্য আইনগুলির প্রয়োগ করে। ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি অনুযায়ী প্রত্যেকটি বিভাগ স্বীয় কার্য পরিচালনার ব্যাপারে অপরের প্রভাব-মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে কার্য করিবার অধিকারী হয়। যদি একাধিক ক্ষমতা অথবা তিনটি ক্ষমতাই একই ব্যক্তি বা একই ব্যক্তিসংসদের হস্তে ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে শাসনব্যবস্থায় স্বৈরাচারের উদ্ভব হইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

মতবাদের উৎপত্তি—Development of the Theory.

প্রাচীনকালে রাজা একাধারে এই তিনটি ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি আইন প্রণয়ন করিতেন, আবার শাসক হিসাবে জনগণের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন এবং বিচারকশ্রেষ্ঠ হিসাবে রাজাই আইনের প্রয়োগ করিতেন। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে বিচারব্যবস্থা প্রহসনে পর্যবসিত হইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমাধি রচিত হয়। স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার কবল হইতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই মতবাদ প্রবর্তিত হয়। গ্রীক্ দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌ল ও রোমক দার্শনিকদের লেখার মধ্যে অস্পষ্টভাবে এই মতবাদের উল্লেখ দেখা যায়। এই মতবাদকে বর্তমান যুগোপযোগী করিয়া প্রথম প্রবর্তন করেন ফরাসী লেখক মন্টেস্কু। মন্টেস্কু তাঁহার *'L'Espirit De Lois'* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এই মতবাদের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া ইহাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি মূল নীতি বলিয়া প্রচার করেন। মন্টেস্কু বৃটিশ শাসনতন্ত্রের বিশেষ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যদি একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি সরকারী সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী হয় তাহা হইলে নাগরিক জীবন ও স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে। স্বৈরাচারের সম্ভাবনা রহিত করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির সরকারের বিভিন্ন কার্যাবলী পরিচালনার অধিকারী হওয়া উচিত। সুতরাং মন্টেস্কু ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে অপরিহার্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। মন্টেস্কুর পর ইংলণ্ডে ব্ল্যাক্‌স্টোনও এই মতের একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। তিনি প্রত্যেকটি বিভাগকে বিশেষ করিয়া বিচারবিভাগকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ ও স্বাধীন করিবার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বাস্তবক্ষেত্রেও এই নীতি অনেক দেশের শাসনব্যবস্থায় কার্যকরী করা হইয়াছিল। বিপ্লবের পরবর্তী কালে ফরাসী দেশে যে শাসনতন্ত্র রচিত হয়, তাহাতে এই নীতির প্রয়োগ বিশেষভাবে বলবৎ দেখা যায়। মার্কিন দেশের শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণও এই নীতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া শাসনব্যবস্থায় এই নীতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে এই নীতির উপর আর পূর্বের মত বাস্তব গুরুত্ব আরোপ করা হয় না।

সমালোচনা—Criticism.

সরকারী ক্ষমতা ও কার্যসমূহ তিনভাগে ভাগ করিয়া তিনটি পৃথক্ বিভাগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে একথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইলেও বাস্তব অভিজ্ঞতার দিক হইতে দেখিলে উপলব্ধি হয় যে, ক্ষমতার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভব নয়। সরকারের প্রত্যেক বিভাগেরই অন্য দুইটি বিভাগ-সংক্রান্ত কিছু-না-কিছু কার্য করিতেই হয়। বর্তমান শাসন-ব্যবস্থা এত জটিল যে, কোন বিভাগই স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কার্য করিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আইনসভার প্রধান কার্য হইল আইন প্রণয়ন করা। কিন্তু আইনসভা একাদিক্রমে দুই-তিন মাস অধিবেশন পরিচালনা করিয়া কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকে। তাহার পর পুনরায় দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। আইনসভার এই দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী কালের জরুরী প্রয়োজনে শাসনকর্তৃপক্ষই সাময়িকভাবে আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে। বিচারবিভাগের প্রধান কার্য হইল আইনের প্রয়োগ করা। কিন্তু অনেক সময় বিচারকগণ আইনের নূতন ব্যাখ্যা দ্বারা বা আইনের অস্পষ্টতার জন্য নিজেদের ন্যায়বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করিয়া নূতন আইন সৃষ্টি করেন। অপরপক্ষে, আইনসভাকেও অনেক সময় বিচার-বিষয়ক কার্য পরিচালনা করিতে হয়। সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কর্তব্যের ত্রুটি হইলে সাধারণতঃ আইনসভার উচ্চ পরিষদ্ এই বিচারকার্য করিয়া থাকে। শাসনকর্তৃপক্ষেরও অনেক সময় বিচারবিষয়ক কার্য সম্পাদন করিতে হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার পর শাসনবিভাগ ও আইনসভার মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও সহযোগিতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এই দুইটি বিভাগের কার্যের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ইংলণ্ড প্রভৃতি মন্ত্রিসংসদ চালিত শাসনব্যবস্থায় এই দুইটি বিভাগের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের অভাব বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, এমন কোন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দেখা যায় না যেখানে সরকারের এই তিনটি ক্ষমতার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ কার্যক্ষেত্রে বলবৎ করা সম্ভব হইয়াছে। কি মন্ত্রিসংসদ্-চালিত শাসনে, কি রাষ্ট্রপতি-শাসনে, সরকারের এই তিনটি ক্ষমতার কার্যকারিতা পারস্পরিক সহযোগিতার উপর

নির্ভর করে। প্রত্যেক দেশের শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করিলে উপরি-উক্ত উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

গ্রেট বৃটেনে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান অনুযায়ী তিনটি বিভাগ দ্বারা সরকারের তিনটি প্রধান কার্য পরিচালিত হয় বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গ্রেট বৃটেনে শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান সর্বাপেক্ষা কম অনুসৃত হইয়াছে। মন্ত্রিসংসদের সদস্যগণ সকলেই আইনসভার সদস্য ও আইন-প্রণয়নে তাঁহাদের পূর্ণ অধিকার আছে। মন্ত্রিমণ্ডলী আবার শাসনকার্যের প্রকৃত পরিচালক। লর্ড সভা আইনসভার একটি অংশ, কিন্তু ইহাদের কিছু কিছু বিচারক্ষমতাও আছে। ইংলণ্ডের রাজা শাসনকার্যের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ, কিন্তু তিনি আবার আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁহার কিন্তু বিচারক্ষমতাও আছে। লর্ড চ্যান্সেলর লর্ড সভার সভাপতি, মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্য ও ইংলণ্ডের প্রধান বিচারালয়ের একজন বিচারপতি। তিনি একাধারে তিনটি বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং ইংলণ্ডে কর্মবিভাগের উপর বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই, অধিকন্তু অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগের সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভা, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক্। রাষ্ট্রপতি শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি আইনসভার সদস্য নহেন বা প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন করিতে পারেন না। আইনসভা ও বিচারবিভাগও সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এখানেও তিনটি বিভাগের মধ্যে কিছু যোগসূত্র রহিয়াছে। রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের নিযুক্ত করেন, কিন্তু বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতির নির্দেশ বাতিল করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি আইনসভার আইন বাতিল করিতে পারেন, কিন্তু রাষ্ট্রপতি যে সকল নিয়োগ করেন ও পররাষ্ট্রের সহিত যে সমস্ত সন্ধি স্বাক্ষর করেন সেগুলি আইনসভার উচ্চপরিষদ্ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হওয়ার ফলে আইনসভা ও শাসনকর্তৃপক্ষের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল একই রাজনৈতিক দলভুক্ত বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা হ্রাস পাইয়াছে।

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে সরকারের কর্মবিভাগ নীতি কিছু পরিমাণে কার্যকরী করা হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও শাসনপরিচালনা ব্যবস্থায় ক্ষমতার সংমিশ্রণ যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়।

রাষ্ট্রপতি শাসনকার্য পরিচালনা করেন, কিন্তু জরুরী প্রয়োজনে তিনি অর্ডিন্যান্স নামে অভিহিত বিশেষ আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের নিয়োগ করেন ও প্রাণদণ্ড-মুকুব প্রভৃতি কয়েকটি বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতার অধিকার তাঁহার আছে। ভারতের আইনসভা ও মন্ত্রি-মণ্ডলীর মধ্যে যোগসূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যদের আইনসভার সদস্য হইতে হইবে ও তাঁহাদের শাসনকার্যের জন্য তাঁহারা আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। অপরপক্ষে, মন্ত্রিসভার নির্দেশে রাষ্ট্রপতি আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। আইনসভাকে আহ্বান করা ও সাময়িকভাবে আইনসভার অধিবেশন স্থগিত রাখিবার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির আছে। ভারতে জিলার শাসনব্যবস্থায় কর্মবিভাগ নীতির অভাব বিশেষ-ভাবে দেখা যায়। জিলাশাসক একাধারে জিলার শাসনব্যাপারে সর্বময় কর্তা ও তিনি ফৌজদারী মামলা-সংক্রান্ত ব্যাপারে একজন বিচারপতি। শাসনবিভাগের কর্তা হইলেও জিলাশাসকের বিচারক্ষমতা আছে। বর্তমানে অবশ্য এই ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটিতেছে। ভারতের শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইন-সভার মধ্যে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি প্রযুক্ত না হইলেও শাসনতন্ত্র কর্তৃক বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ যাহাতে শাসনকর্তৃপক্ষ-নিরপেক্ষভাবে তাঁহাদের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন তজ্জন্য তাঁহাদের নিয়োগ, বেতন ও পদচ্যুতি সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। বিচারপতিগণের যে বেতন ও অন্যান্য ভাতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হইয়াছে, তাহা আইনসভার বাৎসরিক অনুমোদনের উপর নির্ভর করে না। নির্দিষ্ট বেতনে বিচারপতি নিযুক্ত হইবার পর তাঁহাদের কার্যকালে (জরুরী অর্থসংকট অবস্থা ব্যতীত) তাঁহাদের নির্ধারিত বেতনের পরিমাণ পরিবর্তন করা যায় না। পার্লামেন্ট সভার প্রত্যেক কক্ষের এক বিশেষ সংখ্যাধিক্যের আবেদনে অযোগ্যতা বা অসদাচরণের অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে পারেন না। তাঁহাদের

বিচারবিষয়ক কর্তব্যসম্পাদন বিষয়ে কোন আইনসভায় কোনপ্রকার আলোচনা চলিতে পারে না। এইরূপে ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র বিচারবিভাগকে আইনসভা ও শাসনকর্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি সাম্যবাদী রাষ্ট্রে ও নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি প্রকাশ্যতঃ অস্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং শাসনব্যবস্থায় এই নীতি কোন স্থান পায় নাই। সাম্যবাদী নেতৃবর্গ এই তথাকথিত স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ পুঁজিপতিদলের জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করিবার একটি রাজনৈতিক কৌশল বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহাদের মতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী দল রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিয়া বিত্তহীনদের নানাভাবে শোষণ করে এবং এই পুঁজিপতিদল রাষ্ট্রের প্রকৃত ধনতান্ত্রিক রূপকে গোপন করিবার উদ্দেশ্যে এই মতবাদের অবতারণা করেন। প্রকৃতপক্ষে কোন দেশের শাসনব্যবস্থায়ই এই নীতি কার্যতঃ প্রযুক্ত হয় নাই। মুষ্টিমেয় লোক এই তিনটি ক্ষমতার অধিকারী।

সাম্যবাদিগণ এই নীতিতে আস্থাহীন। তাঁহারা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধন করিয়া বিত্তহীন শ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসংকল্প। সুতরাং সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থায় তিনটি ক্ষমতাই প্রকাশ্যতঃ দলীয় নেতৃত্বে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। সোভিয়েত দেশের শাসনব্যবস্থা বা পূর্বতন নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করিলে ইহার সত্যতা সপ্রমাণিত হয়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র সাম্যবাদী দল ক্ষমতার অধিকারী। এই দলের পলিট্ ব্যুরো নামক সংস্থা বিভিন্নভাবে সমগ্র শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়াম সভার সংগঠন ও কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এই নীতিতে আদৌ আস্থাবান্ নহেন এবং সেই কারণে তাঁহারা প্রকাশ্যতঃ এই নীতি বর্জন করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরস্পর সংযুক্ত। কোন জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেরূপ পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হইয়া কর্মক্ষম থাকিতে পারে না, তদ্রূপ রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগগুলিও সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করা চলে না। অত্যধিক পরিমাণে কর্ম-

বিভাগের ফলে বিরোধের সৃষ্টি হইয়া শাসনকার্যে অচল পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে। ইহাতে শাসনকার্য ব্যাহত হয়।

চতুর্থতঃ, বলা হয় যে, ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যের অবর্তমানে স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিপন্ন করিতে পারে। কিন্তু এ যুক্তি সত্য নয়। গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি খুবই কম অনুসৃত হইয়াছে, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় এই নীতি অত্যধিক পরিমাণে কার্যকরী করা হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও গ্রেট ব্রিটেনের অধিবাসীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের অপেক্ষা কম স্বাধীনতার অধিকারী নয়। গ্রেট ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্যবিধানের উপর নির্ভর করে না। তাহা হইলে গ্রেট ব্রিটেনের অধিবাসীরা কখনই স্বাধীনতার অধিকারী হইতে পারিত না। ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ হইল জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার আন্তরিক প্রয়াস ও আত্মসচেতনভাব।

পঞ্চমতঃ, ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান অনুযায়ী প্রত্যেকটি বিভাগের সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সম-ক্ষমতার অধিকারী হইতে হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই তিনটি বিভাগের ক্ষমতার মধ্যে অনেক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। তিনটি বিভাগকে সম-ক্ষমতাবিশিষ্ট করাও সম্ভব নয়। প্রত্যেক দেশে আইনসভাই হইল সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ অনেক বিষয়ে আইনসভার উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রব্যবস্থায় একটি বিভাগ সর্বোচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন না হইলে শাসনকার্য বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে, তজ্জন্য আইনসভার নির্দেশ সর্বত্র চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়।

ষষ্ঠতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই নীতির চূড়ান্ত প্রয়োগের ফলে বিচারবিভাগ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বিচারবিভাগকে আইনসভা ও শাসন-বিভাগের প্রভাবমুক্ত করিয়া স্বাধীন করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ রাজ্যের বিচারপতিগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। জনগণের ভোট দ্বারা নির্বাচিত বিচারকগণ যোগ্যতা অপেক্ষা জনপ্রিয়তার জোরেই নির্বাচিত হন। এইরূপে নির্বাচিত বিচারকেরা পুনর্নির্বাচনের জন্য জনমতকে খুশি করিবার উদ্দেশ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। নির্ভীক

পক্ষপাতশূন্য ন্যায়বিচার এইরূপে নির্বাচিত বিচারকদের নিকট হইতে আশা করা দুরাশা মাত্র। একটি রাজনৈতিক মতবাদকে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারবিভাগকে পঙ্গু করা হইয়াছে।

উপসংহার—Conclusion.

উল্লিখিত সমালোচনাগুলি হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, নিছক নীতি হিসাবে অথবা শাসনব্যবস্থায় কার্যকরী শক্তি হিসাবে এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান বলবৎ হইলে শাসনব্যবস্থায় অচল পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে, অপরপক্ষে, ক্ষমতার একত্রীকরণে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে। সুতরাং ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানের প্রকৃত তাৎপর্য কি?

বর্তমানে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান বলিতে সরকারী বিভিন্ন বিভাগগুলি সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের নীতি বা প্রয়োগ বুঝায় না। ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান বর্তমানে দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ, ক্ষমতার আংশিক স্বাতন্ত্র্যকরণ ও দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন বিভাগগুলির কার্যাবলীর পৃথকীকরণ; কিন্তু ক্ষমতার অধিকারী বা প্রয়োগকারীর পৃথকীকরণ অপরিহার্য বলিয়া গণ্য হয় না।

শাসনকার্যে সরকারের বিভিন্ন কার্যাবলী বিভিন্ন ধরনের। আইনসভার কার্য হইল সাধারণ ধরনের। আইনসভার সদস্যের কোন বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না হইলেও চলিতে পারে। সাধারণ জ্ঞান ও দায়িত্বসম্পন্ন যে-কোন ব্যক্তি আইনসভার সদস্য হইবার উপযুক্ত বলিয়া নির্বাচিত হইতে পারেন। কিন্তু শাসনকর্তৃপক্ষের ও বিশেষ করিয়া বিচারবিভাগের সদস্যদের কোন কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া একান্ত আবশ্যক। শাসনকর্তৃপক্ষের দূরদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণে তৎপর হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিচারকার্য পরিচালনার জন্য ধীর ও স্থির, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মনোভাবাপন্ন এবং আইন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেকটি বিভাগের কার্যেই কিছু বিশেষত্ব আছে এবং সেইজন্য একই ব্যক্তির দ্বারা এই তিনটি বিভিন্ন প্রকৃতির কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। বিচারকের কার্য আইনসভার দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে না, কেননা বিচারপতিদের যে যোগ্যতা থাকা দরকার আইনসভার সদস্যদের

সেই জাতীয় যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। তিনটি কার্য বিভিন্ন বলিয়া এই কার্যগুলি বিভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিসংসদের দ্বারা পরিচালিত হওয়াই উচিত। কিন্তু এই পৃথকীকরণেরও একটা সীমা আছে। একটি যন্ত্র যেরূপ কতকগুলি প্রাণহীন অংশবিশেষের সমাবেশ, সরকারকে সেইরূপ কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি বলিয়া মনে করিলে মারাত্মক ভুল হইবে। একটি ব্যাপক ও মহান্ উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত সরকার গঠিত হয় ও সরকারের কার্যের বিভিন্নতা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি কার্য প্রত্যেকটি বিভাগ কর্তৃক একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে যোগসূত্রের অভাবে দেহের বিনাশ যেরূপ অবশ্যম্ভাবী, সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে যোগসূত্রের অবর্তমানে সরকারেরও বিনাশ সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী। এই যোগসূত্রের জন্য বিভিন্ন বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা থাকা একান্ত আবশ্যক। যাহারা নীতিগুলি কার্য-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, সেই সমস্ত অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে কর্মবিভাগের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা চলে না। এইরূপ কর্মবিভাগের দ্বারা কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি পায় ও সরকারী কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধানকে ধনবিজ্ঞানের শ্রমবিভাগ নীতির একটি প্রয়োগ বলা যাইতে পারে।

স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার যুগে ক্ষমতা-স্বাতন্ত্র্যকরণ নীতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যকরণ দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা সুরক্ষিত করিবার প্রয়োজন আর নাই। বর্তমান যুগে সরকারের কার্যাবলী এত জটিল হইয়াছে যে, সরকারের সমুদয় কার্যই একব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে না। সেহেতু বিভিন্ন কার্যের জন্য বিভিন্ন দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। সুতরাং ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করা অপেক্ষাও সরকারের কার্য যাহাতে দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয় সেইজন্য কর্মবিভাগের প্রয়োজন। কিন্তু এই কর্মবিভাগ এইরূপভাবে সাধিত হইবে যে, বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র, সহযোগিতা ও পারস্পরিক দায়িত্বশীলতা বিনষ্ট না হয়।

ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির আধুনিক ব্যাখ্যা—Modern Interpretation of the Theory of Separation of Powers.

রাষ্ট্র-সম্পর্কে মানুষের ধারণার আমূল পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির অন্তর্নিহিত তত্ত্বের পরিবর্তন অনুভূত হইতেছে। ক্ষমতার আধার রাষ্ট্র বর্তমান যুগে কল্যাণ-রাষ্ট্রে রূপায়িত হইয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রের শক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া বর্তমানে রাষ্ট্রের জনহিতকর কার্যকলাপের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রধানতঃ শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নিছক শক্তি-ভিত্তিক রাষ্ট্র জনকল্যাণ সাধন করিতে পারে না। কল্যাণ-রাষ্ট্রের সহিত পশুবলের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না। সুতরাং উপরি-উক্ত নীতিটিকে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নামে অভিহিত না করিয়া রাষ্ট্রের কল্যাণকর কার্যকলাপের স্বাতন্ত্র্যবিধান নামে অভিহিত করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করাই যদি বর্তমান রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের এই কল্যাণসাধন কার্য বিভিন্ন বিভাগ দ্বারা আংশিকভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না—এই কল্যাণসাধনের নিমিত্ত শাসনব্যবস্থাকে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠনের অধীনে সমগ্রভাবে কার্য সম্পাদন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমানে রাষ্ট্রীয় সমুদয় কার্যকলাপই একটি পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনানুযায়ী সম্পাদিত হয়। পরিকল্পনার মূল নীতি হইল বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলিকে এক নিয়ন্ত্রণাধীনে একত্রিত করিয়া পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা সমষ্টির মঙ্গল সাধন করা। সুতরাং বর্তমান রাষ্ট্রগুলির কার্যকলাপ পৃথকীকরণনীতি অপেক্ষা সহযোগিতার উপর অধিকতর নির্ভরশীল। এইজন্য আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যকলাপে উপরি-উক্ত নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় না।

কিন্তু তাই বলিয়া শাসব্যবস্থায় যথেচ্ছাচারিতার প্রশয় দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। বর্তমান যুগে সর্বদেশে সর্ববিষয়ে শাসনকর্তৃপক্ষের আধিপত্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। শাসনকর্তৃপক্ষকে সংযত রাখিবার জন্য বিচারবিভাগীয় নির্দেশ (judicial review) ও নিয়মতান্ত্রিক বিধিনিষেধ বলবৎ থাকা একান্ত আবশ্যক।

শাসনকর্তৃপক্ষ—একক ও সমষ্টিগত—Executive—Single and Plural.

শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতা যখন একটিমাত্র ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকে তখন তাহাকে একক শাসনকর্তৃপক্ষ (Single Executive) বলা হয়। এই ব্যবস্থায় একজন ব্যক্তি শাসনপরিষদের সর্বাধিনায়ক থাকেন ও পরিষদের অপর সদস্যগণ তাঁহার নির্দেশে পরিচালিত হইয়া থাকেন। একনায়কতন্ত্রে ও রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থায় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। শাসনকার্যে সাহায্য করিবার জন্য তিনি সহকারী নিয়োগ করিতে পারেন, কিন্তু সহকারিবৃন্দ তাঁহার নিম্নতম কর্মচারী বলিয়া পরিগণিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি হইলেন শাসনবিভাগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে তিনিই নিয়োগ করেন ও সদস্যগণ তাঁহার নির্দেশেই পরিচালিত হন। নাৎসী জার্মানী ও ফ্যাসিবাদী ইটালীতে একনায়কতন্ত্র ব্যবস্থায় একব্যক্তিই সমস্ত ক্ষমতা-প্রয়োগের অধিকারী ও সমস্ত দায়িত্ববহনকারী বলিয়া পরিগণিত হইত।

শাসনপরিষদ্ যদি একব্যক্তি দ্বারা গঠিত না হইয়া একাধিক ব্যক্তির দ্বারা গঠিত হয় এবং শাসনকার্য যদি একাধিক ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে শাসনপরিষদকে সমষ্টিগত শাসনকর্তৃপক্ষ (Plural Executive) বলা হয়। মন্ত্রিসংসদ্-চালিত শাসনব্যবস্থায় একাধিক ব্যক্তি যৌথভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায়ও একজন নেতা বা প্রধানমন্ত্রী থাকেন। তিনি মন্ত্রিমণ্ডলীর অন্যতম হইলেও অনেক বিষয়ে তাঁহার প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। সমষ্টিগত শাসনপরিষদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ সুইজারল্যাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়। সুইস্ শাসনপরিষদ্ (Federal Council) সাতজন সমক্ষমতাবিশিষ্ট সদস্য লইয়া গঠিত। ইঁহাদের মধ্যে একজন এক বৎসরের জন্য সভাপতি নিযুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ক্ষমতার দিক দিয়া দেখিলে এই সভাপতি অন্যান্য সদস্য অপেক্ষা উচ্চতর বা কোন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী নহেন। শাসন-পরিচালনার ক্ষমতা ও দায়িত্ব শাসনপরিষদের সাতজন সদস্যই সমভাবে বহন করেন।

একক শাসনপরিষদ্-ব্যবস্থায় একজন মাত্র ব্যক্তি শাসনক্ষমতার শীর্ষস্থানীয়

বলিয়া অবস্থা অনুসারে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। শাসনক্ষমতা একাধিক ব্যক্তির মধ্যে বিভক্ত হইলে দৃঢ়তার সহিত কোন কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করা যায় না, সুতরাং শাসনব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে। একক শাসন-পরিষদের প্রধান গুণ হইল যে, শাসনকর্তৃপক্ষ অন্যনিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীনভাবে প্রয়োজনীয় কার্যসমূহ সময়মত সম্পাদন করিতে পারে। কিন্তু একহস্তে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে স্বৈরাচারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

সমষ্টিগত শাসনপরিষদের প্রধান গুণ হইল যে, একাধিক ব্যক্তির আলাপ-আলোচনা ও ভাববিনিময়ের দ্বারা শাসনব্যবস্থার নীতি ও কার্যক্রম নির্ধারিত হইতে পারে। সময়সাপেক্ষ হইলেও আলাপ-আলোচনার দ্বারা স্থিরীকৃত নীতি অধিকতর কার্যকরী ও সাফল্যমণ্ডিত হয়। ক্ষমতা একাধিক ব্যক্তির মধ্যে বিভক্ত থাকার ফলে ইহার স্বৈরপ্রয়োগের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। কিন্তু এই ব্যবস্থার বিপক্ষে বলা হয় যে, শাসনক্ষমতা যদি একাধিক ব্যক্তির মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হয়, তাহা হইলে শাসনব্যবস্থা শুধু দুর্বল হইয়া পড়ে তাহা নয়, শাসকগণের মধ্যে দায়িত্বজ্ঞানেরও অভাব হইতে পারে। এইজন্য মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিমণ্ডলীর যৌথ-দায়িত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং একজন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মন্ত্রিসংসদ্ পরিচালিত হয়। সুইজারল্যাণ্ডে এই সমষ্টিগত শাসনপরিষদ্ সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিলেও অন্যত্র এই ব্যবস্থা কার্যকরী হয় নাই।

ভারতে সর্ব-ভারতীয় ও রাজ্যশাসন কর্তৃপক্ষ—Union and State Executives in India.

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থার একটি প্রধান্ বৈশিষ্ট্য হইল একসঙ্গে একটি কেন্দ্রীয় অথবা সমগ্র দেশের জন্য একটি সাধারণ সরকার থাকে ও যে সমস্ত প্রদেশ বা রাজ্য লইয়া সমগ্র দেশটি গঠিত হয়, সেই সমস্ত রাজ্যগুলিরও পৃথক পৃথক সরকার বা শাসনব্যবস্থা থাকে। সর্ব-ভারতের জন্য দিল্লীতে একটি কেন্দ্রীয় সরকার আছে ও ভারতের ২২টি রাজ্যের জন্য ২২টি পৃথক সরকার আছে। যথা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শাসনকর্তৃপক্ষ আছেন ও রাজ্য সরকারগুলির ক্ষেত্রেও অনুরূপ শাসনকর্তৃপক্ষ আছেন।

রাষ্ট্রপতি (President), মন্ত্রিপরিষদ (Council of Ministers) ও স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ (Permanent Executive) লইয়া সর্ব-ভারতীয় শাসনকর্তৃপক্ষ গঠিত। অপরপক্ষে রাজ্যপাল (Governor), রাজ্য মন্ত্রি-পরিষদ্ (Council of Ministers) ও স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ লইয়া রাজ্য শাসন-কর্তৃপক্ষ গঠিত।

সর্ব-ভারতীয় শাসন বিভাগ (Union Executive)

রাষ্ট্রপতি—The President.

শাসনতন্ত্রের ৫৩ (১) ধারায় সুস্পষ্টভাবে লিখিত হইয়াছে যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা একজন রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং অথবা তাঁহার অধস্তন কর্মচারিগণের সাহায্যে শাসনক্ষমতা পরিচালিত হইবে।

আবার শাসনতন্ত্রের ৭৪ (১) ও ৭৫ (৩) ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিবার জন্য একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে। মন্ত্রিপরিষদ সমবেতভাবে লোকসভার নিকট দায়ী থাকিবে।

উপরি-উক্ত দুইটি ধারা বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, রাষ্ট্রপতি শাসনবিভাগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হইলেও শাসন পরিচালনাক্ষেত্রে তাঁহাকে একটি মন্ত্রিসভার পরামর্শানুসারেই কার্য করিতে হইবে। আর মন্ত্রিসভার সদস্যগণ তাঁহাদের দৈনন্দিন কার্যের জন্য একদল স্থায়ী কর্মচারীর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং ভারত সরকারের শাসনবিভাগ তিনটি অংশ লইয়া গঠিত, যথা, (১) রাষ্ট্রপতি (President) অথবা তাঁহার অবর্তমানে উপরাষ্ট্রপতি (Vice-President)। ইনি হইলেন নামসর্বস্ব বা শাসন-তান্ত্রিক কর্তৃপক্ষ, (২) মন্ত্রিপরিষদ (Council of Ministers)—ইঁহারাই হইলেন প্রকৃত শাসনকর্তৃপক্ষ (Real or Political Executive), (৩) স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ (Permanent Executive)। মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ঘটিলেও ইঁহারা কার্যে নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত বহাল থাকিয়া সরকারী কার্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন।

রাষ্ট্রপতিপদের যোগ্যতা ও কার্যকাল—Qualifications and Tenure of the Office of the President.

ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক রাষ্ট্রপতি পদের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাগুলি স্থির করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, তিনি অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হইবেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাকে অন্ততঃ ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে। তৃতীয়তঃ, ভারতে লোকসভার (House of the People) সদস্য হইতে গেলে যে সমুদয় যোগ্যতার আবশ্যক হয়, রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীরও অনুরূপ যোগ্যতা থাকা চাই। চতুর্থতঃ, কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার অথবা এই উভয়ের পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠানে এমন কোন পদে তিনি নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না যে পদ হইতে তাঁহার উপার্জন হয়। পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী কোন লাভজনক ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতে পারিবেন না। কোন রাজ্যের রাজ্যপাল, মন্ত্রী বা আইনসভার সদস্য যদি রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচিত হন, তাহা হইলে তিনি আর পূর্বপদে বহাল থাকিতে পারেন না। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ পদত্যাগ করিয়া রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন।

সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির কার্যকাল হইল পাঁচ বৎসর। কিন্তু পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে তিনি ইচ্ছা করিলে উপ-রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিতে পারেন। সংবিধানের ৬১ ধারা অনুসারে সংবিধান ভঙ্গ অপরাধের জন্য পার্লামেন্ট সভা তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ (Impeachment) আনয়ন করিয়া তাঁহাকে অপসারণ করিতে পারে। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতে হইলে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ আনয়নের ১৪ দিন পূর্বে পার্লামেন্টের যে কোন একটি কক্ষের ¼ অংশ সদস্যের এক লিখিত বিজ্ঞপ্তি দিতে হইবে। ইহার পর একটি প্রস্তাবাকারে এই অভিযোগ পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করিতে হইবে। এই প্রস্তাবটি যদি অভিযোগকারী কক্ষের ⅔ অংশ সদস্য দ্বারা সমর্থিত হয়, তাহা হইলে অপর কক্ষ কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে অভিযোগটি পরীক্ষিত হইবে। পরীক্ষক কক্ষ যদি ⅔ অংশ সদস্য দ্বারা অভিযোগটি সমর্থন করে তাহা হইলে রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগ করিতে হইবে। নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়া কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতিকে

পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও কার্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়, কারণ কার্যভার হস্তান্তর না করা পর্যন্ত পদত্যাগ স্বীকৃত হয় না। কার্যকাল শেষ হইবার পর রাষ্ট্রপতি পুনরায় ঐ পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন। বিদায়ী রাষ্ট্রপতির পুনঃ পুনঃ রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হইবার কোন সংবিধানগত বাধা নাই।

রাষ্ট্রপতি পদের বেতন, ভাতা ও নিষ্কৃতি—Salary, Allowance and Immunities of the Office.

নির্বাচিত হইবার পর আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণ করেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি নির্বাচিত ব্যক্তিকে সত্য, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত কার্য করিবার শপথ বাক্য পাঠ করান। রাষ্ট্রপতি হইলেন ভারতীয় সংবিধানের প্রধান সংরক্ষক।

রাষ্ট্রপতি নগদ ১০,০০০ টাকা বেতন পান। এতদ্ব্যতীত বিনা ভাড়ায় রাজকীয় আবাস-গৃহ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা পাইয়া থাকেন। পার্লামেন্ট আইন করিয়া রাষ্ট্রপতির বেতন প্রভৃতি নির্ধারণ করিয়া দিবে বলিয়া সংবিধানে বলা হইয়াছে।

কতকগুলি ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি যে সকল কার্য সম্পাদন করিবেন তজ্জন্য তাঁহাকে কোন বিচারালয়ে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না। রাষ্ট্রপতিপদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা আনা যাইবে না বা তাঁহাকে গ্রেপ্তার বা হাজতবাসের জন্য পরোয়ানা জারী করা যাইবে না। তবে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা রুজু করা যায়। ব্যক্তিগত কারণে দুই মাসের নোটিশ দিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দেওয়ানী অভিযোগ করা যায়। যে-কোন কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে ছয় মাসের মধ্যে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন-পদ্ধতি—Method of Election of the President.

ভারতের রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ পদ্ধতিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (Indirectly elected through proportional

representation by means of single transferable votes) ভিত্তিতে নির্বাচিত হইবেন। একটি বিশেষ নির্বাচন সংস্থা দ্বারা গোপন ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। (ক) ভারতীয় পার্লামেন্ট সভার উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ এবং (খ) অঙ্গ রাজ্যসমূহের নিম্ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ লইয়া এই নির্বাচন সংস্থা গঠিত হয়। নির্বাচন পদ্ধতিটি হইল: প্রথমে প্রত্যেক রাজ্যের জনসংখ্যাকে সেই রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া সেই ভাগফলকে পুনরায় ১০০০ দিয়া ভাগ করা হয় এবং ভাগশেষ যদি ৫০০-এর বেশী হয় তাহা হইলে ভাগফলের সহিত ১ যোগ করিয়া যে সংখ্যা হইবে সেই সংখ্যক ভোট প্রত্যেক রাজ্যের সদস্য দিতে পারিবেন। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণের মোট ভোট সংখ্যা নির্ণয় করা হয়।

সমস্ত রাজ্যের বিধানসভাসমূহের সদস্যগণের মোট সংখ্যা যোগ করিয়া পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া যে ভাগফল হয়, সেই ভাগফলের সমান সংখ্যক ভোট পার্লামেন্টের প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্য দিতে পারিবেন। একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটদান পদ্ধতি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পদের জন্য যত জন প্রার্থী থাকিবেন সেই সংখ্যক ভোট তাঁহারা পছন্দমত দিতে পারিবেন। ভোটদাতাগণ তাঁহাদের পছন্দমত প্রত্যেক নির্বাচনপ্রার্থীর নামের পাশে ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি লিখিয়া কোন্ প্রার্থী তাঁহার প্রথম পছন্দ, কোন্ প্রার্থী তাঁহার দ্বিতীয় পছন্দ ইত্যাদি প্রকাশ করিতে পারেন। ভোট গ্রহণ শেষ হইলে গণনাকালে প্রথমে সমস্ত প্রথম পছন্দগুলিকে যোগ দিয়া যে সংখ্যক ভোট পাওয়া যায় সেই প্রদত্ত ভোট সংখ্যাকে ২ দিয়া ভাগ করিতে হয় এবং ভাগফলের সহিত ১ যোগ করিয়া যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাকে 'কোটা' (Quota) বা নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট বলা হয়। যে প্রার্থী এই কোটা সংখ্যক ভোট পান, তিনিই নির্বাচিত হইবেন। যদি একাধিক ব্যক্তি এই কোটা পাইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে আবার যিনি অধিক সংখ্যক ভোট পাইবেন, তিনিই নির্বাচিত হইবেন। প্রথমে প্রার্থীর ১নং ভোট গণনা করা হয় অর্থাৎ তিনি কতগুলি প্রথম পছন্দ ভোট পাইয়াছেন। কোটা সংখ্যক ১নং ভোট পাইলেই তিনি নির্বাচিত হইবেন। কোন প্রার্থী যদি কোটা না পান তাহা হইলে যিনি সর্বাপেক্ষা

কমসংখ্যক ভোট পাইয়াছেন তাঁহাকে বাদ দেওয়া হয় এবং তিনি যে ভোটগুলি পাইয়াছেন, সেই ভোটগুলিকে দ্বিতীয় পছন্দ অনুযায়ী অবশিষ্ট প্রার্থীদের মধ্যে হস্তান্তরিত করা হয়। এবারেও যদি কেহ কোটা না পান তাহা হইলে পুনরায় প্রার্থী বাদ ও ভোট হস্তান্তর কার্য চলিবে এবং এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে শেষ পর্যন্ত একজন প্রার্থী কোটা পাইয়া নির্বাচিত হইবেনই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, স্বাধীন আয়ার, বর্মা প্রভৃতি কোন দেশেই ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের অনুরূপ জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নাই। এই পদ্ধতি দীর্ঘায়িত, জটিল ও জনসাধারণের বোধগম্য নহে। ইহার গণনা-কার্যও সময়সাপেক্ষ।

এই পদ্ধতির সপক্ষে বলা হয় যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যাহাতে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে এই জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। ভারতে রাষ্ট্রপতি শাসনক্ষমতার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হইলেও কার্যতঃ তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হয়। রাষ্ট্র পরিচলনার দায়িত্ব কার্যতঃ মন্ত্রিপরিষদসহ প্রধানমন্ত্রীর উপর ন্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং জনগণ কর্তৃক রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা—Powers of the President.

ভারতের সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতিকে শাসনক্ষমতা অর্পণ করা হইল এবং এই ক্ষমতা তিনি স্বয়ং অথবা তাঁহার অধস্তন কর্মচারিগণের মাধ্যমে প্রয়োগ করিবেন। সংবিধানে আরও বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার কার্যাবলী সম্পাদনে সাহায্য ও পরামর্শ দিবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে। সুতরাং উপরি-উক্ত অধস্তন কর্মচারী বলিতে মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে বুঝায়। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহ মন্ত্রিসভার পরামর্শানুসারেই প্রয়োগ করিবেন—স্ব-ইচ্ছায় প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। ইহা হইতে স্পষ্টই ধারণা হয় যে, রাষ্ট্রপতি ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর অনুরূপ নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান।

শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর আরোপিত ক্ষমতাসমূহকে সাধারণতঃ সাত ভাগে ভাগ করা হয়, যথা—

(১) শাসন পরিচালনার ক্ষমতা—Executive Powers.

রাষ্ট্রপতি হইলেন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় অধিকর্তা এবং তাঁহার নামেই সমগ্র শাসনক্ষমতা প্রযুক্ত হয়। রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল মনোনয়ন করা ব্যতীতও প্রধানমন্ত্রী, সুপ্রীম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণ, ভারতের অডিটর-জেনারেল, নির্বাচন কমিশনার, রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণের নিয়োগ করিয়া থাকেন। প্রথম তপশীলভুক্ত দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাজ্যগুলির শাসনকার্যের উপর প্রথম দশ বৎসরকাল পর্যন্ত তিনি তদারক করিতে পারিতেন। কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলিরও শাসন-পরিচালনার জন্য তিনি দায়ী। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির আর্থিক সম্পর্কে সামঞ্জস্যবিধান করিবার দায়িত্ব হইল রাষ্ট্রপতির এবং এই উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে একটি ফাইনান্স কমিশন নিয়োগ করিতে হইবে। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে জল সরবরাহ ব্যাপারে বিরোধ ঘটিলে বিরোধ-নিরসনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে একটি কমিশন গঠন করিতে হইবে। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে অথবা রাজ্যগুলির মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি একটি আন্তঃ-রাজ্যসভা নিযুক্ত করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত জরুরী অবস্থায় এবং শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার সময় হইতে সাধারণ নির্বাচন সমাপ্তি পর্যন্ত অন্তর্বর্তী কালে বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিগণকে ব্যক্তিগতভাবে পদচ্যুত করিতে পারেন। তিনি রাজ্যপাল ও এ্যাটর্ণি জেনারেলকেও পদচ্যুত করিতে পারেন এবং রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া অন্যান্য কর্মচারিগণকে পদচ্যুত করিতে পারেন।

(২) আইনপ্রণয়ন-ক্ষমতা—Legislative Powers.

রাষ্ট্রপতি আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাষ্ট্রপতি ও আইনসভার উভয় পরিষদ্ লইয়া ভারতীয় পার্লামেন্ট সভা গঠিত। রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদ্

অথবা একটি পরিষদকে অধিবেশনের জন্য আহ্বান করিতে পারেন, উভয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন এবং লোকসভা অর্থাৎ নিম্ন পরিষদ্ ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। প্রত্যেক অধিবেশন আরম্ভের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা করিতে পারিবেন এবং অধিবেশন আহ্বান করিবার কারণ ব্যাখ্যা করিবেন। তিনি কোন নির্দিষ্ট আইনের প্রস্তাব সম্পর্কে অথবা অন্য ব্যাপারে উভয় পরিষদের নিকট বাণী (Message) প্রেরণ করিতে পারেন।

উভয় পরিষদ্ কর্তৃক অনুমোদিত আইনের প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতির সম্মতি একান্ত প্রয়োজন। অনুমোদিত আইনের প্রস্তাবে তিনি সম্মতি প্রদান করিতে পারেন অথবা সম্মতিপ্রদানে বিরত থাকিতে পারেন। যে প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয় না, তাহা সংশোধিত আকারে অথবা বিনা সংশোধনে যদি উভয় পরিষদ্ কর্তৃক পুনরায় গৃহীত হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রস্তাব দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইলে তাঁহাকে উক্ত প্রস্তাবে সম্মতিপ্রদান করিতেই হইবে। পার্লামেন্টের অবকাশকালে রাষ্ট্রপতি জরুরী আইন (Ordinance) প্রণয়ন করিতে পারেন এবং এই আইনগুলি পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনের মত কার্যকরী হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি প্রবর্তিত জরুরী আইনগুলি পার্লামেন্ট সভার পরবর্তী অধিবেশনে উত্থাপন করিতে হইবে এবং পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইলে পার্লামেন্টের অধিবেশনের প্রারম্ভ হইতে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই যদি পার্লামেন্ট এই জরুরী আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে তাহা হইলে জরুরী আইন আর কার্যকরী থাকিবে না।

রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভায় ১২ জন সদস্য ও লোকসভায় দুই জন ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্য মনোনীত করিতে পারেন। একমাত্র রাষ্ট্রপতির সম্মতিতেই অর্থ-বিল পার্লামেন্টে উত্থাপিত করা যায়। এই কারণে অর্থবিলে রাষ্ট্রপতির আর সংশোধন প্রস্তাব বা অসম্মতি জ্ঞাপনের প্রয়োজন হয় না।

অঙ্গরাজ্যগুলির আইনপ্রণয়ন ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতির কিছু ক্ষমতা আছে। রাজ্য বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত বিলে রাজ্যপাল সম্মতি না দিয়া রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠাইতে পারেন।

(৩) সামরিক ক্ষমতা—Military Powers.

রাষ্ট্রপতি হইলেন দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। অবশ্য যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপন সম্পর্কে আইনপ্রণয়ন সম্পর্কে পার্লামেন্ট আইন-প্রণয়ন করিবে। সুতরাং রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের বিনা অনুমোদনে যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি স্থাপন করিতে পারেন না।

(৪) অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা—Financial Powers.

প্রত্যেক আর্থিক বৎসরে রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের নিকট যুক্ত-রাষ্ট্রীয় সরকারের সম্ভাব্য আয় এবং ব্যয়ের এক হিসাব উত্থাপন করাইবেন। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত অর্থমঞ্জুরীর কোন দাবী উত্থাপিত হইতে পারে না। নিম্ন পরিষদে অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিতে গেলেও তাঁহার অনুমোদন প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত পার্লামেন্ট সভায় আয় এবং ব্যয়বরাদ্দ-সম্পর্কিত কোন প্রস্তাবই গৃহীত হইতে পারে না। বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে আদায়ীকৃত আয়কর বন্টন করিয়া দেওয়া এবং পাটশুল্কের পরিবর্তে আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গকে সাহায্য প্রদান করিবার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

(৫) বিচার-বিষয়ক ক্ষমতা—Judicial Powers.

সুপ্রীম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে নিয়োগ করা ব্যতীতও রাষ্ট্রপতির অন্য বিচার-বিষয়ক ক্ষমতা আছে। দণ্ডিত ব্যক্তিকে দণ্ডপ্রাপ্তির সময়ে অথবা দণ্ডভোগকালে তিনি মার্জনা করিতে পারেন। শাস্তিভোগকালে কোন ব্যক্তিকে তিনি সাময়িকভাবে মুক্তির আদেশ দিতে পারেন। গুরুতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তি লঘুতর করিবার ক্ষমতাও তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। উল্লিখিত বিচার-বিষয়ক ক্ষমতাগুলি তিনি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারেন: (১) কোর্ট-মার্শাল দ্বারা প্রদত্ত শাস্তিতে। (২) যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনের বিরোধিতা করিবার জন্য প্রাপ্ত শাস্তির ক্ষেত্রে। (৩) মৃত্যুদণ্ডে। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাজ্য সরকারগুলির আইনের বিরোধিতা করিবার জন্য মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য প্রকার শাস্তির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শন করিবার ক্ষমতা নাই।

(৬) কূটনৈতিক ক্ষমতা—Diplomatic Powers.

বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতি হইলেন ভারতের প্রধান প্রতিনিধি এবং এজন্য তাঁহাকে অনেক সময় বিদেশী রাষ্ট্রে ভ্রমণ করিতে হয়। তিনিই বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতগণকে নিয়োগ করেন এবং পররাষ্ট্র দূতগণ রাষ্ট্রপতির নিকট তাঁহাদের পরিচয়পত্রাদি পেশ করেন।

(৭) জরুরী ক্ষমতা—Emergency Powers.

শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর কতকগুলি জরুরী ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে। এই ক্ষমতাগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) জরুরী অবস্থা ঘোষণা (Proclamation of Emergency) শাসনতন্ত্রের ৩৫২ নং সূত্রে বলা হইয়াছে যে, কোন সময়ে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, দেশের নিরাপত্তা যুদ্ধ বা আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার জন্য বিঘ্নিত হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। উপরি-উক্ত কারণগুলি কার্যতঃ উপস্থিত না হইলেও যদি প্রত্যাসন্ন বলিয়া রাষ্ট্রপতি মনে করেন, তাহা হইলেও তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। কেবলমাত্র জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে এইরূপ ঘোষণা করিতে গেলে ঐ রাজ্যের সম্মতির প্রয়োজন হয়। এইরূপ ঘোষণা পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ্ দ্বারা অনুমোদিত না হইলে দুই মাসের অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না। উভয় পরিষদ্ কর্তৃক সমর্থিত হইলে এইরূপ জরুরী ঘোষণা দুই মাসের অধিক কাল বলবৎ থাকিতে পারে।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার ফলে শাসনব্যবস্থায় সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধিত হয়। এই ঘোষণা বলবৎ থাকা কালে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়। এই সময়ে পার্লামেন্ট সভা রাজ্যতালিকাভুক্ত যে-কোন বিষয়ে আইনপ্রণয়ন করিতে পারে। লোকসভার কার্যকাল এক-সময়ে একবৎসর বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার-গুলির মধ্যে রাজস্ব বন্টনের যে ব্যবস্থা আছে, জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি তাহা পরিবর্তন করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত এ অবস্থায় বাক্-স্বাধীনতা, সভাসমিতি করিবার স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক অধিকারগুলি হইতে নাগরিকগণকে বঞ্চিত

করিবার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির উপর অর্পিত হইয়াছে। অধিকন্তু এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রপতির নির্দেশক্রমে মৌলিক অধিকারগুলিকে বিচারালয়ের সাহায্যে বলবৎ করিবার নাগরিক অধিকার স্থগিত থাকিতে পারে।

(খ) রাজ্যগুলির শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা-সংক্রান্ত ঘোষণা (Emergency arising out of the failure of the Constitutional Machinery in the States) ৩৫৬ ধারা অনুসারে যদি কোন সময়ে কোন রাজ্যের রাজ্যপালের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া অথবা অন্যপ্রকারে রাষ্ট্রপতি বুঝিতে পারেন যে, সেই রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় অচল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়া শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি তদ্রূপ ঘোষণা করিতে পারেন। এইরূপ ঘোষণার দ্বারা রাষ্ট্রপতি উক্ত রাজ্যের সমুদয় শাসনক্ষমতা নিজহস্তে গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং সেই রাজ্যের আইন-পরিষদের ক্ষমতা পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত হইবে। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত রাজ্যের উচ্চ বিচারালয়ের ক্ষমতা কোনমতে ক্ষুণ্ণ হইবে না। এইরূপ ঘোষণা সাধারণতঃ দুই মাসের জন্য বলবৎ থাকিবে এবং পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ্ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে আরও ছয় মাস করিয়া ঘোষণাটির মিয়াদ বৃদ্ধি করিয়া তিন বৎসরের অধিক কাল পর্যন্ত ইহাকে বলবৎ রাখা চলিবে না। এইরূপ ঘোষণার দ্বারা ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হয়।

(গ) অর্থ-সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণা (Proclamation of Financial Emergency) সংবিধানের ৩৬০ ধারায় বলা হইয়াছে যে, যদি কোন সময় রাষ্ট্রপতির ধারণা হয় যে, ভারত অথবা ভারতের কোন অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম নষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি অর্থ-সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। উপরি-উক্ত দুইটি ঘোষণার অনুরূপভাবেই এই ঘোষণাটিকে পার্লামেন্টের উভয় পরিষদে উপস্থিত করিতে হইবে এবং এই ঘোষণার স্থায়িত্ব প্রথমোক্ত ঘোষণার নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত হইবে। এই ঘোষণা বলবৎ থাকা-কালে রাজ্য সরকারের আয় ও ব্যয়বরাদ্দ প্রস্তাবসমূহ রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত থাকিবে ও রাজ্য সরকার-গুলির সকল শ্রেণীর কর্মচারীর বেতন হ্রাস করা যাইবে।

সমালোচনা—Criticism.

সংবিধানের প্রারম্ভে প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে, ভারতে একটি সমাজ-তান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সর্বক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করিতে সাহায্য করিবে। দ্বিতীয়তঃ, বিশাল ভারতের বৈচিত্র্যময় আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে। উদ্দেশ্যের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে এই দুইটি ব্যবস্থাকেই সাধু সংকল্প বলিতে হয়।

কিন্তু সংবিধানের ৩৫২, ৩৫৬ ও ৩৬০ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতির হস্তে যে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে গেলে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রপতির হস্তে গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নিধন করিবার ক্ষমতা অর্পণ—এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ অসংগতি এমন কি সাধারণ মানুষেরও দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না।

প্রথমতঃ, বলা যায় যে, দেশে বা দেশের কোন অংশে কার্যতঃ বিপদ ঘটিলে অথবা বিপদের সম্ভাবনা থাকিলে, রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন। এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল যে, জরুরী অবস্থা কার্যতঃ ঘটিয়াছে কিনা অথবা প্রত্যাসন্ন কিনা তাহা একমাত্র রাষ্ট্রপতিই বিচার করিবেন—কোন বিচারালয়ই রাষ্ট্রপতির এই সিদ্ধান্ত বিচার করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ, যদিও এইরূপ ঘোষণার সাহায্যে অঙ্গরাজ্যগুলির গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পঙ্গু করিয়া দেওয়া যায়—এমন কি বিশেষভাবে ঘোষিত মৌলিক অধিকারগুলিকেও স্থগিত রাখা যায়, তথাপি এরূপ ঘোষণা রাজ্যগুলির বিনা সম্মতিতেই করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং এই তিনটি ধারার সাহায্যে গণতন্ত্র এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সমাধি রচনা করা হইয়াছে। পৃথিবীর অন্য কোন গণতন্ত্র অনুসরণকারী রাষ্ট্রে এইরূপ গণতন্ত্র-বিরোধী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার নজির নাই। ইংলণ্ডে একমাত্র যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় হেবিয়াস্ কর্পাস নিয়ম প্রযোজ্য না হইলেও এই নিয়ম প্রযোজ্য কিনা তাহা বিচারালয় বিচার করিতে পারে অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে জরুরী অবস্থা ঘটিয়াছে কিনা তাহা আদালত কর্তৃক বিচারসাপেক্ষ। এ সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল যে, জরুরী অবস্থার স্থায়িত্ব কাল

এবং মৌলিক অধিকার স্থগিতের সময়-সীমা সংবিধান কর্তৃক স্থির করিয়া দেওয়া হয় নাই।

সমালোচকগণ আরও বলেন যে, ভারতের শাসন-কাঠামো আপাত-দৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও কার্যতঃ ইহা একটি এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা। এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, যে-কোন সময়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণা দ্বারা যুগপৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটান সহজসাধ্য।

সত্য বটে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এই জরুরী অবস্থা ঘোষণা পার্লামেন্টের অনুমোদনসাপেক্ষ। কিন্তু ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র সার্থক করিবার প্রধান শর্ত অর্থাৎ ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে মধ্যে পরিবর্তনের (Alteration of Rule—যাহা গ্রেট্ ব্রটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমান) অবর্তমানে পার্লামেন্টের অনুমোদন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের অনুমোদনে পর্যবসিত হইয়াছে। সুতরাং দলীয় ক্ষমতা যাহাতে সর্বত্র অক্ষুণ্ণ থাকে, সে উদ্দেশ্যে এই ধারা তিনটির প্রয়োগ অসম্ভব নহে। ভারতের কোন রাজ্যেও এখন :পর্যন্ত একটি বিশেষ দল ব্যতীত অন্য কোন দল স্থায়িভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে সক্ষম হয় নাই।

তবে জরুরী অবস্থা ঘোষণার সপক্ষে একটি যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে। ভারতের জনগণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সহিত বিশেষ-ভাবে পরিচিত নহে। এ বিষয়ে তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা ও যোগ্যতা অপেক্ষাকৃত স্বল্প। দেশের স্বার্থ-বিরোধী বৈদেশিক প্রচারের আশংকাও বর্তমান। এরূপ অবস্থায় প্রাথমিক গঠনমূলক পর্যায়ে এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

রাষ্ট্রপতির ভিটো প্রয়োগ ক্ষমতা—Presidential Veto.

ভিটো শব্দটির অর্থ হইল শাসনবিভাগীয় শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি কর্তৃক আইন-সভা কর্তৃক প্রস্তাবিত আইন নাকচ করা। ইংলণ্ডের রাজা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি—উভয়েই এই ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। তবে

ইংলণ্ডের রাজার এই ভিটো প্রয়োগ ক্ষমতা ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের পর হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্তমানে বাস্তব ক্ষেত্রে ইংলণ্ডে আর এই ক্ষমতার প্রয়োগ হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কার্যতঃ এখনও পর্যন্ত এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি দুই প্রকারে তাঁহার ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। প্রথমতঃ, আইনসভা প্রস্তাবিত আইনে তিনি সম্মতি প্রদান না করিয়া ১০ দিনের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব আইনসভার পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাইতে পারেন। কিন্তু আইনসভা যদি উক্ত প্রস্তাব দ্বিতীয়বার ⅔ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে পাস করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতির অসম্মতি অর্থাৎ ভিটো সত্ত্বেও প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হয়। আর ⅔ সংখ্যাধিক্য না হইলে রাষ্ট্রপতির ভিটো বলবৎ থাকে। ইহাকে সীমাবদ্ধ ভিটো (Qualified veto) বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি আইনসভা কর্তৃক আনীত কোন প্রস্তাবে সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন না করিয়া ১০ দিনের অধিককাল পর্যন্ত প্রস্তাবটিকে নিজের কাছে রাখিয়া দিতে পারেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের অধিবেশন যদি মুলতুবি হয়, তাহা হইলে প্রস্তাবটি আর পুনরুত্থাপিত হইতে পারে না এবং এইরূপে রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ অসম্মতি অবাধ ভিটো রূপে (Absolute veto) কার্যকরী হয়। এই ভিটোকে সাধারণতঃ পকেট ভিটো বলা হয়।

ভারতে রাষ্ট্রপতিকে নীতিগতভাবে অবাধ ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী করা হইয়াছে। তবে এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা কর্তৃক আনীত কোন প্রস্তাব তিনি সরাসরি বাতিল করিতে পারিবেন না, কিন্তু বে-সরকারী সদস্য কর্তৃক আনীত প্রস্তাব তিনি নাকচ করিতে পারেন।

তৃতীয়তঃ, ভারতের রাষ্ট্রপতি আইনসভা কর্তৃক আনীত কোন প্রস্তাব সরাসরি নাকচ না করিয়া পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাইতে পারেন। কিন্তু আইনসভা যদি সেই প্রস্তাব পুনরায় সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে পাশ করে তাহা হইলে রাষ্ট্রপতিকে সেই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিতেই হইবে। সুতরাং এক্ষেত্রে ভারতের রাষ্ট্রপতির ভিটো ক্ষমতা হইল স্থগিতকারী ভিটো (Suspensive veto)।

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ন্যায় প্রস্তাবটিকে

পুনর্বিবেচনার জন্য আইনসভায় প্রেরণ না করিয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য নিজের কাছে রাখিয়া দিতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ন্যায় ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষেও 'পকেট ভিটো' প্রয়োগের একটা সম্ভাবনা রহিয়াছে।

পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন নাকচ করা ব্যতীতও ভারতের রাষ্ট্রপতিকে রাজ্য আইনসভা প্রণীত আইন নাকচ করিবার ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে। কোন রাজ্যের রাজ্যপাল কর্তৃক রাষ্ট্রপতির সম্মতি-সাপেক্ষে রক্ষিত কোন আইনের প্রস্তাব তিনি নাকচ করিতে পারেন অথবা পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরৎ পাঠাইতে পারেন। এক ক্যানাডা ব্যতীত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা অষ্ট্রেলিয়ায় রাষ্ট্রপতি বা গভর্ণর-জেনারেল এই ক্ষমতার অধিকারী নহেন।

সুতরাং ভারতে পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও রাষ্ট্রপতির উপর ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং এই ভিটো ক্ষমতা বিভিন্ন ধরনের ভিটো ক্ষমতার সংমিশ্রণে পরিকল্পিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি-পদের কয়েকটি শাসনতান্ত্রিক ত্রুটি—Some Constitutional anomalies of the Position of the President.

ভারতের সংবিধান কর্তৃক ভারতের রাষ্ট্রপতি-পদে যে সমুদয় ক্ষমতা আরোপিত হইয়াছে, সে সমুদয় ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কে সংবিধানে কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশ নাই। ফলে রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিজের খুসীমত এই ক্ষমতাগুলি প্রয়োগে কোন শাসনতান্ত্রিক বাধা নাই। শাসনতন্ত্রের ৫৩ ধারা অনুসারে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে এবং এই ক্ষমতা তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করিবেন অথবা তাঁহার অধস্তন কর্মচারিগণের দ্বারা পরিচালিত হইবে। এই ধারার শব্দগত অর্থের দিক দিয়া দেখিলে বলা যায় যে, রাষ্ট্রপতি শুধু নামেমাত্র শাসকপ্রধান নহেন, তাঁহার পক্ষে কার্যতঃ শাসনক্ষমতার সর্বেসর্বা হইবার পথে কোন শাসনতান্ত্রিক অন্তরায় নাই। অনুরূপভাবে সংবিধানের ৭৪ ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতিকে শাসনকার্যে পরামর্শ ও সাহায্য দান করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি

মন্ত্রিসভা থাকিতে হইবে। কিন্তু শাসনতন্ত্রের কোথাও উল্লেখ নাই যে, প্রধানমন্ত্রী-সহ মন্ত্রিসভার পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করিতে রাষ্ট্রপতি আইনতঃ বাধ্য। মন্ত্রিসভা থাকিতে পারে এবং শাসনকার্যে এই মন্ত্রিসভার সহিত রাষ্ট্রপতি পরামর্শও করিতে পারেন। কিন্তু মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতি গ্রহণ না-ও করিতে পারেন। মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি শাসনকার্য পরিচালনা না করিলেও তাহার কোন শাসনতান্ত্রিক প্রতিকার নাই।

সংবিধানগত ত্রুটির জন্য যে রাষ্ট্রপতি স্বৈরাচারী শাসকপ্রধানে পরিণত হইতে পারেন, শাসনতন্ত্রের জনৈক সূক্ষ্ম সমালোচক এই সম্ভাবনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, যদি কোন ক্ষমতাপ্রিয় ব্যক্তি দুরভিসন্ধি লইয়া কৌশলে রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হইতে পারেন, তাহা হইলে শাসনতান্ত্রিক আইনের গলদের সুযোগ লইয়া তিনি স্বৈরাচারী হইতে পারেন। তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া যদি আইনসভার কোন কক্ষ এক-চতুর্থাংশ সদস্যের ভোটে তাঁহাকে অপসারিত করিবার উদ্দেশ্যে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলেও ১৪ দিনের নোটিশ প্রয়োজন হয়। এই ১৪ দিন শেষ হইবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। লোকসভা পুন-র্নির্বাচিত হইলেও নূতন লোকসভার নির্বাচনের ছয় মাসের মধ্যে ইহার অধিবেশন না বসিলেও চলিতে পারে।

মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির খুসীমত কার্যে বহাল থাকে, সুতরাং রাষ্ট্রপতি মন্ত্রি-সভাও ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। তৎপরে তিনি তাঁহার ইচ্ছামত মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারেন—কারণ ভারতের সংবিধান অনুসারে মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্য না হইয়াও ছয় মাস পর্যন্ত মন্ত্রী থাকিতে পারেন। তারপর রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থার ঘোষণা করিয়া বিশেষ আইন (Ordinance) পাশ করিতে পারেন এবং রাষ্ট্রপতি-প্রণীত এই আইনগুলি ছয় মাস বলবৎ থাকে এবং পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনের মত কার্যকরী হয়। জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি বিচারালয়গুলির ক্ষমতাও সংকুচিত করিতে পারেন। এই সময়ে তিনি মৌলিক অধিকারগুলির ভোগ স্থগিত রাখিতে পারেন। রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা অপহরণ করিতে পারেন এবং রাজ্য সরকারগুলিকে প্রদেয় আয়কর ও অন্যান্য কর হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের আর্থিক ক্ষমতা সংকুচিত করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি তাঁহার

বিপক্ষদলের সদস্যগণকে আটক রাখিবার জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দান করিতে পারেন এবং তাঁহার এই নির্দেশ উপেক্ষিত হইলে তিনি শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী রাজ্য সরকারগুলির শাসনতন্ত্র বাতিল করিতে পারেন। রাষ্ট্রের প্রধান সেনাপতি হিসাবে তিনি সামরিক শক্তির সাহায্যে বে-সামরিক কর্তৃপক্ষকে অবদমিত রাখিতে পারেন।

উপরে রাষ্ট্রপতি-পদের ক্ষমতার অপব্যবহারের যে সম্ভাবনার উল্লেখ করা হইল কার্যতঃ সে সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইলেও শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতাগুলির কতকগুলি শাসনতান্ত্রিক বাধা বিধিবদ্ধ করা উচিত ছিল। এরূপ উচ্চাভিলাষী কোন দেশদ্রোহী হয়ত রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না বা কোন রাজনৈতিক দলই এইরূপ লোককে রাষ্ট্রপতি-পদের জন্য মনোনয়ন করিবে না। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও যদি কোন ক্ষমতাপ্রিয় ব্যক্তি কৌশলে নির্বাচন-দ্বন্দ্বে জয়ী হন তাহা হইলে তিনি অন্ততঃ কিছুদিন পর্যন্ত শাসনব্যবস্থায় স্বৈরাচার প্রবর্তন করিতে পারেন।

উপরি-উক্ত সম্ভাবনার কথাগুলি গ্রহণ না করিলেও ভারতের রাষ্ট্রপতিকে শুধুমাত্র নামসর্বস্ব শাসকপ্রধান বলা সমীচীন নহে। শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ না করিয়াও রাষ্ট্রপতি স্বাধীনভাবে কয়েকটি কার্য করিবার অধিকারী। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত না করিয়া তাঁহার গত্যন্তর না থাকিলেও লোকসভায় কোন দলেরই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকার ক্ষেত্রে তিনি নিজ ইচ্ছামত যে-কোন দলের একজনকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে তিনি লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন, কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি যদি মনে করেন যে, লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিবার মত অবস্থা হয় নাই তাহা হইলে এ বিষয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ নাও করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপরিচালনা সম্পর্কে সমস্ত বিষয়ই রাষ্ট্রপতির গোচরীভূত করিতে হইবে। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং শাসন-পরিচালনা ও আইনপ্রণয়ন-সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি জানিতে চাহিতে পারেন এবং এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য হইল রাষ্ট্রপতিকে সমুদয় তথ্য সরবরাহ করা। শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে কোন একজন মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত বিশেষরূপে বিবেচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদের সভায় উপস্থাপিত

করিতে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করিতে পারেন। সুতরাং রাষ্ট্রপতি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইলে শাসন-পরিচালনা ক্ষেত্রে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন।

রাষ্ট্রপরিচালনা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও প্রভাব—Position and Influence of the President of India.

সংবিধান কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর যে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, তাহার তালিকা দেখিলে রাষ্ট্রপতিকে স্বভাবতঃই স্বৈরাচারী শাসক বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই রাষ্ট্রপতির এই ব্যাপক ক্ষমতার তাৎপর্য বুঝিতে পারা যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ন্যায় পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইলেও ভারতের রাষ্ট্রপতির নির্বাচনপদ্ধতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি প্রাথমিক ভোটদাতৃগণ কর্তৃক নির্বাচিত মাধ্যমিক ভোটদাতৃগণ কর্তৃক সংখ্যাধিক্য ভোটে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ফরাসী দেশের ও বর্মার রাষ্ট্রপতিদ্বয় আইনসভার উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে সংখ্যাধিক্য ভোটে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু ভারতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটদানপদ্ধতিতে পার্লামেন্ট সভার উভয় কক্ষে নির্বাচিত সদস্যগণের ও রাজ্যগুলির বিধানসভার সদস্যগণের গোপন ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ভারতের রাষ্ট্রপতির কার্যকাল পাঁচ বৎসর এবং এই মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে তিনি পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ন্যায় ভারতের রাষ্ট্রপতিকেও একমাত্র বিশেষ বিচারপদ্ধতি (Impeachment) অবলম্বন না করিয়া পদচ্যুত করা যায় না। তবে ভারতের পার্লামেন্ট সভার যে-কোন পরিষদই রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে এবং একটি পরিষদ্ কর্তৃক আনীত অভিযোগ অপর পরিষদ্ কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়া ২/৩ সংখ্যক সদস্য দ্বারা যদি গৃহীত হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচার একমাত্র সিনেট-সভা কর্তৃক পরিচালিত হয়।

নূতন সংবিধান অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে শাসনব্যাপারে, আইন-

প্রণয়নে, অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে ও জরুরী অবস্থায় ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে। জরুরী অবস্থার ঘোষণাকালে রাষ্ট্রপতিকে এরূপ ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যাহার বলে তিনি যে শুধু রাজ্য সরকারগুলির উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিতে সক্ষম হইবেন তাহা নয়, এই ক্ষমতাবলে তিনি বাক্-স্বাধীনতা, সভাসমিতি করিবার স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক অধিকারগুলি হরণ করিয়া লইতে পারেন। এমন কি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে মৌলিক অধিকারগুলিকে রক্ষা করিবার যে অধিকার শাসনতন্ত্র কর্তৃক নাগরিকগণের উপর অর্পিত হইয়াছে, সে অধিকার পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির নির্দেশে জরুরী অবস্থার ঘোষণাকালে স্থগিত রাখা যায়। ভারতের শাসনতন্ত্রের এই সূত্রটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিবার আদৌ কোন কারণ ঘটিয়াছে কিনা তাহা কোন বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা স্থিরীকৃত হইতে পারিবে না। জরুরী অবস্থার ঘোষণা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তই হইল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। সত্য বটে যে, রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থার প্রত্যেক ঘোষণাই পার্লামেন্ট সভা কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে, কিন্তু দুই মাস কাল পর্যন্ত এই ঘোষণা পার্লামেন্টের বিনা অনুমোদনে বলবৎ থাকিতে পারে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, শাসনতন্ত্র এক হস্তে রাজ্য সরকারগুলি ও নাগরিকগণকে যে অধিকার দিয়াছে, অপর হস্তে সে অধিকারগুলিকে হরণ করা হইয়াছে।

ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সহিত যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার তুলনা করা যায়, তাহা হইলে ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা-সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা জন্মিতে পারে। মার্কিন দেশের রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্র হইতে তাঁহার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার কার্যকালে তিনি ভোটদাতৃগণ, আইনসভা ও মন্ত্রিপরিষদ-নিরপেক্ষ হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন। তিনি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতিও দুইটি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি মন্ত্রিপরিষদের সহিত পরামর্শ না করিয়া স্বাধীনভাবে আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন এবং প্রস্তাবিত আইন গণভোটে প্রেরণ করিতে পারেন। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতি উপরি-উক্ত কোন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী নহেন। এতদ্ব্যতীত ভারতের রাষ্ট্রপতি হইলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান। গ্রেট বৃটেনের ন্যায় ভারতেরও

দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, শাসকপ্রধান, তিনি রাজাই হউন আর নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিই হউন, মন্ত্রিপরিষদের উপদেশ ও পরামর্শ অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। রাষ্ট্রপতিকে যে সর্বক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে হইবে—একথা স্পষ্টভাবে ভারতের সংবিধানে লিখিত না থাকিলেও সংবিধানে বর্ণিত অন্য কতকগুলি বিধানানুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শমতই শাসনকার্য পরিচালনা না করিয়া উপায় নাই। রাষ্ট্রপতি যদি মন্ত্রিপরিষদ্‌সহ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে মন্ত্রিপরিষদ্ পদত্যাগ করিবে। এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে নিম্ন পরিষদ্ ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে হইবে। নূতন নির্বাচনের ফলে যদি বিদায়ী মন্ত্রিপরিষদ্ যে রাজনৈতিক দলভুক্ত ছিলেন, সেই দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, তাহা হইলে নূতন নির্বাচনের ফল রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে জনগণের আস্থার অভাব সূচিত করিবে। সুতরাং মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ না করিলে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদ-মর্যাদা বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। এতদ্ব্যতীত আরও একটি কারণে রাষ্ট্রপতির সহিত মন্ত্রিপরিষদের মতানৈক্য ঘটিতে পারে না। মার্কিন দেশের মত ভারতেও রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সাধারণতঃ দলীয় ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। পার্লামেন্ট সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ইহার মনোনীত প্রার্থীকে রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচন করিয়া থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃগণ কর্তৃক গঠিত মন্ত্রিপরিষদের উপদেশ ও পরামর্শ উপেক্ষা করিতে পারেন না। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর অর্পিত ব্যাপক ক্ষমতা স-মন্ত্রিপরিষদ্ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই পরিচালিত হইয়া থাকে। অপরপক্ষে, মন্ত্রিপরিষদ্ পার্লামেন্ট সভার নিম্ন-কক্ষ লোকসভার নিকট তাঁহাদের শাসননীতি ও কার্যক্রমের জন্য দায়ী। লোকসভার সদস্যগণ সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে ভারতের নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি। সুতরাং শেষ পর্যায়ে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রপতির হস্তে যে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা জনগণের প্রতিনিধিবৃন্দের অনুমোদন ব্যতীত প্রযুক্ত হইতে পারে না। রাষ্ট্রপতি নিজের খুসীমত এই ব্যাপক ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারেন না। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতের রাষ্ট্রপতি ইংলণ্ডের রাজার

ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অনুরূপ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী। ভারতের শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপরিচালনা সম্পর্কে সমস্ত বিষয়ই রাষ্ট্রপতির গোচরীভূত করিতে হইবে। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং শাসন-পরিচালনা ও আইন-প্রণয়ন-সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি জানিতে চাহিতে পারেন এবং এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য হইল রাষ্ট্রপতিকে সমুদয় সংবাদ সরবরাহ করা। শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে কোন একজন মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত বিশেষরূপে বিবেচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদের সভায় উপস্থাপিত করিতে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করিতে পারেন।

সুতরাং রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিপরিষদের ক্রীড়নক বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় তাঁহার ব্যক্তিগত ক্ষমতা না থাকিলেও যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদা আছে। ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় তিনি মন্ত্রিসংসদকে পরামর্শদান ও কার্যে উৎসাহিত করিতে পারেন। তিনি শাসন না করিলেও শাসনকার্যের উপর তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদার পরিণতি ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা প্রথম দু'চারজন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী যে শাসনতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিবেন তাহার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে।

উপ-রাষ্ট্রপতি—Vice-President.

উপ-রাষ্ট্রপতি পদের উল্লেখ না করিলে ভারতের শাসনকর্তৃপক্ষের বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকে। শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী ভারত রাষ্ট্রের একজন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন। তিনি পার্লামেন্ট সভার উভয় কক্ষের সদস্য লইয়া গঠিত একটি নির্বাচনী সংস্থার দ্বারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট পদ্ধতিতে গোপন ভোটে নির্বাচিত হইবেন। উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর প্রায় রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর যোগ্যতা থাকা চাই।

রাষ্ট্রপতির মৃত্যু ঘটিলে অথবা রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করিলে কিংবা অপসারিত হইলে, নূতন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির স্থলাভিষিক্ত হইবেন। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতির সাময়িক অবসর গ্রহণ কালে অথবা অসুস্থতা নিবন্ধন অথবা অন্য কারণে অনুপস্থিতিকালে

উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির কার্য করিবেন। তিনি সাধারণতঃ আইনসভার উচ্চ কক্ষ রাজ্যসভার সভাপতিত্ব করেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার ক্ষমতা—Prime Minister of India and his or her Powers.

ভারতে গ্রেট বৃটেনের অনুরূপ সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। এই শাসনব্যবস্থায় একজন বংশানুক্রমিক রাজা বা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকিলেও রাষ্ট্রীয় সমুদয় ক্ষমতার উৎস ও আধার হইলেন একজন প্রধানমন্ত্রী, যাঁহার অধীনে একটি মন্ত্রিপরিষদ্ ও নির্বাচিত একটি আইনসভা থাকে যে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হইলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী তাঁহার সমর্থক মন্ত্রীসভা এবং নিষ্ক্রিয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনপুষ্ট হইয়া একনায়কত্বের (Dictatorship) ভূমিকা গ্রহণ করিতেও পারেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী আইনতঃ ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। কিন্তু আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী পদে মনোনীত করা ব্যতীত রাষ্ট্রপতির গত্যন্তর নাই। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীকে স্ব-নির্বাচিত বলিয়া ধরা যায়। যিনি প্রধানমন্ত্রী হইবেন, তাঁহাকে প্রথমে পার্লামেন্ট সভার একটি কক্ষে বিশেষ করিয়া লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইতে হইবে। নির্বাচন শেষ হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যগণ কর্তৃক তাঁহাকে দলের নেতা বলিয়া নির্বাচিত হইতে হইবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বলিয়াই তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী রূপে নিযুক্ত হন। সুতরাং তাঁহার ব্যক্তিত্বও দলের তথা সমগ্র ভোটদাতৃমণ্ডলীর উপর প্রভাব থাকা চাই।

প্রধানমন্ত্রী হইলেন রাষ্ট্রপতির প্রধান উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতা, তিনি হইলেন মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি, আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বলিয়া আইনসভারও নেতা, তিনি হইলেন দেশের নেতা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনিই পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে মনে রাখিতে হইবে

যে, ভারতের সংবিধান রাষ্ট্রপতির হস্তে যে বিপুল ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়াছে তৎসমুদয়ই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও নির্দেশ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিচালিত হয়। এস্থলে আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রধানমন্ত্রী শুধু ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রকৃত শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিমাত্র নহে, রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা হিসাবে তিনি রাজ্যগুলির ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলির শাসন ব্যাপারেও প্রভূত ক্ষমতা পরিচালনা করেন।

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে নিযুক্ত হইলেও মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী ও রাষ্ট্রমন্ত্রিগণ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত হন। এইরূপে সুপ্রীম কোর্টের ও হাইকোর্টগুলির বিচারপতিগণ, রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদের সভাপতি, অ্যাডভোকেট জেনারেল, ভারতের হিসাব পরীক্ষক-প্রধান, রাজ্যপালগণ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন।

তিনি মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি ও নেতা হিসাবে মন্ত্রিপরিষদকে পরিচালিত করেন। তিনি মন্ত্রিগণের মধ্যে দপ্তর বন্টন করেন ও দপ্তর পরিবর্তন করিতে পারেন। তিনি বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন এবং এই সূত্রে সমগ্র বিভাগের কার্যের তদারক করেন। তিনি কোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিবার পরামর্শ রাষ্ট্রপতিকে দিতে পারেন। তিনি সরকারী নীতি নির্ধারণে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং কোন মন্ত্রী তাঁহার সহিত একমত না হইলে মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হয়। কোন মন্ত্রী পদত্যাগ করিলে তাঁহার স্থান শূন্য হয় মাত্র, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিলে সমগ্র মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিয়া যায়। সুতরাং মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ তাঁহার সহকর্মী হইলেও প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রধানমন্ত্রীর আর একটি কার্য হইল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে তিনি আইনসভায় সরকারী নীতি ব্যাখ্যা ও সমর্থন করেন এবং বিরোধী দলগুলির সমালোচনার উত্তর প্রদান করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাকে দলীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখিতে হয়। এজন্য তাঁহাকে জনমতের সংস্পর্শে আসিয়া জনমত প্রভাবিত করিয়া দলীয় শক্তি বৃদ্ধি করিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতে হয়। কারণ প্রধানমন্ত্রীর সকল ক্ষমতার উৎস হইল জনমত।

আইন প্রণয়ন ব্যাপারেও প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা নগণ্য নহে। আইন-মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদে পেশ না করিয়া কোন আইনই পার্লামেন্টে উত্থাপন করিতে পারেন না। দেশের আর্থিক নীতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন-সংক্রান্ত আইনগুলি পরোক্ষভাবে তাঁহার অনুমোদন সাপেক্ষ। কারণ প্রধানমন্ত্রীই হইলেন এ সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কিত সংস্থাগুলির সভাপতি। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কুড়ি দফা অর্থনৈতিক কার্যসূচী ইহার দৃষ্টান্ত।

বৈদেশিক ব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। এ সম্পর্কে ভারতের সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিগুলির অন্যতম পররাষ্ট্র নীতি রূপায়ণের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী অগ্রণী হইয়াছেন। চীন ও পাকিস্তানের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন ও অন্যান্য বহু দেশের সহিত অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিগত সহযোগিতা স্থাপন করিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক ঘোষিত নীতিদ্বয়—(১) যুদ্ধের আতংক দূর করা ও (২) আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর একটি বিশিষ্ট কার্য।

প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা ও পদমর্যাদা—Position and Ir fluence of the Prime Minister.

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদ শাসনতান্ত্রিক আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। শাসনতন্ত্রে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, রাষ্ট্রপতিকে শাসনকার্যে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিবার জন্য একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। পার্লামেন্ট সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কার্যকরী করা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বের বলেই নিযুক্ত হইয়া থাকেন। সাধারণতঃ পার্লামেন্ট সভার নির্বাচিত সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তবে ভারতের সংবিধানে পার্লামেন্ট সভায় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্য নিযুক্ত করিবার বিধান থাকার ফলে মনোনীত সদস্যের প্রধানমন্ত্রী-পদে নিযুক্ত হইবার একটা সুদূর সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায়।

নূতন শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী কার্যতঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইলেন

শাসকপ্রধান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী-পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা করিতে হইলে প্রধানমন্ত্রী শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি ভূমিকা গ্রহণ করেন তাহা জানা আবশ্যক।

প্রথমতঃ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইলেন মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি ও পরিচালক। অন্যান্য মন্ত্রিগণ প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। অন্যান্য মন্ত্রিগণের নিয়োগব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর যতটা স্বাধীনতা আছে, বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর ততটা স্বাধীনতা নাই। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রিনিয়োগ ব্যাপারে অনেক বিষয় চিন্তা করিতে হয়, কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে অনেকটা ব্যক্তিগত ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইতে পারেন। তিনি শুধু মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি নহেন, মন্ত্রিপরিষদকে পরিচালিত করা তাঁহার অন্যতম দায়িত্ব। সহকর্মিগণকে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও যুক্তির প্রভাবে স্বমতে আনয়ন করিতে হয়। যদি কোন মন্ত্রী তাঁহার মত গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে পদত্যাগে বাধ্য করিতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁহার দায়িত্ব বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অপেক্ষাও গুরুতর। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী কোন নির্দিষ্ট সরকারী দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত নহেন। তিনি সাধারণতঃ সকল দপ্তরের কার্যের মধ্যে সমন্বয়সাধন করেন এবং সকল দপ্তরগুলির কার্যের তদারক করেন। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন দপ্তরগুলির কার্যের তদারক করা ব্যতীতও একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে তিনি আইনসভারও নেতা। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে তাঁহাকে দলের সংহতি ও মর্যাদা রক্ষা করিতে হয়। এইজন্য তাঁহাকে জনসাধারণের সংস্পর্শে আসিয়া জনমতকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। তাঁহার প্রধানমন্ত্রিত্ব, দলীয় নেতৃত্ব প্রভৃতি সকল কিছুই তাঁহার জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করে। পার্লামেন্ট সভায় তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নীতি সমর্থন করেন এবং বিরোধী দলগুলির সমালোচনার উত্তর প্রদান করেন। তবে এ বিষয়েও ভারতের প্রধানমন্ত্রী বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা অধিকতর সুবিধার অধিকারী। ভারতে এখনও পর্যন্ত শক্তিশালী বিরোধী কোন দল নাই বলিলেও চলে। যে দলগুলি বিরোধিতা করে তাহারা সংখ্যায় এত অল্প যে, ক্ষমতায় আসীন দলের কখনই সংখ্যাধিক্যের বিরুদ্ধে ভোটে ক্ষমতাচ্যুত হইবার আদৌ কোন আশঙ্কা নাই।

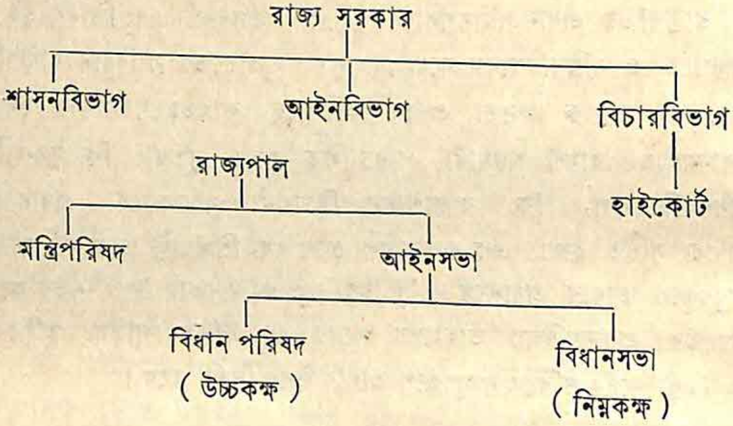
রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা হইলেন প্রধানমন্ত্রী এবং তিনিই হইলেন রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে যোগসূত্র। ভারতের সংবিধান রাষ্ট্রপতির হস্তে যে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে, কার্যতঃ সে সমুদয় ক্ষমতাই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সুতরাং কি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপরিচালনা, কি রাজ্যশাসন পরিচালনা—সর্বক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য সূচিত হয়। এক কথায় বলা চলে যে, শিশুরাষ্ট্র ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে তাহার প্রধানমন্ত্রীর বিচারবুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রিগণ তাঁহাদের পদের যে ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিবেন, প্রধানমন্ত্রী-পদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে তাহার উপর নির্ভর করে।

রাজ্য শাসনকর্তৃপক্ষ

(The State Executive)

রাজ্য শাসনব্যবস্থা—Administration of States.

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের রাজ্য পুনর্গঠন আইন ও পরবর্তী আইনগুলির ভিত্তিতে ভারতের ২২টি রাজ্যে একই ধরনের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। পূর্বতন ক, খ, গ শ্রেণীর রাজ্যগুলি বর্তমানে সমপর্যায়ভুক্ত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সম্পর্কেও প্রত্যেকটি রাজ্য সমান অধিকার ও দায়িত্বের অধিকারী; রাজ্য সরকারগুলির শাসনব্যবস্থা অনেক পরিমাণে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অনুরূপ। প্রত্যেক রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শাসনব্যবস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হইলেন একজন গভর্ণর বা নিয়মতান্ত্রিক রাজ্যপাল। রাজ্যপালকে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে একটি মন্ত্রিপরিষদ আছে। মন্ত্রিপরিষদ ইহার কার্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী। প্রত্যেক রাজ্যে একটি আইনসভা আছে এবং নূতন আইন অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যে একটি উচ্চ বিচারালয় (High Court) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।



রাজ্যপাল—যোগ্যতা, কার্যকাল, বেতন ও নিয়োগ—The Governor—Qualifications, term of Office, Salary and Appointment.

সংবিধানের ১৫৩ ধারা অনুসারে ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে একজন রাজ্যপাল থাকিবেন এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে একাধিক রাজ্যের জন্য একই ব্যক্তি রাজ্যপালরূপে কাজ করিতে পারিবেন। এই ধারা অনুসারে বর্তমানে আসাম, নাগাভূমি, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও মণিপুর—এই নবগঠিত পাঁচটি রাজ্যের জন্য একজন রাজ্যপাল নিযুক্ত ছিলেন। রাজ্যপাল নিযুক্ত হইতে হইলে উক্ত পদপ্রার্থীর অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে এবং তাঁহার বয়স অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ বৎসর হইবে। রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং রাষ্ট্রপতির খুশিমত কার্যে বহাল থাকেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালকে তাঁহার কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে পদচ্যুত করিতে পারেন। রাজ্যপালের নির্ধারিত কার্যকাল হইল পাঁচ বৎসর কিন্তু তাঁহার কার্যকাল শেষ হইলেও নূতন রাজ্যপাল নিযুক্ত হইয়া কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি কার্যভার মুক্ত হইতে পারেন না। রাজ্যপাল স্বেচ্ছায় লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগ করিতে পারেন। রাজ্যপাল কোন লাভজনক ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতে পারিবেন না বা কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য আইনসভাগুলির কোন কক্ষেরই সদস্য থাকিতে পারিবেন না।

রাজ্যপাল মাসিক ৫,৫০০ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া তিনি বিনা ভাড়ায় আবাস গৃহ, ভাতা ও পার্লামেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য সুবিধার অধিকারী। সংবিধানে আরও বলা হইয়াছে যে, রাজ্যপালের কার্যকালে তাঁহার বেতন, ভাতা প্রভৃতির কোন পরিবর্তন করা যাইবে না।

রাজ্যপালের নিয়োগ-পদ্ধতি—Mode of Appointment of the Governor.

রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান। সুতরাং রাজ্যপাল নিয়োগ ব্যাপারে স্বভাবতই তাঁহাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ ও রাজ্য মন্ত্রিপরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া এই নিয়োগ করিতে হয়। এই নিয়োগ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত ইচ্ছার কোন স্থান নাই।

এখন রাজ্যপালের নিয়োগ-পদ্ধতির যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে যে মতভেদ দেখা যায় তাহার আলোচনা করা যাউক।

ভারতের সংবিধান অনুসারে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার একটি মূল নীতি হইল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন (Provincial Autonomy)। এই নীতি অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকারগুলির কতকগুলি নির্ধারিত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার-নিরপেক্ষ ক্ষমতা থাকে এবং রাজ্য সরকারগুলি স্বাধীনভাবে এই নির্ধারিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন নীতি অনুযায়ী রাজ্য সরকারগুলির শাসনব্যবস্থায় শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির অর্থাৎ রাজ্যপালের কেন্দ্র প্রভাবমুক্ত থাকা নিতান্ত আবশ্যক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় রাজ্য সরকারগুলির রাজ্যপালগণ মার্কিন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন না—তাঁহারা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং রাজ্য আইনসভা বিশেষ বিচার পদ্ধতির (Impeachment) মাধ্যমে তাঁহাদের অপসারিত করিতে পারে। কোন কোন রাজ্যে আবার ভোটদাতাগণ রাজ্যপালকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ (Recall) দ্বারা পদচ্যুত করিতে পারে। অস্ট্রেলিয়া সাধারণতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়ও রাজ্যপালগণ রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীর সহিত পরামর্শক্রমে বৃটেনের রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং রাজার খুশিমত রাজ্যপালগণ কার্যে নিযুক্ত থাকেন। রাজ্যপালগণের

নিযুক্তি ও অপসারণের ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কর্তৃত্ব নাই।

ক্যানাডার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের (Provincial Lieutenant Governors) নিযুক্তি ব্যাপারে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। এই দেশের প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে ক্যানাডার গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তিনিই এই প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণকে পদচ্যুত করিতে পারেন এবং এই পদচ্যুতি ঘটাইবার জন্য তাঁহার কাহারও নিকট জবাবদিহি করিতে হয় না। সুতরাং ক্যানাডায় প্রাদেশিক শাসকগণের নিযুক্তি ও অপসারণ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত।

ক্যানাডার পদ্ধতি অবলম্বনে ভারতেও রাজ্যপালের নিযুক্তি ও পদচ্যুতি একান্তভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন। ভারতে রাষ্ট্রপতি হইলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান। সুতরাং ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ ক্ষমতাসীন দল ইহাদের মনোনীত প্রার্থীকে রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত করিয়া রাজ্য শাসনব্যবস্থায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম। ভারতে রাজ্যপালগণকে একান্তভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি বলা যাইতে পারে। এরূপক্ষেত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন যে ব্যাহত হয় সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নাই। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা ছাড়িয়া দিলেও এই ব্যবস্থার আর একটি মারাত্মক ত্রুটি দেখা যায়। কোন রাজ্যে যদি কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দল হইতে ভিন্ন রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে, সেরূপ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি রাজ্যপাল ও ভিন্ন মতাবলম্বী মন্ত্রি-পরিষদের মত-বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয় এবং রাজ্য-শাসনব্যবস্থায় অচল পরিস্থিতি ঘটিতে পারে। ইদানীংকালে পশ্চিমবঙ্গে একাধিকবার এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যপালের নিযুক্তি ও অপসারণ যদিও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূল আদর্শ প্রাদেশিক স্বায়ত্তনীতি ক্ষুণ্ণ করিয়াছে তথাপি এই পদ্ধতির সপক্ষে কতিপয় শক্তিশালী যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, বলা হয় যে, ভারতের রাজ্যপালগণ প্রধানতঃ নিয়মতান্ত্রিক

শাসনকর্তা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের ক্ষমতার ন্যায় ইহাদের প্রকৃত কোন ক্ষমতা নাই। ভারতে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (Discretionary Powers) ব্যতীত অন্যান্য ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হয় এবং এই ক্ষমতা পরিচালনার জন্য মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। রাজ্যপালের আইনসভার নিকট কোন দায়িত্ব নাই। প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ও প্রয়োগকর্তা হইলেন মন্ত্রিমণ্ডলী এবং মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যবর্গ সাধারণতঃ আইনসভার নির্বাচিত সদস্য। এরূপক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক রাজ্যপালের ভোটদাতৃগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবার বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক কালে সকল নির্বাচনই দলীয় ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনীত প্রার্থীই নির্বাচিত হইবেন এবং নির্বাচিত ব্যক্তি কখনই দল-নিরপেক্ষ হইয়া কাজ করিতে পারেন না। রাজ্য-শাসনব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হইলেন রাজ্যপাল। তিনি এরূপ ব্যক্তি হইবেন যে সমস্ত দলাদলির উর্ধ্বে থাকিয়া নিরপেক্ষভাবে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন। সুতরাং এদিক দিয়া দেখিতে গেলেও নির্বাচন অপেক্ষা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্তি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি বলিয়া মনে হয়।

তৃতীয়তঃ, যে-কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই হউক না কেন সর্বত্রই কেন্দ্রীয় প্রাধান্য ও প্রভাব সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার জনক ও আদর্শস্থানীয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও রাজ্য সরকারগুলির উপর কেন্দ্রের এই কর্তৃত্ব বর্তমান। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ, উপদেশ ও সাহায্য ব্যতীত কোন আঞ্চলিক সরকারই ইহার নির্ধারিত কার্যসূচী রূপায়িত করিতে পারে না। সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে এই কেন্দ্র প্রাধান্য শুধু প্রয়োজনীয় নহে—এই কেন্দ্র প্রাধান্য কাম্যও বটে। ভারতের ক্ষেত্রে এই যুক্তিটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং রাজ্যপালগণকে যে বহুক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কার্য সম্পাদন করিতে হয় ইহা অযৌক্তিক নহে।

রাজ্যপালের ক্ষমতা—Powers of the Governor.

প্রত্যেক রাজ্যের শাসনক্ষমতা রাজ্যপালের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে এবং এই ক্ষমতা রাজ্যপাল স্বয়ং অথবা তাঁহার অধস্তন কর্মচারিগণের মাধ্যমে সংবিধানানুমোদিতভাবে পরিচালনা করিবেন। রাজ্যপালের নামেই সমগ্র শাসনক্ষমতা পরিচালিত হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের মত রাজ্যশাসন ব্যাপারে পরামর্শ দিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রিসহ একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে। রাজ্যপাল তাঁহার নিজ ইচ্ছামত যে সমস্ত কার্য করিবার অধিকার শাসনতন্ত্র হইতে পাইয়াছেন, সে সমস্ত ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদ তাঁহাকে কোন পরামর্শ দান করিতে পারে না।

রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা—Discretionary Powers of the Governor.

একমাত্র আসামের রাজ্যপালের উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকাগুলি সম্পর্কে দুইটি বিশেষ ক্ষমতা আছে—যাহা তিনি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া নিজ ইচ্ছায় প্রয়োগ করিতে পারেন। আসাম ব্যতীত অন্য কোন রাজ্যের রাজ্যপালের এরূপ নিজ ইচ্ছামত ক্ষমতাপ্রয়োগের কথা শাসনতন্ত্রের কোথাও উল্লেখ নাই। সংবিধানে আরও বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতি যখন কোন রাজ্যপালকে পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রশাসিত এলাকার শাসকরূপে নিযুক্ত করিবেন তখন রাজ্যপাল উক্ত কেন্দ্রশাসিত এলাকার শাসন মন্ত্রিপরিষদ নিরপেক্ষভাবে পরিচালনা করিবেন। আসামের রাজ্যপালকে এইরূপ কয়েকটি এলাকার শাসনভার গ্রহণ করিতে হয়। তবে এ স্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদি কোন ক্ষেত্রে রাজ্যপালের নিজ ইচ্ছামত ক্ষমতাপ্রয়োগের প্রশ্ন উত্থিত হয় তাহা হইলে এ সম্পর্কে রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। আইনসভায় বহুদলের অস্তিত্বের জন্য যখন কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না, তখন মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ ব্যাপারে রাজ্যপাল তাঁহার ইচ্ছামত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিবার অনুমতি প্রদানসম্পর্কে এবং শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইলে রাজ্যপাল তাঁহার ইচ্ছামত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার সুযোগ পান। সুতরাং দেখা যায় যে, আসামের

রাজ্যপালের উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকা সম্পর্কিত এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ সম্পর্কিত স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাগুলি ব্যতীতও রাজ্যপালগণের শাসন-সংক্রান্ত অন্যান্য স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাও আছে। যদি কোন রাজ্য মন্ত্রিসভা কর্তৃক নির্ধারিত নীতি কেন্দ্রীয় সরকারের মনঃপূত না হয় তাহা হইলে রাজ্যপাল মন্ত্রিপরিষদের অজ্ঞাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে এ বিষয় জানাইতে পারেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি সেই রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার আর একটি উদাহরণ ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজ্যপাল কর্তৃক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পদচ্যুতি। রাজ্যপালের মতে সেই সময় আইন-সভায় উক্ত দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না এবং তিনি আইনসভায় উক্ত সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ হইবার পূর্বেই মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। রাজ্য আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিবার ক্ষেত্রেও রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাও আছে। কিন্তু এস্থলে মন্তব্য করা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির এরূপ কোন স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার উল্লেখ সংবিধানে নাই।

শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা—Executive Powers.

রাজ্যপাল রাজ্য-সংক্রান্ত শাসনবিভাগীয় সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী এবং এই ক্ষমতা তিনি স্বয়ং অথবা অধস্তন কর্মচারিবৃন্দের সাহায্যে পরিচালনা করেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ও মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রিগণকে নিযুক্ত করেন এবং মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বন্টন করেন। তিনি উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতির যোগ্যতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তিকে য়্যাড্‌ভোকেট্ জেনারেল পদে নিযুক্ত করেন। রাষ্ট্রপতি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া রাজ্যের উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন। যে সমস্ত রাজ্যে তপশীলভুক্ত জাতি ও অনুন্নত শ্রেণী আছে, সে সমস্ত রাজ্যে এই সমস্ত অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণসাধনের বিশেষ ভার রাজ্যপালের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে এবং এইজন্য রাজ্যপাল একজন পৃথক মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে পারেন। রাজ্যতালিকাভুক্ত সমুদয় ক্ষমতাই রাজ্যপাল পরিচালনা করেন। তবে যুগ্ম তালিকাভুক্ত

বিষয়গুলির উপর তাঁহার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে।

আইনবিষয়ক ক্ষমতা—**Legislative Powers.**

রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে সমস্ত রাজ্যে আইনসভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট, সেখানে উচ্চ পরিষদে রাজ্যপাল কতিপয় সদস্য মনোনীত করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ইচ্ছা করিলে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়কে উপযুক্ত পরিমাণ প্রতিনিধিত্ব দিবার জন্য উক্ত সম্প্রদায় হইতে কয়েকজন সদস্য বিধানসভায় মনোনীত করিতে পারেন।

রাজ্যপাল আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন, স্থগিত রাখিতে পারেন ও নিম্ন পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন, কিন্তু ইহার কার্যকাল বৃদ্ধি করিতে পারেন না। তিনি আইনসভার যে-কোন পরিষদে বা উভয় পরিষদে বক্তৃতা করিতে পারেন এবং বাণী প্রেরণ করিতে পারেন। কোন বিল আইনে পরিণত করিতে হইলে রাজ্যপালের সম্মতি অপরিহার্য। তিনি সম্মতি দান করিতে পারেন, প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন অথবা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে পারেন। অর্থ-সংক্রান্ত বিল ব্যতীত অন্য বিলগুলিকে তিনি পুনর্বিবেচনার জন্য আইনসভায় ফেরৎ পাঠাইতে পারেন। রাজ্যপাল কর্তৃক পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেরিত বিল যদি আইনসভা কর্তৃক দ্বিতীয়বার গৃহীত হয়, তাহা হইলে রাজ্যপাল উক্ত বিলে সম্মতি দিতে অস্বীকার করিতে পারেন না। আইনসভার অধিবেশন স্থগিত থাকাকালে রাজ্যপাল জরুরী আইন (Ordinance) জারী করিতে পারেন, কিন্তু যে সমস্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রয়োজন, সে সকল ক্ষেত্রে জরুরী আইন জারী করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করিতে হইবে। প্রত্যেকটি জরুরী আইন আইনসভায় পেশ করিতে হইবে এবং অধিবেশন আরম্ভ হইবার পর ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে তৎপূর্বেই উহা বাতিল হইবে।

অর্থবিষয়ক ক্ষমতা—**Financial Powers.**

কোন অর্থবিষয়ক প্রস্তাব আইনসভায় উত্থাপন করিতে হইলে রাজ্যপালের

অনুমতি প্রয়োজন। তাঁহার অনুমোদন ব্যতীত কোন ব্যয়বরাদ্দের দাবী আইনসভায় উত্থাপিত হইতে পারে না। রাজ্যপালের উদ্যোগেই অর্থমন্ত্রী আইনসভায় বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন।

বিচারবিষয়ক ক্ষমতা—Judicial Powers.

রাজ্যপাল দণ্ডদানের আদেশ সংশোধন করিতে পারেন। রাজ্য-সরকারের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত ব্যাপারে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে রাজ্যপাল মার্জনা করিতে পারেন। দণ্ডকাল তিনি হ্রাস করিতে পারেন এবং দণ্ডপ্রদান স্থগিত রাখিতে পারেন। একজাতীয় দণ্ডকে অন্য জাতীয় দণ্ডে পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতাও রাজ্যপালের আছে।

রাজ্যপালের ক্ষমতা পর্যালোচনা করিলে আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাকে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া মনে হয় এবং অনেকে বিষয়ে তাঁহাকে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাজ্যপালের মত স্বৈরাচারী শাসক বলিয়া ধারণা হয়। কিন্তু কার্যতঃ বর্তমান রাজ্যপালগণ নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান ব্যতীত অন্য কিছু নহেন। একমাত্র আসামের উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকা-সম্পর্কিত দুইটি বিষয় এবং স্বেচ্ছাধীন বিষয়সমূহ ব্যতীত অন্য কোন রাজ্যপালই মন্ত্রিপরিষদের সাহায্য ও পরামর্শ ব্যতীত শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন না। রাজ্যপালকে একদিকে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শক্রমে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয়, অপরদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদসহ রাষ্ট্রপতির আদেশ ও নির্দেশ অনুসারে চলিতে হয়। সুতরাং রাজ্যপালের পক্ষে স্বৈরাচারী হইবার সম্ভাবনা আদৌ নাই।

রাজ্যপাল পদের শাসনতান্ত্রিক তাৎপর্য—Constitutional Significance of the Position of the Governor.

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক রাজ্যে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন রাজ্যপাল থাকিবেন। তিনি শাসন ব্যাপারে রাজ্য মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁহার সকল ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন। সুতরাং রাজ্যপাল পদের প্রকৃতি সম্পর্কে বলা যায় যে, তিনি ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর মত নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান, প্রকৃত শাসন

ক্ষমতার অধিকারী হইলেন মন্ত্রিপরিষদ্। কারণ ভারতেও ইংলণ্ডের মত পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে।

রাজ্যপালের সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি আলোচনা করিলে তাঁহাকে ইংলণ্ডের রাণীর মত নিছক নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান বলা যুক্তিযুক্ত হয় না। প্রথমতঃ, রাজ্যপালের নিয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যের শাসক-প্রধানরূপে নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যপাল নিযুক্ত হন এবং রাষ্ট্রপতির খুশিমত তিনি কার্যে বহাল থাকেন। রাজ্যপালের নিয়োগ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শে অধিকতরভাবে পরিচালিত হন। রাজ্যপালের নিয়োগ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রাধান্য শুধু যে যুক্তরাষ্ট্র গঠন নীতি-বিরোধী তাহা নহে, এই ব্যবস্থার দ্বারা রাজ্যপালের পদের নিয়মতান্ত্রিক প্রকৃতি অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, ক্ষমতার দিক দিয়া আলোচনা করিলেও রাজ্যপালকে সম্পূর্ণভাবে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা বলা সমীচীন হয় না। কেন্দ্রে মন্ত্রিপরিষদের সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি যে অর্থে নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান বলিয়া পরিগণিত হন, রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ সম্পর্কে রাজ্যপালকে সে অর্থে নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান বলা চলে না। সংবিধানের ১৬৩ (ক) ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাজ্যপাল যখন তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাসমূহ অথবা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার কোন একটি পরিচালনা করিবেন, তখন তিনি তাহা মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ ব্যতিরেকেই করিতে পারিবেন। অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অপরিহার্য হইলেও স্বেচ্ছাধীন বিষয়সমূহে এই পরামর্শ আদৌ প্রয়োজনীয় নহে। কি কি বিষয় তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাভুক্ত, এ সম্পর্কেও রাজ্যপালের সিদ্ধান্তই হইল চূড়ান্ত এবং রাজ্যপালের এই সিদ্ধান্তের বৈধতার প্রশ্ন কেহ করিতে পারিবেন না। শাসনতন্ত্রের ষষ্ঠ তপশীলের নবম ও অষ্টাদশ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এ সম্পর্কে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত আসামের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে নির্দিষ্ট উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকার শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন এবং এই কার্য তাঁহার স্বেচ্ছাধীন কার্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ ছাড়াই তিনি এই এলাকার শাসন পরিচালনা করিবেন।

সংবিধানের ২৩৯ (২) ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতি যখন কোন রাজ্যপালকে সেই রাজ্যের নিকটবর্তী কোন কেন্দ্রীয় অঞ্চলের শাসন পরিচালনা ভার অর্পণ করিবেন, তখন সেই এলাকার শাসনকার্য রাজ্যপাল মন্ত্রিপরিষদের প্রভাবমুক্ত থাকিয়া (Independently of the Council of Ministers) পরিচালনা করিবেন।

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে সংশোধিত শাসনতন্ত্রের ৩৭১ ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতি গুজরাত ও মহারাষ্ট্র রাজ্য দুইটির নির্দিষ্ট অঞ্চলে উন্নয়নের জন্য উক্ত রাজ্য দুইটির রাজ্যপালদ্বয়কে বিশেষ দায়িত্ব (Special responsibility) প্রদান করিতে পারেন। অনুরূপভাবে পাঞ্জাব ও অন্ধ্ররাজ্যের আইনসভার আঞ্চলিক কমিটি গঠন ও পরিচালনা সম্পর্কে বলা যায় যে, রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালের হস্তে বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত করিতে পারেন।

এক-কক্ষ বনাম দ্বি-কক্ষ আইনসভা—Unicameral Vs.Bicameral Legislature

আইনসভা এক-কক্ষবিশিষ্ট না দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হইবে এ সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার সপক্ষে যে যুক্তিগুলির অবতারণা করা হইয়া থাকে, সেগুলিকে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়। অপরপক্ষে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার সপক্ষে যে যুক্তি দেখান হয়, তাহা এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিরুদ্ধে প্রযোজ্য। বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে অধিকাংশ সভ্যদেশের আইনসভাই দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট। অধিকসংখ্যক লোক যাহাতে সক্রিয়ভাবে শাসনব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে পারে তজ্জন্য দ্বিপরিষদ আইনসভা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একটি অপরিহার্য উপাদান বলিয়া পরিগণিত হয়। দ্বি-কক্ষের সপক্ষে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করা হয়ঃ—

লেকি তাঁহার *Democracy and Liberty* নামক গ্রন্থে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বলিয়াছেন যে, যত প্রকারের শাসনব্যবস্থা আছে বা হইতে পারে তাহাদের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এক-কক্ষ আইনসভাবিশিষ্ট সরকার হইল নিকৃষ্টতম। এই ব্যবস্থায় আইনপরিষদের একত্ব প্রতিষ্ঠিত

হইয়া ইহা পূর্ণ স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হইতে পারে। এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার এই স্বৈরাচারী ক্ষমতায় বাধা দিবার জন্য দ্বিতীয় কক্ষের প্রয়োজন অপরিহার্য। দ্বিতীয় কক্ষের অবর্তমানে এক-কক্ষ আইনসভা অসংযত ও পক্ষপাতমূলক আইন প্রণয়ন করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিপন্ন করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, আইনসভা দুইটি পরিষদ্ লইয়া গঠিত হইলে প্রত্যেকটি আইন উপযুক্তভাবে বিবেচিত হইতে পারে। একটিমাত্র কক্ষ থাকিলে বিশেষ বিচার-বিবেচনাহীন ও দ্রুত আইন রচিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। আইন-সভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হইলে সাময়িক উত্তেজনার বশে বা সতত পরিবর্তনশীল জনমতের চাপে কোন আইন-প্রণয়ন সম্ভব হয় না। দুইটি পরিষদ্ কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে কোন আইন বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সুতরাং একটি পরিষদ্ সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া আইন-প্রণয়নের প্রস্তাব আনয়ন করিলেও অপর কক্ষ তাহাকে বাধা দিতে পারে। তৃতীয়তঃ, আইন-প্রণয়ন হইল জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্য। সুতরাং বিশেষ বিবেচনা ব্যতীত আইন প্রণয়ন করা যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু এই বিশেষ বিবেচনা করিবার জন্য সময়ের প্রয়োজন। আইনসভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হইলে আইনের প্রস্তাব ও শেষ অধ্যায়ের মধ্যে এত অবসর পাওয়া যায়, যাহাতে প্রত্যেকটি প্রস্তাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইতে পারে। চতুর্থতঃ, আইনসভা দুইটি পরিষদ্ দ্বারা গঠিত হইলে একটি পরিষদ্ দ্বারা আনীত আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি অপর পরিষদ্ কর্তৃক সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। একটি পরিষদ্ থাকিলে অনেক সময় আইনের প্রত্যেক প্রস্তাব বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার মত সময় বা যোগ্যতা সেই পরিষদের না থাকিতে পারে। কিন্তু আইনসভা দ্বি-কক্ষ হইলে অপর পরিষদ্ প্রস্তাবিত আইন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া ইহার গলদ দূর করিতে পারে। পঞ্চমতঃ, দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় দেশের বিভিন্ন মতাবলম্বী সকল শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধি প্রেরণ সম্ভব হয়। প্রায় সকল দেশেই এমন সমস্ত ব্যক্তি আছেন যাঁহারা নির্বাচনব্যাপারে বীতস্পৃহ অথচ শাসন-পরিচালন কার্যে তাঁহাদের এরূপ যোগ্যতা আছে যে, তাঁহাদের পরামর্শ ও উপদেশ জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষসাধনে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুভূত হয়। উচ্চ পরিষদ্ থাকিলে এই সকল যোগ্য ব্যক্তিদের মনোনয়ন দ্বারা

উচ্চ পরিষদের সদস্য করা যাইতে পারে। ষষ্ঠতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় উচ্চ পরিষদের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমসংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া উচ্চ পরিষদ্ গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় উচ্চ পরিষদ্ বিভিন্ন অঞ্চলগুলির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয় বলিয়া আঞ্চলিক স্বাধীনতা ও স্বার্থসংরক্ষণে ইহার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রের আইনসভা দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিপক্ষে অনেক যুক্তি দেখান যাইতে পারে। ল্যাস্কি প্রভৃতি অনেক প্রগতিশীল লেখক ইহার সমর্থন করেন নাই। তাঁহাদের মতে আইন-প্রণয়নের জন্য একটি পরিষদ্ই যথেষ্ট। উচ্চ পরিষদ্ বাহুল্যমাত্র। আধুনিককালে কোন আইনই দ্রুত ও বিশেষ বিচার-বিবেচনা না করিয়া প্রণয়ন করা হয় না। এইজন্য আইন প্রণয়নের পদ্ধতি প্রত্যেক দেশেই জটিল ও দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিবার জন্য একটি উচ্চ পরিষদের আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়তঃ, উচ্চ পরিষদ্ কার্যকরীভাবে নিম্ন পরিষদের আইন-প্রণয়নকার্যে বাধা দিতে পারে না। প্রায় সকল দেশেই নিম্ন পরিষদ্ অধিক ক্ষমতার অধিকারী, সুতরাং নিম্ন পরিষদ্ ইচ্ছা করিলে উচ্চ পরিষদের আপত্তি সত্ত্বেও আইন-প্রণয়ন করিতে পারে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে উচ্চ পরিষদের কোন সার্থকতা নাই। তৃতীয়তঃ, উচ্চ পরিষদ্ থাকিলে বিভিন্ন শ্রেণীর ও যোগ্য ব্যক্তিদের মনোনয়ন দ্বারা উচ্চ পরিষদের সদস্য করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি-বিশেষ বা শ্রেণী-বিশেষের জন্য পৃথক্ নীতি অনুসৃত হয়। সেইজন্য মনোনয়ন ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র-বিরোধী ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে। চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় উচ্চ পরিষদ্ অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রে প্রাদেশিক বা স্থানীয় সরকারগুলির ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হয় ও যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ বিচারালয়ের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। উচ্চ পরিষদ কোনক্রমেও আঞ্চলিক সরকারগুলির ক্ষমতা সংরক্ষণে সাহায্য করিতে পারে না। ইহা ছাড়া, আঞ্চলিক ভিত্তিতে নির্বাচিত হইলেও উচ্চ পরিষদের সদস্যগণ ভোটদান দ্বারা তাঁহাদের নিজ প্রদেশ অপেক্ষা দলীয় নির্দেশের

প্রতি অধিক আনুগত্য প্রদর্শন করেন। পঞ্চমতঃ, দুইটি পরিষদ্ ব্যয়সাপেক্ষ। ষষ্ঠতঃ, দুইটি পরিষদ থাকিলে অনেক সময় উভয়ের মধ্যে বিরোধের ফলে কার্যে অযথা বিলম্ব হয়। সপ্তমতঃ, উচ্চ পরিষদ কিভাবে সংগঠিত হইবে সে সম্বন্ধেও এখন পর্যন্ত কোন সন্তোষজনক নীতি উদ্ভাবিত হয় নাই। উভয় পরিষদের মধ্যে ক্ষমতাবন্টনের ব্যাপারেও যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। এই সমস্ত কারণে ফরাসী লেখক আবে সিঁয়ে (Abbe Seieyes) বলেন, উচ্চ পরিষদ্ যদি নিম্ন পরিষদের সহিত একমত হয় তবে তাহা বাহুল্যমাত্র, আর উচ্চপরিষদ্ যদি নিম্নপরিষদের সহিত একমত না হয়, তবে তাহা অত্যন্ত হানিকর। উচ্চপরিষদ্ যতই কার্যকরী হউক না কেন, জনগণের প্রতিনিধিগণ লইয়া গঠিত নিম্নপরিষদের কার্যে বাধা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ইহার থাকিতে পারে না। উল্লিখিত কারণগুলির জন্য দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার উপযোগিতা অনেকে অস্বীকার করেন।

ভারতের রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে উচ্চ পরিষদের প্রয়োজনীয়তা —Utility of Second Chamber in the Indian States.

নূতন সংবিধান অনুসারে ভারতে ছয়টি রাজ্যে—বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ—দ্বি-পরিষদ্ আইনসভার প্রবর্তন করা হইয়াছিল। রাজ্য পুনর্গঠন আইন অনুসারে বর্তমানে মহীশূর ও মধ্যপ্রদেশ রাজ্য দুইটির আইনসভা দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত হইয়াছে। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৭নং বিধান পরিষদ্ আইন অনুসারে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য ও বর্তমানে নূতন মহারাষ্ট্র রাজ্যের জন্য দ্বি-পরিষদের ব্যবস্থা হইয়াছে। অপরপক্ষে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্য দুইটির উচ্চ পরিষদ লোপ করা হইয়াছে! কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে দ্বি-পরিষদের উপযোগিতা থাকিলেও রাজ্য সরকারের ইহার উপযোগিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারই হইল কার্যতঃ প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। রাজ্য সরকারগুলির এরূপ বিশেষ কোন দায়িত্ব নাই, যে জন্য বিশেষ বিচার-বিবেচনার উদ্দেশ্যে একটি উচ্চ পরিষদের প্রয়োজন হইতে পারে। পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বিশেষ করিয়া বলা যাইতে পারে যে, দেশবিভাগের ফলে এই রাজ্যগুলির আয়তন ও লোকসংখ্যা এত পরিমাণে

হ্রাস পাইয়াছে যে, এই ক্ষুদ্র রাজ্য দুইটির পক্ষে একটি অতি-ব্যয়সাপেক্ষ উচ্চ পরিষদের আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। একটি উচ্চ পরিষদ্ পোষণের গুরু ব্যয়ভার জনসাধারণকে অনর্থক বহন করিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ পরিষদ্ ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে বিলুপ্ত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা (Union Legislature)

পার্লামেণ্ট—Parliament.

রাষ্ট্রপতি ও দুইটি আইন-পরিষদ্ লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা অর্থাৎ পার্লামেন্ট গঠিত। উচ্চ পরিষদ্‌কে বলা বলা হয় রাজ্যসভা, আর নিম্ন পরিষদ্ লোকসভা নামে অভিহিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা অন্য রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার অনুরূপভাবে ভারতের পার্লামেন্ট সভার সার্বভৌম ক্ষমতা শাসনতন্ত্র কর্তৃক সীমায়িত হইয়াছে। শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যেই উহার ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ, মৌলিক অধিকার-বিরোধী কোন কার্য করিলে এই সভার কার্য সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক কিছু ক্ষেত্রে বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত রাজ্য সরকারগুলির কার্যক্ষেত্রের উপর সাধারণতঃ এই সভার কোন ক্ষমতা নাই। সুতরাং বৃটিশ পার্লামেন্ট সভার মত ভারতের পার্লামেন্ট সভাকে সার্বভৌম আইনসভা (Sovereign law-making Body বলা চলে না।

পার্লামেন্টের সদস্য হইবার যোগ্যতা, ইহার কার্যকাল ও অধিবেশন—Qualifications of Members and Duration and Sessions of the Indian Parliament.

১। যোগ্যতা ঃ প্রত্যেক দেশেই আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হইতে গেলে কতিপয় যোগ্যতার অধিকারী হইতে হয়। পার্লামেন্টের কার্যকারিতা কিছু পরিমাণে এই যোগ্যতা-ভিত্তিক নির্বাচনের উপর নির্ভর করে। ভারতে পার্লামেন্ট সভার উভয় কক্ষের সদস্যপদ-প্রার্থিগণের নিম্নলিখিত যোগ্যতা-গুলির অধিকারী হইতে হয়।

প্রথমতঃ, সদস্য-পদপ্রার্থীর অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, রাজ্যসভার ক্ষেত্রে নির্বাচনপ্রার্থীর অন্যূন ৩০ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে এবং লোকসভার সদস্য পদপ্রার্থীর বয়স অন্ততঃ ২৫ বৎসর হইবে। তৃতীয়তঃ, পদপ্রার্থিগণ সুস্থ ও স্বাভাবিক মস্তিষ্কের লোক হইবেন। উন্মাদ, ভবঘুরে, দেউলিয়া (Bankrupt) বলিয়া আদালত কর্তৃক ঘোষিত কোন ব্যক্তি নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারে না। চতুর্থতঃ, কোন ব্যক্তি যদি বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে, তাহা হইলে সেরূপ ব্যক্তি পার্লামেন্টের সদস্য পদপ্রার্থী হইতে পারে না। পঞ্চমতঃ, ভারত সরকার অথবা রাজ্য সরকারের কোন লাভজনক কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিও সদস্যপদের জন্য প্রার্থী হইতে পারে না। ষষ্ঠতঃ, পার্লামেন্ট আইন পাস করিয়া পার্লামেন্টের সদস্য হইবার বিশেষ যোগ্যতা বা অক্ষমতা স্থির করিয়া দিতে পারে।

২। কার্যকাল : ভারতের পার্লামেন্ট সভার উচ্চ কক্ষ রাজ্যসভা একটি স্থায়ী সংস্থা অর্থাৎ এই কক্ষ নিম্ন কক্ষ লোকসভার অনুরূপ পদ্ধতিতে ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় না বা সমুদয় সদস্য একসঙ্গে অপসারিত বা নির্বাচিত হন না। প্রতি দুই বৎসর অন্তর রাজ্যসভার $\frac{১}{৩}$ অংশ সদস্য বিদায় গ্রহণ করেন এবং নব নির্বাচিত $\frac{১}{৩}$ অংশ সদস্য তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত হন। এইরূপে প্রতি দুই বৎসর অন্তর কিয়দংশ সদস্য পরিবর্তন সাহায্যে উচ্চ কক্ষকে পরিবর্তনশীল জনমতের সহিত যুক্ত রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ কক্ষ সিনেটের সদস্যগণ ৬ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন এবং $\frac{১}{৩}$ অংশ সদস্য প্রতি দুই বৎসর অন্তর পদত্যাগ করেন এবং তাঁহাদের স্থলে নূতন সদস্য নির্বাচিত হন।

লোকসভার কার্যকাল হইল ৫ বৎসর। কিন্তু ৫ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্ট সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার অর্থ হইল লোকসভার পরিসমাপ্তি—রাজ্যসভা স্থায়ী, ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে না।

পার্লামেন্টের কার্যকাল সম্পর্কে তিনটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, পার্লামেন্টের যে-কোন কক্ষের কাজ সাময়িকভাবে মুলতুবি

(Adjournment) রাখা যায়। সভার অধ্যক্ষই সভার কাজ বন্ধ রাখিতে পারেন। ইহার ফলে সভার কাজ অপরিসমাপ্ত থাকিতে পারে, কিন্তু সভা পুনর্বার মিলিত হইলে অপরিসমাপ্ত কাজগুলি সমাপ্ত করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি সভার বৈঠক স্থগিত (Prorogation) রাখিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সভার অধিবেশন স্থগিত হইলে সভার আরব্ধ কার্য এবং সভায় আনীত সাধারণ সম্পর্কিত বিলগুলির (Public Bills) পরিসমাপ্তি ঘটে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্ট একেবারেই ভাঙ্গিয়া (Dissolution) দিতে পারেন। ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে নূতন নির্বাচন ব্যতীত পার্লামেন্টের অধিবেশন বসিতে পারে না। তবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণায় পার্লামেন্টের কার্যকাল শেষ হইলেও আইন পাস করিয়া ইহার কার্যকাল বৃদ্ধি করা যায়।

৩। অধিবেশন : রাষ্ট্রপতি সভার অধিবেশন আহ্বান করেন। সভার দুইটি অধিবেশনের মধ্যে ৬ মাসের অধিক ব্যবধান থাকিবে না। অধিবেশনের প্রারম্ভে রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের যুগ্ম সভায় ভাষণ দান করেন ও তৎপরে এই ভাষণের উপর বিতর্ক হয়। ভাষণের জন্য সভা রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করে। সাধারণতঃ একটি অধিবেশন শেষ হইবার পূর্বে পরবর্তী অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করা হয়।

রাজ্যসভা—Council of States.

রাজ্যসভা অনধিক ২৫০ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। তন্মধ্যে ১২ জন সদস্যকে রাষ্ট্রপতি সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজসেবক বা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত করেন। রাজ্যসভার সদস্যগণ প্রত্যেক রাজ্যের নিম্ন কক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে পরোক্ষে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ও ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারি অনুসারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা ২০৬ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে ২৪৪ হইয়াছে। রাজ্যসভার এই ২৪৪ জন সদস্য নিম্নলিখিত হারে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে বন্টন করা হইয়াছে :—

রাজ্য		রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা	কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল		রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা
১। অন্ধ্রপ্রদেশ	...	১৮	১। দিল্লী	...	৩
২। আসাম	...	৭	২। পণ্ডিচেরী	...	১
৩। বিহার	...	২২	৩। মিজোরাম	...	১
৪। গুজরাত	...	১১	৪। অরুণাচল প্রদেশ	...	১
৫। মহারাষ্ট্র	...	১৯	রাজ্যগুলি—		২২৬
৬। কেরল	...	৯	কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল—		৬
৭। মধ্যপ্রদেশ	...	১৬	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক		
৮। তামিলনাড়ু	...	১৮	মনোনীত—		১২
৯। কর্ণাটক	...	১২			———
১০। উড়িষ্যা	...	১০	মোট—		২৪৪
১১। পাঞ্জাব	...	৭			
১২। রাজস্থান	...	১০			
১৩। উত্তরপ্রদেশ	...	৩৪			
১৪। পশ্চিমবঙ্গ	...	১৬			
১৫। জম্মু ও কাশ্মীর	...	৪			
১৬। নাগাভূমি	...	১			
১৭। হরিয়ানা	...	৫			
১৮। হিমাচলপ্রদেশ	...	৩			
১৯। মণিপুর	...	১			
২০। ত্রিপুরা	...	১			
২১। মেঘালয়	...	১			
২২। সিকিম	...	১			
		———			
		২২৬			

রাজ্যসভার সংগঠন—Organisation of the Council of States.

রাজ্যসভায় সদস্য নির্বাচিত হইতে হইলে প্রার্থীর অন্ততঃ ৩০ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হইতে হয়। রাজ্যসভা স্থায়ী পরিষদ্। রাষ্ট্রপতি ইহাকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন না। রাজ্যসভার সদস্যগণ ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন কিন্তু প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর এই সভার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের অবসর গ্রহণ করিতে হয়। ভারতে রাজ্যসভার গঠনপ্রণালীতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, রাজ্যসভার অধিকাংশ সদস্য পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন। দ্বিতীয়তঃ, ১২ জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক রাজ্য হইতে কত সংখ্যক সদস্য রাজ্যসভায় প্রেরিত হইবে, সেই সংখ্যা সেই রাজ্যের জনসংখ্যার ভিত্তিতে স্থির হয়।

রাজ্যসভার এই সাংগঠনিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি অ-গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত সদস্যগণের জনসাধারণের সহিত কোন যোগসূত্র থাকে না। এই পদ্ধতিতে যোগ্যতা অপেক্ষা দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের উপর অধিক জোর দেওয়া হয়। ফলে আইনসভার দক্ষতার মান নিম্নগামী হয়। মনোনয়ন দ্বারা প্রার্থী নির্বাচনের সপক্ষে বলা যায় যে, এই পদ্ধতির সাহায্যে নির্বাচন দ্বন্দ্বে অনিচ্ছুক অথচ অন্য দিক দিয়া যোগ্য ব্যক্তিগণকে আইনসভায় স্থান দিয়া আইনসভার মর্যাদা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু উপরি-উক্ত যুক্তি অসার, কারণ দলীয় শাসনব্যবস্থায় সর্বত্রই দলের সমর্থনকারী ব্যতীত শাসক দলের বিরুদ্ধে সমালোচককে অল্প ক্ষেত্রেই আইনসভায় সদস্যরূপে মনোনয়ন করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ কক্ষের সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। এই সমস্ত দেশে মনোনয়ন পদ্ধতির কোন স্থান নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়তন ও জনসংখ্যা নির্বিচারে প্রত্যেকটি রাজ্য উচ্চকক্ষ সিনেট সভায় সমান সংখ্যক (২ জন করিয়া) প্রতিনিধি পাঠায়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের চার শ্রেণীর রাজ্যগুলির প্রত্যেক শ্রেণীর রাজ্য হইতে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া

উচ্চ-কক্ষ জাতিপুঞ্জ সোভিয়েত (The Soviet of Nationalities) গঠিত হয়। কিন্তু ভারতের উচ্চ-কক্ষ রাজ্যসভা গঠনে যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের একটি অপরিহার্য উপাদান অর্থাৎ রাজ্যগুলির সমান প্রতিনিধিত্ব অধিকার নীতি বর্জন করা হইয়াছে। ফলে ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির পক্ষে বৃহৎ কয়েকটি রাজ্য-জোটের প্রভাবমুক্ত থাকিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করা সম্ভব না হইতেও পারে।

উপ-রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন। সদস্যগণ আর একজন সহসভাপতি নির্বাচন করেন।

রাজ্যসভার ক্ষমতা ও কাজ—Powers and Function of the Council of States.

রাজ্যসভা হইল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ-কক্ষ। এই কক্ষের ক্ষমতা ও কাজগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়, যথা, আইন-প্রণয়ন বিষয়ক, অর্থ-সংক্রান্ত, শাসন-সংক্রান্ত, শাসনতন্ত্র-সংক্রান্ত ও বিবিধ।

এক অর্থ-সংক্রান্ত আইনের প্রস্তাব ব্যতীত অন্য সকল প্রস্তাব রাজ্যসভায় উত্থাপিত হইতে পারে এবং এই সভার সম্মতি ব্যতীত কোন প্রস্তাবই আইনে পরিণত হইতে পারে না। নিম্ন-কক্ষ লোকসভা কর্তৃক আনীত প্রস্তাবে রাজ্যসভা সম্মতি দিতে পারে বা সংশোধন করিতে পারে বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। উভয় কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিলে রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশন, আহ্বান করাইতে পারেন। কিন্তু লোকসভার সদস্যসংখ্যার সংখ্যাধিক্যের ফলে যুক্ত অধিবেশনে লোকসভার মতই গৃহীত হয়। রাজ্যসভা যদি ছয় মাসের মধ্যে লোকসভা কর্তৃক গৃহীত আইনের প্রস্তাবে সম্মতিদানে বিরত থাকে তাহা হইলে ছয় মাস অন্তে রাজ্যসভার বিনা সম্মতিতেই প্রস্তাবটি লোকসভার ইচ্ছানুসারে আইনে পরিণত হয়। সুতরাং সাধারণ আইনপ্রণয়নে রাজ্যসভা মাত্র ছয় মাস কাল আইনপ্রণয়নে বাধা দিতে পারে—আইনপ্রণয়ন একেবারে স্থগিত রাখিবার ক্ষমতা ইহার নাই।

রাজ্যসভা অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে না। লোক-সভা কর্তৃক উত্থাপিত অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব রাজ্যসভায় প্রেরিত হইলে

রাজ্যসভা এই প্রস্তাব সংশোধন করিতে পারে, কিন্তু এই সংশোধন লোকসভা কর্তৃক গৃহীত না হইলে কার্যকরী হয় না। লোকসভা যে আকারে অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব পাস করে, রাজ্যসভা যদি সেই প্রস্তাবে সম্মতিদান না করে তাহা হইলে ১৪ দিন পর প্রস্তাবটি লোকসভার ইচ্ছামত আইনে পরিণত হয়।

মন্ত্রিগণ লোকসভার নিকট দায়ী। রাজ্যসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া মন্ত্রিপরিষদ্‌কে অপসারিত করিতে পারে না। তবে প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে, মুলতবি প্রস্তাব আনয়ন করিয়া ও সাধারণভাবে মন্ত্রিগণের কার্যের সমালোচনা করিয়া রাজ্যসভা মন্ত্রিপরিষদের কার্যের উপর প্রস্তাব বিস্তার করিতে পারে। কোন মন্ত্রী রাজ্যসভার সদস্য না হইলেও ইহার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া বিতর্কে যোগদান করিতে পারেন এবং নিজ নিজ বিভাগ-সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দান করিতে পারেন, কিন্তু ভোট দিতে পারেন না।

শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও রাজ্যসভা লোকসভার সহিত সম-ক্ষমতার অধিকারী। রাজ্যসভা শাসনতান্ত্রিক আইন প্রবর্তনের প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারে, কিন্তু এরূপ প্রস্তাব শুধু উভয় কক্ষের নির্ধারিত সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত হয়। উভয় কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিলে যুক্ত অধিবেশন বসে। কিন্তু যুক্ত অধিবেশনে সংখ্যাধিক্যের বলে লোকসভার জয় সুনিশ্চিত।

ইহা ছাড়া, রাজ্যসভা দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যাধিক্য ভোটে প্রস্তাব পাস করিয়া জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কোন রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিবার অনুরোধ করিতে পারে। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও অপসারণে রাজ্যসভা অংশ গ্রহণ করিতে পারে। উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও অপসারণ ব্যাপারে রাজ্যসভা লোকসভার সহিত একযোগে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। লোকসভার সহিত একযোগে প্রস্তাব পাস করিয়া সুপ্রীম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে পারে।

রাজ্যসভার ক্ষমতা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ রাজ্যসভাকে কোনরূপ বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী না করিয়া ইহাকে শুধু একটি সংশোধনী (Revisory) কক্ষ হিসাবে গঠন করিয়া ভারতে গণতান্ত্রিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

উচ্চ পরিষদ্ হিসাবে রাজ্যসভার স্থান—Position of the Council of States as a Second Chamber.

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বিশেষ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দ্বি-পরিষদ্ আইনসভা শাসনব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করিবার পূর্বেও ভারতে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় দ্বি-পরিষদ্ আইনসভা বর্তমান ছিল। স্বাধীন ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণও ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দ্বি-পরিষদ্ আইনসভার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করিয়া রাজ্যসভার সৃষ্টি করেন এবং এখনও পর্যন্ত ভারতে এই উচ্চ পরিষদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়া ইহার উচ্ছেদের জন্য কোন জনমত গঠিত হয় নাই। সুতরাং ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় যে রাজ্যসভার কিছু গুরুত্ব আছে ইহা অনস্বীকার্য।

ভারতে রাজ্যসভার বিরুদ্ধে সাধারণতঃ দুই দিক দিয়া বিরূপ সমালোচনা করা হয়। প্রথমতঃ বলা হয় যে, আইনসভা হিসাবে রাজ্যসভা অগণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। লোকসভার সদস্যগণ সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি হইয়া গঠিত, আর রাজ্যসভার কিয়দংশ সদস্য পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতিতে রাজ্যগুলির বিধানসভার সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন এবং অপর অংশ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে যাঁহারা রাজ্যসভায় সদস্য নির্বাচিত হন তাঁহারা দলীয় ভিত্তিতেই নির্বাচিত হইয়া থাকেন। দলীয় মনোনীত ব্যক্তিগণকেই বিধানসভার সদস্যগণ একযোগে ভোট দিয়া নির্বাচিত করেন। এই পদ্ধতিতে জনগণের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোন স্থান নাই। সুতরাং এই পদ্ধতিকে নির্বাচন না বলিয়া দলীয় মনোনয়ন বলা যাইতে পারে। শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর অর্পিত ক্ষমতাগুলি সাধারণতঃ তিনি মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালনা করেন—সুতরাং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যসভায় যে সমস্ত সদস্য মনোনীত হন, তাঁহারাও ক্ষমতাসীন দলেরই লোক। সুতরাং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্যগণ যে অবিসংবাদিরূপে জ্ঞানী ও গুণী হইবেন তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

আর একদিক দিয়া ভারতের রাজ্যসভার গঠনপ্রকৃতির ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড

প্রভৃতি দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যগুলি সম-মর্যাদার অধিকারী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে আয়তন, জনসংখ্যা-নির্বিশেষে সকল আঙ্গিক রাজ্যগুলিই উচ্চ পরিষদে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অধিকারী। কিন্তু ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এই সমান প্রতিনিধিত্বের নীতি গ্রহণ করা হয় নাই। রাজ্যসভার আসনগুলি জন-সংখ্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে জনবহুল রাজ্যগুলির প্রতিনিধিসংখ্যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির প্রতিনিধি-সংখ্যার তুলনায় অনেক অধিক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভারতের রাজ্যসভায় আসাম, কেরল, উড়িষ্যা, জম্মু ও কাশ্মীর এই চারিটি রাজ্যের সম্মিলিত প্রতিনিধিসংখ্যা হইল ৩০ জন, আর একমাত্র উত্তরপ্রদেশের সদস্য-সংখ্যা হইল ৩৪ জন। এরূপ ক্ষেত্রে বৃহৎ রাজ্যগুলি একজোটে ক্ষুদ্র রাজ্য-গুলির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিতে পারে এবং ভারতে ইহার সংবিধানগত কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা নাই। সুতরাং গঠনপ্রকৃতির দিক দিয়া ভারতের উচ্চ-কক্ষ রাজ্যসভার এমন কোন আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নাই, যেজন্য এই সভা দেশে ও বিদেশে বিশেষ মর্যাদা দাবী করিতে পারে।

রাজ্যসভার ক্ষমতা ও কার্য পর্যালোচনা করিলেও দেখা যায় যে, সাধারণ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে রাজ্যসভা মাত্র ছয় মাসকাল আইন-প্রণয়নে বাধা দিতে পারে—আইন-প্রণয়ন একেবারে স্থগিত রাখিবার ক্ষমতা ইহার নাই। রাজ্যসভার এই দুর্বলতা গণতান্ত্রিক আদর্শসম্মত বলা যাইতে পারে; কারণ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত লোকসভার অগ্রাধিকার ও উচ্চতর ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই কাম্য। রাজ্যসভা অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে না। লোকসভা যে আকারে অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব পাস করে, রাজ্যসভা যদি সেই প্রস্তাবে সম্মতি দান না করে তাহা হইলে ১৪ দিন পর প্রস্তাবটি লোকসভার ইচ্ছামত আইনে পরিণত হয়। সুতরাং অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারেও রাজ্যসভার আদৌ কোন বৈশিষ্ট্য নাই।

প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে, মুলতবি প্রস্তাব আনয়ন করিয়া রাজ্যসভা মন্ত্রি-পরিষদের কার্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিলেও অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া মন্ত্রিপরিষদে অপসারণ করিতে পারে না।

তবে শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রাজ্যসভা লোকসভার সম-

ক্ষমতার অধিকারী। ইহা ছাড়া রাজ্যসভা দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যাধিক্য ভোটে প্রস্তাব পাস করিয়া জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কোন রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিবার অনুরোধ করিতে পারে। রাষ্ট্রপতির ও উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও অপসারণে এবং সুপ্রীম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণের পদচ্যুতি ব্যাপারে রাজ্যসভা লোকসভার সহিত একযোগে কাজ করিতে পারে।

ভারতে উচ্চ-কক্ষ রাজ্যসভার গঠনপ্রকৃতি ও ক্ষমতা পর্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ ইহাকে একটি আদর্শ উচ্চ-কক্ষরূপে গঠন করিবার চেষ্টা না করিয়া শুধু একটি সংশোধনী কক্ষ (Revising Chamber) হিসাবে গঠন করিয়া গণতান্ত্রিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ইংলণ্ডের লর্ড সভার অনুরূপ ভারতের রাজ্যসভার কোন প্রাচীন ঐতিহ্য বা সর্বোচ্চ বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতা নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট সভার গঠনপ্রকৃতির পশ্চাতে যে গণতান্ত্রিক ভিত্তি আছে, রাজ্যসভার তাহা নাই। সাধারণ আইন ও অর্থ-সংক্রান্ত আইন-প্রণয়নে, শাসন-কর্তৃপক্ষের নীতি ও কার্য নিয়ন্ত্রণে এবং বিশেষ বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতা পরিচালনায় সিনেট সভা যে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী, ভারতের রাজ্যসভার সে ক্ষমতা নাই। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের উভয় পরিষদ্ই সম-ক্ষমতার অধিকারী, ভারতের রাজ্যসভা দুই-একটি বিষয় ব্যতীত লোকসভার সমান ক্ষমতার অধিকারী নহে।

সুতরাং দেখা যায় যে, দ্বি-পরিষদ্ আইনসভার সপক্ষে সাধারণতঃ যে যুক্তিগুলির অবতারণা করা হয়, ভারতের রাজ্যসভার ক্ষেত্রে সেগুলি সম্পূর্ণ-ভাবে প্রযোজ্য নহে। নিম্ন-কক্ষের দ্রুত ও বিবেচনাহীন আইন-প্রণয়নে বাধা দেওয়া বা আঙ্গিক রাজ্যগুলির বিশেষ স্বার্থসংরক্ষণ ব্যাপারে অথবা জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিগণের নির্বাচন ব্যাপারে ভারতের উচ্চ-কক্ষ রাজ্যসভার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোন ভূমিকা নাই বলিলেও চলে।

লোকসভা—House of the People.

অনধিক ৫০০ সংখ্যক সদস্য লইয়া নিম্ন-পরিষদ গঠিত হয়। রাজ্যগুলির ভোটদাতৃগণ প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সদস্য নির্বাচন করেন। প্রতি ৫ লক্ষ লোকে অন্যূন একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন।

এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ইংলণ্ডে প্রত্যেক সত্তর হাজার লোকের জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা আছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি তিন লক্ষ আঠার হাজার লোকের জন্য একজন প্রতিনিধির ব্যবস্থা আছে।

লোকসভার প্রতিনিধির যোগ্যতা হইল যে, তাঁহাকে অন্ততঃপক্ষে ২৫ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে বর্তমান লোকসভার সদস্য সংখ্যা হইল ৫২৫। ইহার মধ্যে পার্লামেন্ট সভা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হইতে অনধিক ২৩ জন সদস্য নিযুক্ত হইবে।

লোকসভার আসনসংখ্যা নিম্নলিখিত হারে বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে:—

রাজ্য (নির্বাচিত)		সদস্যসংখ্যা	কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (নির্বাচিত ও মনোনীত)		
১। অন্ধ্রপ্রদেশ	...	৪১			
২। আসাম	...	১৪	১। দিল্লী	...	৭
৩। বিহার	...	৫৩	২। গোয়া, দিউ ও দমন	...	২
৪। গুজরাত	...	২৪	৩। পণ্ডিচেরি	...	১
৫। মহারাষ্ট্র	...	৪৫	৪। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	...	১
৬। কেরল	...	১৯	৫। লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ	...	১
৭। মধ্যপ্রদেশ	...	৩৭	৬। দাদ্রা ও নগর হেভেলি		১
৮। তামিলনাড়ু	...	৩৯	৭। অরুণাচল প্রদেশ	...	১
৯। কর্ণাটক	...	২৭	৮। মিজোরাম	...	১
১০। উড়িষ্যা	...	২০	৯। চণ্ডিগড়	...	১
১১। পাঞ্জাব	...	১৩	ইঙ্গ-ভারতীয় (মনোনীত)	...	২
১২। রাজস্থান	...	২৩	মোট—		৫২৫
১৩। উত্তরপ্রদেশ	...	৮৫			
১৪। পশ্চিমবঙ্গ	...	৪০			
১৫। হরিয়ানা	...	৯			
১৬। হিমাচলপ্রদেশ	...	৪			
১৭। জম্মু ও কাশ্মীর	...	৬			
১৮। নাগাভূমি	...	১			
১৯। মণিপুর	...	২			
২০। ত্রিপুরা	...	২			
২১। মেঘালয়	...	২			
২২। সিকিম	...	১			

১৯৭১ খৃষ্টাব্দে ভারতে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি লোকসভায় নিম্নলিখিত সংখ্যক আসন লাভ করিয়াছে। কিছুসংখ্যক আসন শূন্য আছে।

কংগ্রেস (শাসক)	...	৩৫৬
মার্কসবাদী সাম্যবাদী	...	২৬
ভারতের সাম্যবাদী	...	২৪
জনসংঘ	...	২০
ডি. এম. কে.	...	১৮
বি. এল. ডি.	...	১৩
নির্দলীয়	...	১৩
অন্যান্য	...	৪৫
		৫১৫

পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করিয়া কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রতিনিধি-নির্বাচনের পৃথক্ ব্যবস্থা করিতে পারে। তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় ও তপশীলভুক্ত উপজাতির জন্য এবং ইঙ্গ-ভারতীয়দের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। নিম্ন-পরিষদ্ সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর স্থায়ী হইবে, তবে জরুরী অবস্থায় এই স্থিতিকাল পার্লামেন্ট এক বৎসর বৃদ্ধি করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের পূর্বে এই সভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন।

লোকসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী—Powers and Functions of the House of the People.

গ্রেট্ বৃটেনের পার্লামেন্ট সভা লর্ডসভা ও কমন্সসভা লইয়া গঠিত হইলেও গ্রেট্ বৃটেনে পার্লামেন্ট বলিতে প্রধানতঃ কমন্সসভাকেই বুঝায়। ভারতের পার্লামেন্টেও অনুরূপভাবে নিম্ন-কক্ষ লোকসভার শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার বুঝায়। ভারতের লোকসভা প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। সুতরাং উভয় কক্ষের মধ্যে লোকসভার প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য করা

যাইতে পারে। লোকসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে :

১। আইন-প্রণয়ন-বিষয়ক ক্ষমতা—সাধারণ আইন-প্রণয়ন বিষয়ে রাজ্যসভা ও লোকসভা সমান ক্ষমতার অধিকারী। সাধারণ আইনের প্রস্তাব যে-কোন কক্ষে উত্থাপিত হইতে পারে। লোকসভা কর্তৃক গৃহীত খসড়া আইনে রাজ্যসভা যদি ছয় মাসের মধ্যে সম্মতি না দেয় অথবা প্রত্যাখ্যান করে তাহা হইলে ছয় মাস অন্তে রাষ্ট্রপতি উভয় সভার যুগ্ম অধিবেশন (Joint Session) আহ্বান করিয়া খসড়াটিকে যুগ্ম অধিবেশনের বিবেচনার জন্য পেশ করিতে পারেন। এরূপ অধিবেশনে লোকসভা ইহার সদস্য সংখ্যাধিক্যের বলে সহজেই খসড়াটিকে পাস করাইয়া লইতে পারে। যুগ্ম অধিবেশনে সংখ্যাধিক্য ভোটে গৃহীত খসড়া প্রস্তাবটি রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করিতে বাধ্য। প্রথমবারে সম্মতি না দিলেও দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির নিকট খসড়াটি উপস্থাপিত হইলে তাঁহাকে সম্মতি দিতেই হইবে। সুতরাং সাধারণ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত লোকসভার প্রাধান্য সুস্পষ্ট।

এ সম্পর্কে মনে রাখিতে হইবে যে, কেন্দ্রতালিকাভুক্ত ৯৭টি এবং যুগ্ম-তালিকাভুক্ত ৪৭টি বিষয় সম্পর্কে লোকসভা পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে আইন-প্রণয়ন করিতে পারে। অবশিষ্ট ক্ষমতা অর্থাৎ সংবিধানে অনুল্লিখিত ক্ষমতাসমূহ সম্পর্কে আইনপ্রণয়নে লোকসভা একই প্রকার ক্ষমতার অধিকারী।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত অবস্থায়ও লোকসভা আইন প্রণয়ন করিতে পারে—(ক) রাজ্যসভা যদি ⅔ অংশ ভোটে রাজ্যতালিকাভুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে সুপারিশ করে। (খ) দুই বা ততোধিক রাজ্য যদি রাজ্যতালিকাভুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে পার্লামেন্টকে আইন প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করে। (গ) আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রয়োজনে রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে। (ঘ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণা কালেও উক্ত ক্ষমতা প্রযোজ্য।

অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব নিম্ন-কক্ষেই উত্থাপিত হয়। উত্থাপিত প্রস্তাব যদি রাজ্যসভায় প্রেরণের ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভা কর্তৃক গৃহীত না হয় তাহা হইলে রাজ্যসভার বিনা সম্মতিতে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভের পর আইনরূপে গণ্য হয়।

২। শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা—লোকসভা কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত হন এবং এই নেতাই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হন। রাজ্যসভা হইতে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনের কোন আইনগত বাধা না থাকিলেও জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত লোকসভা হইতে দলের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন এবং কেবিনেটের অধিকাংশ সদস্যই লোক-সভা হইতে নিযুক্ত হন। আবার লোকসভা প্রশ্নোত্তর, সমালোচনা ও অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে কেবিনেটের শাসনকার্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষাকালে লোকসভা কেবিনেটের অর্থ-সম্বন্ধীয় নীতি ও কার্যকলাপ জিজ্ঞাসাবাদ, সমালোচনা বা প্রস্তাবিত অর্থের বরাদ্দ না-মঞ্জুর করিয়া নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। বৈদেশিক নীতি, আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রভৃতি লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও অপসারণ এবং সুপ্রীম কোর্ট ও রাজ্য উচ্চ বিচারালয়-গুলির বিচারপতিগণকে লোকসভা অপসারণ করিতে পারে। কিন্তু এইসকল ক্ষেত্রে লোকসভার রাজ্যসভার সহযোগে কাজ করিতে হয়।

৩। অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা—আইনানুমোদিত পদ্ধতি ব্যতীত অর্থ সংগ্রহ বা অর্থ ব্যয় করা যায় না। অর্থ-সংক্রান্ত যে-কোন প্রস্তাব প্রথমে লোকসভায় উত্থাপন করিতে হইবে এবং লোকসভার অনুমোদন ব্যতীত বাজেট পাস হয় না। সুতরাং অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে লোকসভার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত।

জাতীয় রাজনৈতিক জীবনে লোকসভার গুরুত্ব সমধিক। লোকসভায় দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা নীতি ও কূটনৈতিক সম্পর্কের বিশদ আলোচনা হয়। এই আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক একদিকে যেরূপ জন-সাধারণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে অপর দিকে তদ্রূপ শাসন কর্তৃপক্ষকে সংযত রাখে। এই তর্ক-বিতর্ক দ্বারা রাজ্য আইন-সভাগুলিও অনুপ্রাণিত হয়। এই সভা ভাবীকালের শাসকগণের একটি প্রধান শিক্ষাক্ষেত্র বলিয়াও পরিগণিত হইতে পারে।

পার্লামেণ্টের সদস্যগণের অধিকারসমূহ—Privileges of Members of Parliament.

অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ভারতের পার্লামেন্ট

সভার সদস্যগণ যাহাতে যথাযথভাবে তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন তজ্জন্য তাঁহাদের কতকগুলি বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

প্রথমতঃ, তাঁহারা বাক্-স্বাধীনতার অধিকারী। আইনসভার ও সভার কোন কমিটিতে কোনপ্রকার মন্তব্য বা ভোটদানের জন্য তাঁহাদের কোন আদালতে অভিযুক্ত করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, পার্লামেন্ট সভা আইন প্রণয়ন করিয়া যতদিন পর্যন্ত অধিকারসমূহ বিধিবদ্ধ না করিবে ততদিন পর্যন্ত ইংলণ্ডের কমন্সসভার সদস্যগণ যে সমস্ত অধিকার ভোগ করেন, ভারতের পার্লামেন্টের সদস্যগণও সেই সমুদয় অধিকার ভোগ করিবেন।

পার্লামেন্টের অধিবেশনকালে অথবা অধিবেশনের ৪০ দিন পূর্বে বা পরে কোন দেওয়ানী মামলায় অভিযুক্ত বলিয়া তাঁহাদিগকে আটক করা যাইবে না। অবশ্য এই বিশেষ অধিকার ফৌজদারী মামলা বা আটক আইনের প্রয়োগক্ষেত্রে কার্যকরী হয় না। পার্লামেন্টের কোন সদস্য যদি জেলে প্রেরিত বা আটক হন তাহা হইলে তাহার সংবাদ অবিলম্বে পার্লামেন্টে দিতে হইবে। পার্লামেন্টের অধিবেশন চলাকালে ইঁহার অনুমতি ব্যতীত কোন সদস্যকে সাক্ষ্য দিবার জন্য আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করা যায় না বা জুরীর কার্য করিবার জন্য আহ্বান করা যায় না। এই সভা বহিরাগতদের পার্লামেন্ট সভায় উপস্থিতি নিষিদ্ধ করিতে পারে। পার্লামেন্ট সভার প্রত্যেক পরিষদ্ ইহার অধিকার ভঙ্গ বা অবমাননার জন্য শাস্তি প্রদান করিতে পারে। ইহার অধিকার ভঙ্গ বা অবমাননা হইয়াছে কিনা এ সম্পর্কে পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কোন আদালতের নাই। এ সম্পর্কে একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে, যে পর্যন্ত না পার্লামেন্ট সভা আইন প্রণয়ন করিয়া ইহার অধিকারগুলি বিধিবদ্ধ করেন সে পর্যন্ত ভারতের পার্লামেন্ট সভা কমন্সসভার সদস্যগণ যে যে অধিকারগুলি ভোগ করেন, ভারতেও সদস্যগণ অনুরূপ অধিকার ভোগ করিবেন। এই অধিকারভোগ ক্ষেত্রে যদি পার্লামেন্টের কোন অধিকার নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার বিরোধী হয়, তাহা হইলে পার্লামেন্টের অধিকারই প্রাধান্য লাভ করিবে। এই সভা বহিরাগতদের সভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে নিষেধ করিতে

পারে। সভায় যে সমস্ত বিতর্ক হয় তাহা বা সভার কার্যবিবরণী প্রকাশ এই সভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। সভার বিতর্কে মানহানিকর বিষয় থাকিলেও এই সভার তাহা প্রকাশ করিবার অধিকার আছে। এই সভা প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন নিষ্পত্তি করিতে পারে এবং কোন নির্বাচন-প্রার্থীকে আইনতঃ অযোগ্য ঘোষণা করিয়া তাঁহার আসন শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। সভার মধ্যে অনুষ্ঠিত সকল ব্যাপারের নিষ্পত্তি এই সভা করিতে পারে। মানহানির জন্য এই সভা ইহার সদস্য বা সদস্য-বহির্ভূত ব্যক্তিদের তিরস্কার করিয়া, বহিষ্করণ করিয়া বা সদস্যদের কিছুকাল পর্যন্ত সদস্যপদ হইতে বঞ্চিত রাখিয়া শাস্তি দান করিতে পারে। এই সভা ইহার কার্যসূচী নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। সভার সদস্যগণ সমবেতভাবে সভার সভাপতির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিসকাশে আবেদন করিতে পারে।

ভারতে পার্লামেন্টের সদস্যগণের অধিকারগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, এই অধিকারগুলি বৃটিশ পার্লামেন্টের অধিকারের অনুকরণে করা হইয়াছে। ইহার বিশেষ কোন মৌলিকতা নাই।

পার্লামেণ্ট সভার কার্য ও ক্ষমতা—Powers and Functions of Parliament.

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ভারতের পার্লামেণ্ট সভা আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অ-সার্বভৌম আইনসভার পর্যায়ভুক্ত। ভারতের পার্লামেণ্ট সভা যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকাভুক্ত এবং যুগ্ম-তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব ব্যতীত অন্য প্রস্তাবগুলি যে-কোন পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে। কোন প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে হইলে উভয় পরিষদের সম্মতি অপরিহার্য। যদি কোন পরিষদ্ সম্মতিপ্রদানে বিরত থাকে এবং ছয় মাসের পরও যদি মতামত জ্ঞাপন না করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিবেন এবং যুক্ত অধিবেশনে অধিকাংশ ভোটে বিলটি গৃহীত হইলে উহা আইনে পরিণত হইবে। উভয় পরিষদ্ কর্তৃক কোন প্রস্তাব গৃহীত হইলে ঐ গৃহীত প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট উপস্থাপিত হইবে। রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিলে প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতি যদি প্রস্তাবটিতে তাঁহার সম্মতি প্রদান না

করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহার সুপারিশসহ উক্ত প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার জন্য পার্লামেন্ট সভায় প্রেরণ করিতে হয়। পার্লামেন্ট সভা পুনর্বিবেচনা করিয়া প্রস্তাবটিকে যদি পুনরায় রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করে, তাহা হইলে এই দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি আর তাঁহার সম্মতি প্রত্যাহার করিতে পারেন না।

অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব ভিন্ন পদ্ধতিতে অনুমোদিত হয়। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উচ্চ পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে না। নিম্ন পরিষদ্ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে এই প্রস্তাবগুলি উচ্চ পরিষদে প্রেরিত হয় এবং উচ্চ পরিষদ্ যদি ১৪ দিনের মধ্যে ইহার মতামত জ্ঞাপন না করে তাহা হইলে প্রস্তাবটি উচ্চ পরিষদের সম্মতি ব্যতিরেকে আইনে পরিণত হইবে। এ বিষয়ে ভারতের সংবিধান বৃটেনের লর্ডসভার অনুরূপভাবেই অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির উপর রাজ্যসভার ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোন প্রস্তাব অর্থ-সংক্রান্ত কি না, সে সম্পর্কে স্পীকারই চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার অধিকারী।

এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থার ঘোষণা পার্লামেন্ট সভার অনুমোদনসাপেক্ষ। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে অথবা রাজ্যসভা কর্তৃক অথবা এক বা একাধিক রাজ্য আইনসভা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পার্লামেন্ট সভা রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

এতদ্ব্যতীত পার্লামেন্ট সভার নির্বাচিত সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতার অধিকারী। পার্লামেন্ট সভার উভয় কক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণের জন্য পার্লামেন্টের যে-কোন কক্ষ রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে এবং উভয় কক্ষের বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত প্রস্তাব পাস করিয়া রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করিতে পারে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী। লোকসভা মন্ত্রীদের বেতন মঞ্জুর করে এবং সরকারী আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব প্রত্যাখ্যান দ্বারা অথবা মন্ত্রিসভা কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া আইন না-মঞ্জুর করিয়া বা মন্ত্রিসভা-অনসৃত নীতি প্রত্যাখ্যান করিয়া বা সরাসরি মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া মন্ত্রিসভার পতন ঘটাইতে পারে।

শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার ক্ষমতা পার্লামেন্ট সভার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

কতকগুলি বিষয়ে সংশোধন সাধারণ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হইতে পারে, অন্য বিষয়গুলির ক্ষেত্রে বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতি প্রয়োজন হয়।

পার্লামেন্ট সভার প্রত্যেক কক্ষ ⅔ সংখ্যক সদস্যের ভোটে গৃহীত প্রস্তাব আনয়ন করিয়া সুপ্রীম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে অবধারিত অসদাচরণ বা অযোগ্যতার জন্য অপসারণের ব্যবস্থা করিতে পারে।

রাজ্যসভা বিশেষ সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত প্রস্তাব দ্বারা রাজ্যতালিকা-ভুক্ত যে-কোন বিষয়ের উপর জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষের উদ্দেশ্যে সাময়িক-ভাবে পার্লামেন্ট সভার উপর আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারে।

পার্লামেন্ট হইল ভারতের জাতীয় মহাসভা। এই সভায় সমগ্র দেশের স্বার্থ-সম্পর্কিত বিষয়গুলির বিশদ আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পার্লামেন্ট ইহার এই প্রায়-অবাধ ক্ষমতা পরিচালনা দ্বারা একদিকে যেরূপ ভারতের জনমত সজাগ রাখে, অপর দিকে তদ্রূপ শাসনকর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রিত করে। পার্লামেন্টের এই নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার অবর্তমানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। পার্লামেন্ট সভার আলাপ-আলোচনা ও কার্যপদ্ধতি রাজ্য আইনসভাগুলিকেও অনুপ্রেরণা দান করিয়া থাকে।

রাজ্যসভা ও লোকসভার মধ্যে সম্পর্ক—Relation between the two Houses of Parliament.

ভারতের পার্লামেন্ট সভা দুইটি পরিষদ্ লইয়া গঠিত। নিম্ন পরিষদ্ অর্থাৎ লোকসভা লোকসংখ্যার ভিত্তিতে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে। উচ্চ পরিষদ্ লোকসংখ্যার ভিত্তিতে গঠিত হইলেও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব করে।

ক্ষমতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে সাধারণ আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে উভয় পরিষদ্ প্রায় সমান ক্ষমতার অধিকারী। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব ব্যতীত অন্য যে-কোন আইনের প্রস্তাব যে-কোন পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে এবং উভয় পরিষদের সম্মতি ব্যতীত ঐ প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে পারে না। উভয় পরিষদের মধ্যে আইন-প্রণয়ন-ব্যাপারে কোন মতভেদ হইলে রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন এবং এই যুক্ত

অধিবেশনে সংখ্যাধিক্যের ভোটে প্রস্তাবটি সম্পর্কে চূড়ান্ত মীমাংসা হয়। তবে রাজ্যসভা অপেক্ষা লোকসভার সদস্যসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ ; সেইজন্য মতবিরোধ ঘটিলে শেষ পর্যন্ত লোকসভার জয় সুনিশ্চিত। কিন্তু বৃটেনের কমন্সসভার মত ভারতের লোকসভা উচ্চ পরিষদের সিদ্ধান্ত একেবারে প্রত্যক্ষভাবে বাতিল করিতে পারে না।

অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি নিম্ন পরিষদেই উত্থাপিত হয়। নিম্ন পরিষদ্ কর্তৃক গৃহীত হইলে প্রস্তাবটি উচ্চ পরিষদে প্রেরণ করা হয়। উচ্চ পরিষদের অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব সংশোধন করিবার ক্ষমতা আছে এবং উচ্চ পরিষদ্ কর্তৃক আনীত সংশোধন প্রস্তাব যদি নিম্ন পরিষদ্ কর্তৃক গৃহীত হয়, একমাত্র তাহা হইলেই উক্ত প্রস্তাব বৈধ বলিয়া বিবেচিত হয়। নিম্ন পরিষদ্ কর্তৃক উত্থাপিত অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উচ্চ পরিষদে প্রেরিত হইবার ১৪ দিন পর পর্যন্ত যদি তাহার সুপারিশসহ অথবা বিনা সুপারিশে নিম্ন পরিষদে প্রেরিত না হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রস্তাব নিম্ন পরিষদের মতানুযায়ী আইনে পরিণত হইবে। বৃটেনে লর্ড সভার অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব সংশোধন করিবার অধিকার নাই। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি বিবেচনার জন্য লর্ডসভাকে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে মাত্র একমাস সময় দেওয়া হইয়াছে। এই সময় অতিবাহিত হইবার পর লর্ড সভার বিনা অনুমোদনেই প্রস্তাব আইনে পরিণত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পরিষদ্—সিনেট সভা—অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিতে না পারিলেও ইহা অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলিকে ব্যাপকভাবে সংশোধন করিবার ক্ষমতার অধিকারী। ভারতের উচ্চ পরিষদ্ মাত্র ১৪ দিন পর্যন্ত অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব স্থগিত রাখিতে পারে।

গ্রেট বৃটেনের প্রথার মত ভারতের মন্ত্রিপরিষদ্‌ও লোকসভার নিকট দায়ী। রাজ্যসভা অর্থাৎ উচ্চ পরিষদ্ অনাস্থা-প্রস্তাব আনয়ন করিয়া মন্ত্রিপরিষদ্‌কে অপসারিত করিতে পারে না। এ বিষয়েই নিম্ন পরিষদ্ অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী।

বৃটেনে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ পরিষদের বিশেষক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতিতে বিচার করিবার ক্ষমতা আছে। নিম্ন পরিষদ্ অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে, কিন্তু বিচারক্ষমতার একমাত্র অধিকারী হইল উচ্চ পরিষদ্। ভারতে

উচ্চ পরিষদ্‌কে এইরূপ একচেটিয়া ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে যে-কোন পরিষদ্‌ই অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে এবং একটি পরিষদ্ কর্তৃক অভিযোগ আনীত হইলে অপর পরিষদ্ ঐ আনীত অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। সুতরাং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে নিম্ন পরিষদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশন—Joint sitting of both the Houses of Parliament.

কোন সাধারণ আইনের প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে হইলে উভয় কক্ষের সম্মতি প্রয়োজন। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব ব্যতীত অন্য প্রস্তাব সম্পর্কে যদি উভয় কক্ষ একমত হইতে না পারে তাহা হইলে উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়। রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। প্রথমতঃ, যদি কোন প্রস্তাব এক কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর দ্বিতীয় কক্ষে প্রেরিত হইলে সেই কক্ষ কর্তৃক বাতিল হয়। দ্বিতীয়তঃ, উভয় কক্ষই যখন সংশোধন প্রস্তাবে একমত না হয়। তৃতীয়তঃ, এক কক্ষ হইতে প্রেরিত হইবার পর ছয় মাসের অধিককাল পর্যন্ত যদি অন্য কক্ষ সেই প্রস্তাবটি পাস না করে।

যুক্ত অধিবেশনে সাধারণতঃ লোকসভার স্পীকার সভাপতিত্ব করেন। যুক্ত অধিবেশনে নির্ধারিত বিষয় সম্পর্ক ব্যতীত অন্য কোন সংশোধনী প্রস্তাব করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি অপর কক্ষ কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাব প্রস্তাবকারী কক্ষ কর্তৃক গৃহীত না হওয়ার ফলে উভয় কক্ষের মধ্যে মতভেদ ঘটে তাহা হইলে যে কারণে মতভেদ ঘটিয়াছে, সেই কারণ সম্পর্কে সংশোধনী প্রস্তাব আনা যাইতে পারে। যদি যুক্ত অধিবেশনে সংশোধন সহ কোন প্রস্তাব উভয় কক্ষের উপস্থিত ও ভোটদানকারী সংখ্যাধিক্যের সম্মতিতে পাস হয় তাহা হইলে এই প্রস্তাব উভয় কক্ষ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব বলিয়া ধরা হয়। রাজ্যসভা অপেক্ষা লোকসভার সদস্য সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। সুতরাং যুক্ত অধিবেশনে লোকসভার মত প্রবল হয়।

স্পীকার—The Speaker of the House of the People.

লোকসভা ইহার কার্য-পরিচালনার জন্য সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করে। সভাপতি স্পীকার ও সহ-সভাপতি ডেপুটি স্পীকার নামে অভিহিত হন। উভয়কেই লোকসভার সদস্য হইতে হইবে এবং লোকসভার সদস্যপদ-চ্যুত হইলে তাঁহারা স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার থাকিতে পারেন না। তাঁহারা নিজেরা কাজে ইস্তফা দিতে পারেন কিংবা লোকসভা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রস্তাব পাস করিয়া তাঁহাদিগকে অপসারিত করিতে পারে। এইরূপ প্রস্তাব পাস করিতে হইলে ১৪ দিনের নোটিশ দিতে হয়। স্পীকার যাহাতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হন সেই উদ্দেশ্যে তাঁহার বেতন পার্লামেন্টের বাৎসরিক অনুমোদন সাপেক্ষ নহে। নির্বাচনের পর তিনি দল-নিরপেক্ষ থাকেন।

ভারতে লোকসভার স্পীকার ইংলণ্ডের কমন্সসভার স্পীকারের ক্ষমতার অনুরূপ ক্ষমতা ভোগ করেন। তিনি লোকসভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি সভার বিতর্ক পরিচালনা করেন এবং সভার নিয়ম-কানুন ব্যাখ্যা ও বলবৎ করেন। কোন বিষয়ে বৈধতার প্রশ্ন উঠিলে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। নির্বাচনের পর তাঁহাকে দল-নিরপেক্ষ থাকিয়া সকল দলকে সমান অধিকার দিতে হয়। কোন আইন সম্পর্কে বিতর্কে মুলতুবি প্রস্তাব আনিতে হইলে তাঁহার সম্মতি প্রয়োজন। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কেহই সভায় বক্তৃতা করিতে পারেন না। তিনি অধিবেশনের শৃংখলা রক্ষা করেন। তিনি প্রয়োজন বোধ করিলে সভার কার্য স্থগিত রাখিতে পারেন। তিনিই হইলেন সদস্যগণের অধিকারের রক্ষক। উভয় পক্ষে সমান সংখ্যক ভোট হইলে তিনি একটি অতিরিক্ত ভোট দিতে পারেন। স্পীকার ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেন। লোকসভার বিভিন্ন কমিটির সদস্যগণকে তিনি নিয়োগ করেন এবং সভায় বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করেন। স্পীকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রপতি সভায় তাঁহার সংবাদ প্রেরণ করেন। স্পীকারের আর একটি কাজ হইল যে, তিনি স্বয়ং অথবা তাঁহার সহকারী ডেপুটি স্পীকারের অনুপস্থিতকালে সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য সভাপতিদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা। তিনি বিরোধীদলের নেতৃত্ব নির্ধারণ করেন। বৃটিশ পার্লামেন্ট সভার স্পীকারের মতই কোন প্রস্তাব অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব কিনা এ সম্পর্কে

কোন প্রশ্ন উঠিলে ভারতের স্পীকারও তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে পারেন। কোন আইনের প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যসভার নিকট প্রেরণের পূর্বে লোকসভার মুখপাত্র হিসাবে স্পীকারকেই প্রস্তাবটি স্বাক্ষরযুক্ত করিতে হয়। স্পীকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকার সভাপতিত্ব করেন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য আইনসভা—West Bengal State Legislature.

ভারতের শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া আইনসভা থাকিবে। তদনুসারে পশ্চিমবঙ্গেও একটি আইনসভা আছে। পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার শুরু হইতেই দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট বিধান পরিষদ (Legislative Council) ও বিধানসভা (Legislative Assembly) লইয়া গঠিত ছিল। ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে বিধান পরিষদ লোপ করা হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা রাজ্যপাল ও একটি কক্ষ অর্থাৎ বিধানসভা লইয়া গঠিত।

বিধানসভার মোট সদস্যসংখ্যা ৫০০-এর অধিক ও ৬০-এর কম হইতে পারিবে না। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ২৮০ জন ভোটদাতাগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ-ভাবে নির্বাচিত সদস্য লইয়া গঠিত। রাজ্যপাল যদি মনে করেন যে, ইঙ্গ-ভারতীয় (Anglo-Indian) সম্প্রদায়ের বিধান সভায় উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি নাই তাহা হইলে তিনি উক্ত সম্প্রদায় হইতে কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতিসমূহের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক আদমসুমারীর (Census) পর রাজ্যের বিধানসভার সমগ্র আসনসংখ্যা ও প্রত্যেক নির্বাচন ক্ষেত্রের আসনসংখ্যা জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে এরূপভাবে পরিবর্তিত হইবে যে, রাজ্যের নির্বাচন ক্ষেত্রগুলির বিধানসভায় যথাসম্ভব সমান প্রতিনিধিত্ব হয়।

বিধানসভার সদস্য হইবার যোগ্যতা হইল যে, সদস্য পদপ্রার্থী ২৫ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হইবেন এবং কোন বিচারালয় কর্তৃক নির্বাচনের অনুপযুক্ত বলিয়া ঘোষিত হন নাই। কোন ব্যক্তিই একযোগে বিধানসভা ও পার্লামেন্ট সভার সদস্য হইতে পারেন না। বিধানসভার স্বাভাবিক

কার্যকাল হইল পাঁচ বৎসর। জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণা কালে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করিয়া ইহার কার্যকাল একবারে এক বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে বিধানসভার কার্য স্থগিত থাকিতে পারে অথবা বিধানসভা একেবারে ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়। জরুরী অবস্থা শেষ হইবার ছয় মাস মধ্যে নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে হইবে।

ক্ষমতা ও কার্য—**Powers and Funtions.**

পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা অর্থাৎ বিধানসভা প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কার্য-গুলি সম্পাদন করে।

প্রথমতঃ, ইহার প্রধান কার্য হইল আইন প্রণয়ন করা। রাজ্য তালিকাভুক্ত ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে ইহা আইন প্রণয়ন করিবার অধিকারী। যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কে ইহার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, কারণ যুগ্ম বিষয় অর্থাৎ যে বিষয়গুলি সম্পর্কে ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার উভয়েই আইন প্রণয়ন করিতে পারে, যথা, সংবাদপত্র, শ্রম সম্পর্কে ভারত সরকার কর্তৃক পূর্বে প্রণীত কোন অইনের সহিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রণীত আইনের বিরোধ হয় তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা প্রণীত আইন কার্যকর হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, আইনসভা রাজ্যের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থ-সংক্রান্ত বিল বিধানসভায় উত্থাপিত হয় এবং এই সভাই বিল পাস করে। অর্থ-সংক্রান্ত কোন বরাদ্দ দাবি এই সভা পাস করিতে পারে অথবা হ্রাস করিতে পারে কিংবা প্রত্যাখ্যান করিয়া মন্ত্রিপরিষদের পরাজয় ঘটাইতে পারে। বিধানসভার অনুমোদন ব্যতীত কোন কর ধার্য বা কোন কর লোপ করা যায় না।

তৃতীয়তঃ, এই সভা মন্ত্রিপরিষদের কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। এই সভার সদস্যগণ মন্ত্রিগণকে প্রশ্ন করিতে পারেন, তাঁহাদের কার্যের সমালোচনা করিতে পারেন এবং বিশেষ ক্ষেত্রে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাস করিয়া মন্ত্রিপরিষদকে পদচ্যুত করিতে পারে। মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে বিধান-সভার নিকট দায়ী।

চতুর্থতঃ, অন্যান্য রাজ্য বিধানসভার অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার কতিপয় ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র সংশোধন বিষয়ে অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আছে। শাসনতন্ত্রের ৩৬৮ ধারা অনুযায়ী পার্লামেন্ট কর্তৃক উত্থাপিত বিল রাজ্য আইনসভায় প্রেরিত হয়। রাজ্য আইনসভা প্রস্তাব পাস করিয়া উক্ত বিল অনুমোদন অথবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। ইহা ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের সীমানা পরিবর্তন অথবা ইহার পূর্বতন আয়তন পরিবর্তন দ্বারা ইহার পুনর্গঠন সংক্রান্ত কোন বিল পার্লামেন্টে উত্থাপিত হইবার পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে পূর্বে এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার মত লইতে হইবে।

পঞ্চমতঃ, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। বিধানসভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন করে এবং অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া তাঁহাদের পদচ্যুত করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হিসাব-পরীক্ষক প্রধান (Auditor-General) ও রাজ্যভৃত্য নিয়োগ পরিষদ (State Public Service Commission) কর্তৃক প্রেরিত বিবরণী বিবেচনা করে।

রাজ্য আইনভার কার্যসমূহও কতিপয় বিশেষ সংস্থা (Committees) দ্বারা বিবেচিত হয়। ইহার মধ্যে স্থায়ী (Standing) ও অস্থায়ী (*Adhoc*) সংস্থা আছে। আনুমানিক ব্যয় হিসাব সংস্থা (Estimates Committee) ও সরকারী হিসাব পরীক্ষা সংস্থা (Public Accounts Committee) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে।

রাজ্য বিধানসভার সভাপতি—Speaker of the Legislative Assembly.

লোকসভার সভাপতির ন্যায় প্রত্যেক রাজ্য বিধানসভার সদস্যগণ কর্তৃক একজন নির্বাচিত স্পীকার ও সহ-স্পীকার থাকেন। স্পীকারের অনুপস্থিতিতে সহ-স্পীকার এবং উভয়েই অনুপস্থিত থাকিলে স্পীকার কর্তৃক বৎসরের শুরুতেই নির্বাচিত ছয় জনের তালিকার মধ্য হইতে একজন সভাপতিত্ব করেন। চৌদ্দ দিনের বিজ্ঞপ্তি দিয়া বিধানসভার সংখ্যাধিক্যের প্রস্তাব দ্বারা স্পীকার ও তাঁহার সহকারীকে অপসারণ করা যায়।

স্পীকার যাহাতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে সভার কার্য পরিচালনা করেন, সেজন্য তাঁহার বেতন ও ভাতা আইনসভার বাৎসরিক অনুমোদন সাপেক্ষ করা হয় নাই। নির্বাচনের পর তিনি দল নিরপেক্ষ থাকেন এবং বিতর্কে যোগদান করেন না বা সাধারণতঃ ভোট দান করেন না। উভয় পক্ষে সমান ভোটের ক্ষেত্রে তিনি একটি অতিরিক্ত ভোট দিতে পারেন। তিনি সভার নিয়ম-কানুন ব্যাখ্যা করেন ও সভার শৃংখলা রক্ষা করেন। কোন বিতর্কিত বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। তিনি কোন বিলকে অর্থবিল বলিয়া ঘোষণা করিলে তাহা অর্থবিল বলিয়া গণ্য হইবে। তাঁহার অন্যান্য ক্ষমতা লোকসভার স্পীকারের অনুরূপ।

রাজ্য আইনসভার সদস্যগণের অধিকারসমূহ—Privileges of the Members of State Legislatures.

রাজ্য আইনসভার সদস্যগণ পার্লামেন্ট সভার সদস্যগণের অনুরূপ অধিকার ভোগ করেন।

১। বাক্-স্বাধীনতা—আইনসভায় প্রদত্ত কোন বক্তব্যের জন্য কোন সদস্যকে আদালতে অভিযুক্ত করা যায় না। কোন সদস্য যদি কোন গোপন তথ্য বা কাগজপত্র প্রকাশ করেন, তাহা হইলেও তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যাইবে না।

২। আইনসভার অধিবেশনের ৪০ দিন পূর্বে এবং অধিবেশনের ৪০ দিন পর পর্যন্ত কোন দেওয়ানী মামলার দায়ে কোন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা যায় না। ফৌজদারী মামলা বা আটক আইনের ক্ষেত্রে অবশ্য আইনসভার বাহিরে কোন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা যায়।

৩। অধিবেশনকালে কোন সদস্যকে আদালতে সাক্ষ্য দিবার বা জুরীর দায়িত্ব পালনের আদেশ দেওয়া চলে না।

৪। যদি কেহ সভার সম্মান হানি করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে সভার শাস্তি দিবার অধিকার আছে।

৫। আইনসভা সভার কার্য ও বক্তৃতা গোপন রাখিতে পারে এবং বহিরাগতদের সভাকক্ষে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

রাজ্য আইনসভায় আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি—Law-making in State Legislatures.

আইনের প্রস্তাব খসড়া আইন (Bill) নামে অভিহিত হয়। রাজ্য আইনসভার বিলগুলিও বিশেষ স্বার্থ-সম্পর্কিত (Private bill), সাধারণ স্বার্থ-সম্পর্কিত (Public bill) ও অর্থ-সংক্রান্ত বিল (Money bill) হইতে পারে। অর্থবিলের সংজ্ঞা কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে একই ধরনের।

কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে যে পদ্ধতি অনুযায়ী সাধারণ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিলগুলি পাস হয়, রাজ্যেও অনুরূপ পদ্ধতিতে সরকারী ও বে-সরকারী বিলগুলি পাস করা হয়। তবে বে-সরকারী বিল উত্থাপনের একমাস পূর্বে নোটিশ দিয়া উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করিতে হয়। বিশেষ একটি কমিটির দ্বারা বিলটি পরীক্ষিত হইয়া উত্থাপনের অনুমতি লাভ করিলে উহা জনসাধারণের অবগতির জন্য গেজেটে প্রকাশ হয়। এই পর্যন্ত হইলে বিলের উত্থাপন ও প্রথম পাঠ পর্ব শেষ হয়।

ইহার পর নির্দিষ্ট দিনে বিলের দ্বিতীয় পাঠ শুরু হয়। এই পর্যায়ে বিলের উত্থাপক নিম্নলিখিত তিনটি প্রস্তাব করিতে পারেন। (ক) বিলটি বিবেচনা করা হউক, (খ) সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হউক, অথবা (গ) জনমত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিলটি প্রচার করা হউক। এই পর্যায়ে বিলটির নীতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা চলে।

ইহার পর বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে যায়। এই কমিটি পর্যায়ে বিলের ধারা, উপধারা লইয়া বিশদ বিচার-বিবেচনা হয়। বিচার-বিবেচনার পর কমিটি ইহার মন্তব্যসহ অথবা বিনা মন্তব্যে বিলটিকে উত্থাপক কক্ষে পাঠায়। এই সময় উত্থাপক সভায় বিলের বিশদ আলোচনা চলে। এই সময় বিলের সংশোধন প্রস্তাবও আনা হয়। সংখ্যাধিক্য ভোটে পাস হইলে বিলটি তৃতীয় পাঠের জন্য উপস্থিত করা হয়।

তৃতীয় পাঠে বিলটিকে সমগ্রভাবে গ্রহণ বা বাতিল করা যায় কিন্তু কোন সংশোধন প্রস্তাব করা যায় না। সংখ্যাধিক্য ভোটে পাস হইলে বিলটিকে দুই-কক্ষ-সমন্বিত রাজ্যে অন্য কক্ষে পাঠান হয়। অপর কক্ষেও অনুরূপ পদ্ধতিতে বিলটি গৃহীত হইলে রাজ্যপালের সম্মতির জন্য প্রেরণ

করা হয় এবং রাজপালের সম্মতি লাভ করিলে বিলটি আইনের পর্যায়ে উন্নীত হয়।

অর্থ-সংক্রান্ত আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি—Procedure in regard to Money Bills.

কেন্দ্রে ও রাজ্যে অনুরূপ পদ্ধতিতেই অর্থ-সংক্রান্ত বিল পাস হয়। করস্থাপন, বিলোপ, পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ, সরকারী ঋণ-সম্পর্কিত, আর্থিক দায়িত্ব-সম্পর্কিত কোন আইনের সংশোধন, সম্মিলিত অথবা আকস্মিক তহবিলে অর্থ জমা দেওয়া বা উঠাইয়া লওয়া সম্পর্কিত বিলগুলিকে অর্থ-সংক্রান্ত বিল বলা হয়। এই বিলগুলি একমাত্র রাজ্যপালের অনুমোদনে কোন সরকারী সদস্য (রাজস্ব মন্ত্রী) কর্তৃক বিধানসভায় উত্থাপিত হইতে পারে। বিধানসভায় কেন্দ্রীয় লোকসভার অনুরূপ পদ্ধতিতে বিলটি পাস হইলে রাজ্যপালের সম্মতি লইয়া বিলটি আইনে পরিণত হয়।

বিচার বিভাগ—ইহার স্বাধীনতা—The Judiciary—its Independence.

গণতন্ত্রের দুইটি আদর্শ—স্বাধীনতা ও সাম্য বহলাংশে দেশের বিচার বিভাগের সংগঠন, বিন্যাস এবং বিচার বিভাগের শুচিতা, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার উপর নির্ভর করে।

ন্যায়বিচার করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করা বিচার বিভাগের গুরু দায়িত্ব বলিয়া সর্বত্র স্বীকৃত হয়। বিচারকগণ যাহাতে আইন অনুসারে বিচার কার্য পরিচালনা করিতে পারেন সেজন্য তাঁহাদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। প্রথমতঃ, বিচারকগণ আইন প্রয়োগ করিয়া দোষী ও নির্দোষ স্থির করেন ও অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে শাস্তি বিধান করেন। এরূপক্ষেত্রে বিচারক যদি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ না হন, তাহা হইলে হয়ত নির্দোষ ব্যক্তি শাস্তি পাইতে পারে ও দোষী অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। সুতরাং ন্যায়ধর্ম অনুসারে বিচারকের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মনোভাবাপন্ন হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ, শাসনকর্তৃপক্ষের বে-আইনী কার্যকলাপের হস্ত হইতে নাগরিক অধিকারগুলি রক্ষা করা বিচারকগণের আর একটি গুরু দায়িত্ব। যে ক্ষেত্রে বিচারকগণের আইনসভা বা শাসনকর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত

হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমাধি রচিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এদিক দিয়া দেখিতে গেলেও নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থাকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষাকল্পে বিচারপতিগণের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

ছয়টি বিভিন্ন উপায়ে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করা হয়। যথা, (১) বিচারপতি নিয়োগ পদ্ধতি; (২) অপসারণ পদ্ধতি, (৩) বিচারপতিগণের কার্যকাল, (৪) যোগ্যতা, (৫) বেতন পরিমাণ ও (৬) শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ।

(১) বিচারপতি নিয়োগ-পদ্ধতি—Mode of Appointment of the Judges.

বিচারপতিগণের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বহুল পরিমাণে তাঁহাদের নিয়োগ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন দেশে বিচারক নিয়োগে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হন। সিনেট সভার অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রপতি ইহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। যেহেতু মার্কিন শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে গঠিত, সেই হেতু বিচারক নিয়োগ ব্যাপারে দলীয় প্রভাব কার্যকর হইয়া স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারপতি নিয়োগে অনেক ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। ইংলণ্ডে প্রধান বিচারালয় লর্ড সভার বিচারপতিগণ রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইংলণ্ডে প্রকৃত পক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও লর্ড চ্যান্সেলর বিচারপতিগণের নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করেন।

ভারতে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণের নিয়োগ রাষ্ট্রপতি করেন তবে তিনি এই সমুদয় নিয়োগ ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতিগণের ও রাজ্যগুলির উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণের কিছু সংখ্যকের সহিত তাঁহার ইচ্ছামত পরামর্শ করিতে পারেন। ভারতের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সমুদয় বিচারপতি নিয়োগক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি অবশ্যই সুপ্রীম

কোর্টের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিবেনই। ভারতের রাজ্য উচ্চ বিচারালয়গুলির বিচারপতিগণ ভারতের প্রধান বিচারপতি ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালদের সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। রাজ্য উচ্চ বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি ব্যতীত অন্য বিচারপতি নিয়োগ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্য উচ্চ বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতির সহিতও পরামর্শ করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ রাজ্যের বিচারপতিগণ গণভোট দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন এবং কিছু সংখ্যক রাজ্যে বিচারপতিগণ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন।

সুইস্ ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতিগণ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

ডঃ গার্ণারের মতে শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির দ্বারা বিচারপতি-গণের নিয়োগ হইল সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। কারণ এই পদ্ধতিতে শুধুমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতে বিচারপতিগণের নিয়োগ সম্ভব হয়। এই পদ্ধতিতে নিযুক্ত হইলে বিচারপতিগণ দলাদলির ও জনপ্রিয়তা লাভের উর্ধ্বে থাকিয়া বিচারকার্য পরিচালনা করিতে পারেন। যুক্তির দিক দিয়া আংশিকভাবে গ্রহণযোগ্য হইলেও শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিচারপতি মনোনয়ন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারপতি নিয়োগ ব্যাপারে কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হয় সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। মনোনয়ন অ-গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। এক ব্যক্তি বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তিগণ এই মনোনয়ন করিয়া থাকেন। সর্বক্ষেত্রে যে তাঁহারা ব্যক্তিগত মতামতের উর্ধ্বে থাকিয়া কঠোরভাবে একমাত্র যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ করেন তাহা সত্য নহে।

আইনসভা কর্তৃক বিচারপতিগণের নিয়োগ সম্পর্কে বলা যায় যে, এই পদ্ধতিতে বহুলোক তর্ক-বিতর্কের দ্বারা যোগ্যতা নিরূপণ করিয়া বিচারপতি-গণকে নিযুক্ত করেন। বিচারপতিগণ আইনসভা প্রণীত আইনগুলির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করেন। সুতরাং শাসনকর্তৃপক্ষ অপেক্ষা বিচার বিভাগ আইনসভার সহিত অধিকতর সম্পর্কযুক্ত।

একই কারণে জনসাধারণের হস্তে বিচারপতি নিয়োগের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হওয়া উচিত নয়। যোগ্য বিচারক নির্বাচন করিবার অনুরূপ বুদ্ধি ও যোগ্যতা

সাধারণ লোকের নিকট হইতে আশা করা যায় না। অপরপক্ষে বলা যায় যে, ভোটদাতাগণ যদি আইনসভার সদস্যগণকে নির্বাচন করিতে পারেন তাহা হইলে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে তাহাদের অযোগ্য বিবেচনা করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। এক ব্যক্তি বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ভুল করিতে পারে কিন্তু অসংখ্য ভোটদাতা সমবেতভাবে সাধারণত ভুল করে না। ইহা ছাড়া বলা যায় যে, ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচন অধিকতর গণতন্ত্রসম্মত নীতি।

(২) অপসারণ-পদ্ধতি—Mode of Removal.

বিচারপতিগণ যাহাতে ভীতি বা প্রলোভনের দ্বারা কর্তব্য সম্পাদনে পরিচালিত না হন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের সামান্য কারণে পদ হইতে অপসারণ না করা যায় তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কাহারও খুশিমত যখন তখন অপসারণের ভয় থাকিলে বিচারপতিগণ ন্যায়বিচার করিতে পারেন না। এই কারণে একবার বিচারপতি নিযুক্ত হইলে কোন দেশেই সহসা তাঁহাদের পদচ্যুত না করিবার ব্যবস্থা থাকে। ইংলণ্ডে বিচারপতিগণ যতদিন সদাচারী থাকেন (during good behaviour) ততদিন পর্যন্ত (একটা নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা পর্যন্ত) তাঁহাদিগকে অপসারণ করা যায় না। কোন বিচারককে পদচ্যুত করা হউক এই মর্মে যদি পার্লামেন্ট সভা রাজার নিকট আবেদন করে তাহা হইলে একমাত্র সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিচারককে পদচ্যুত করা যায়। সুতরাং ইংলণ্ডের বিচারপতিগণ শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হইলেও শাসনকর্তৃপক্ষ ইচ্ছামত বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণকে একমাত্র অভিশংসন পদ্ধতি (Impeachment) ব্যতীত রাষ্ট্রপতি নিজে পদচ্যুত করিতে পারেন না। কোন বিচারপতিকে অপসারণ করিতে হইলে নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ অভিযোগ আনয়ন করিবে ও উচ্চকক্ষ সিনেটসভা সেই অভিযোগের বিচার করিবে। ভারতে সুপ্রীম কোর্ট ও উচ্চ আদালতের বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে হইলে আইনসভার উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের ভোটে কোন বিচারপতির অসদাচরণ বা অযোগ্যতা সম্পর্কে প্রস্তাব পাস করিতে হয় এবং উক্ত প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি সকাশে উপস্থাপিত হইলে তিনি অপসারণের আদেশ দান করিবেন।

(৩) কার্যকাল—Tenure of office.

কার্যকালের স্থায়িত্ব না থাকিলে কোন লোকই কোন কাজ নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিতে পারে না। বিচারকগণের গুরু দায়িত্বের জন্য তাঁহাদের কার্যকালের স্থায়িত্ব অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন। কারণ বিচারপতিগণ যত অধিক দিন স্ব-পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন ততই তাঁহাদের অভিজ্ঞতা বা আইনের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতিগণ যতদিন সদাচারী থাকেন ততদিন পর্যন্ত তাঁহারা স্ব-পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ভারতে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ ৬৫ বৎসর পর্যন্ত ও উচ্চ বিচালয়গুলির বিচারপতিগণ ৬০ বৎসর পর্যন্ত বিচারপতির কার্য করিতে পারেন।

(৪) যোগ্যতা—Qualifications.

বিচারকের যোগ্যতা আইনসভার বা শাসনকর্তৃপক্ষের সদস্যগণের যোগ্যতা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। বিচারপতিগণের আইনবিশেষজ্ঞ হওয়া আবশ্যিক এবং বিচারপতিগণ রাজনীতি-নিরপেক্ষ হইবেন ও সদা-পরিবর্তনশীল জনমত দ্বারা প্রভাবিত হইবেন না। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহারা সদাচারী ও নিষ্ঠাবান হইবেন। এই কারণে অনেক দেশে বিশেষ করিয়া ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশে বিশিষ্ট আইনজীবিগণের মধ্য হইতে বিচারপতি নিয়োগ করা হয়। যাঁহারা অন্তত পাঁচ বৎসর কোন উচ্চ বিচারালয়ে বিচারপতির কাজ করিয়াছেন অথবা রাষ্ট্রপতির মতে যে ব্যক্তি আইনসম্পর্কিত বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ভারতে তাঁহাদিগকেই সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়। সুইস্ দেশে শাসনতান্ত্রিক বিধান অনুযায়ী বিচারপতি নিযুক্ত হইবার জন্য কোন আইনগত যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। জাতীয় সভায় নির্বাচনের যোগ্যতাসম্পন্ন যে-কোন সুইস্ নাগরিক উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতি নিযুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু কার্যতঃ উচ্চমানের আইনগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণই বিচারপতিপদে নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

(৫) বেতন পরিমাণ—Salaries.

উপযুক্ত যোগ্যতা-সমন্বিত ব্যক্তিগণকে বিচাকার্যে আকৃষ্ট করিবার জন্য বিচারপতিগণের বেতন পরিমাণ উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। বেতন পরিমাণ যদি তাঁহাদের পদমর্যাদা, দায়িত্বভার ও উচ্চমানের জীবনযাত্রার সহিত সংগতিপূর্ণ

না হয় তাহা হইলে বিচারপতিগণের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। তাঁহাদের বেতন পরিমাণ এরূপ হওয়া চাই যাহাতে তাঁহারা প্রলোভনের উর্ধ্বে থাকিয়া নির্ভয়ে ও সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন। তাঁহাদের কার্যকালের মধ্যে বেতন পরিমাণ পরির্তন করাও কাম্য নহে। বেতন পরিমাণ উপযুক্ত না হইলে অনেক সময় দেখা যায় যে, উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বিচারপতিপদ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন অথবা গ্রহণ করিয়া কিছুদিন পর পদত্যাগ করেন।

(৬) শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ— (Separation of the Judiciary from the Executive.

স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা প্রবর্তিত ও সংরক্ষিত করিবার একটি অপরিহার্য শর্ত হইল বিচারবিভাগের শাসনবিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকা। এই নিয়ন্ত্রণ মুক্তি না থাকিলে বিচারবিভাগ নির্ভীকভাবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিবার ক্ষেত্রে শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ নিরোধ করিতে সমর্থ হইতে পারে না। বহুদিন পূর্বে ফরাসী লেখক মন্টেস্কু বিচারবিভাগের এই স্বাধীনতার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। বৃটিশ শাসনকালে ভারতে বিচারবিভাগের এ স্বাধীনতা ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পর ধীরে ধীরে বিচারবিভাগকে শাসনবিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। সুপ্রীম কোর্টের কার্যপ্রণালী ও কর্মী নিয়োগ প্রধান বিচারপতির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। সুপ্রীম কোর্ট পরিচালনাব্যয়ও আইনসভার বাৎসরিক সম্মতি-নিরপেক্ষ করিয়া এই ব্যয়কে সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়-বরাদ্দের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। পার্লামেন্ট সভায়ও এই বিচারালয়ের কোন কার্য বা রায় সম্পর্কে আলোচনা হইতে পারিবে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থা (Union Judiciary)

সুপ্রীম কোর্ট—The Supreme Court.

সুপ্রীম কোর্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান কার্য হইল শাসনতন্ত্রকে রক্ষা করা। এতদ্ব্যতীত এই বিচারালয় জনসাধারণের মৌলিক অধিকারগুলিকে সুরক্ষিত

করে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্র নির্ধারিত ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করে।

একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক সাতজন বিচারপতি লইয়া ভারতের সুপ্রীম কোর্ট প্রথমে গঠিত হয়। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে একটি সংশোধনী আইন পাস করিয়া বিচারপতির সংখ্যা ৭ হইতে ১০ করা হয়। বিচারকার্য যাহাতে দ্রুত সম্পন্ন হয়, সেই উদ্দেশ্যে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় সংশোধনী আইন পাস করিয়া বিচারপতির সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে প্রধান বিচারপতি ব্যতীত আরও ১৩ জন বিচারপতি লইয়া এই আদালত গঠিত। সুপ্রীম কোর্ট ও অন্যান্য উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিদের পরামর্শক্রমে এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সহিত সর্বক্ষেত্রে পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন। বিচারপতিগণ ৬৫ বৎসর পর্যন্ত কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন। সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারপতি অবসর গ্রহণ করিবার পর ভারতের কোন বিচারালয়ের আইনব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতে পারেন না। প্রধান বিচারপতির বেতন মাসিক পাঁচ হাজার টাকা। অন্যান্য বিচারপতিগণ চার হাজার টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। বিচারপতিগণ যাহাতে স্বাধীনভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করিতে পারেন তজ্জন্য শাসনতন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, পার্লামেন্টের উভয় পরিষদে মোট সদস্যের সংখ্যাধিক্যে এবং দুই-তৃতীয়াংশের ভোটাধিক্যে কোন বিচারপতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হইলে এবং উক্ত গৃহীত প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সমর্থিত হইলে সংশ্লিষ্ট বিচারপতিকে অপসারিত করা যাইবে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণের নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকা চাই: (১) বিচারপতিগণকে অবশ্যই ভারতের নাগরিক হইতে হইবে এবং অন্ততঃপক্ষে পাঁচ বৎসরকাল কোন উচ্চ বিচারালয়ের বিচারক হওয়া চাই, বা (২) অন্ততঃ একাদিক্রমে দশ বৎসর এক বা একাধিক উচ্চ বিচারালয়ে ওকালতি করা চাই, বা (৩) রাষ্ট্রপতির মতে একজন প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ হওয়া চাই।

সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা—Powers of the Supreme Court.

ভারতের সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা চার ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, যথা,—আদিম ক্ষমতা, আপীল ক্ষমতা, পরামর্শ ক্ষমতা ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত ক্ষমতা।

(১) আদিম এলাকা—Original Jurisdiction.

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সুপ্রীম কোর্টের আদিম বিভাগের বিচার্য হইবে : (ক) ভারত সরকার বা এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে বিবাদ ; (খ) ভারত সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্য সরকার যখন একদিকে এবং এক বা একাধিক রাজ্য সরকার অপর দিকে ; (গ) দুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধ—এ স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিচার্য বিষয় বিবদমান পক্ষগুলির আইনগত অধিকার-সম্পর্কিত হওয়া চাই। এতদ্ব্যতীত 'খ'-শ্রেণীভুক্ত কোন রাজ্য যদি বিবাদের একটি পক্ষ হইত এবং উক্ত বিবাদ যদি শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পূর্বে সম্পাদিত চুক্তি, সন্ধি, সনদ ইত্যাদি সংক্রান্ত হইত, তাহা হইলে সুপ্রীম কোর্টের উক্ত বিবাদ বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না।

(২) আপীল এলাকা—Appellate Jurisdiction.

(ক) ভারতে অবস্থিত যে-কোন উচ্চ বিচারালয়ের আদেশ ও নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে তিন প্রকারের আপীল করা যাইতে পারে : (১) উচ্চ বিচারালয়ের সম্মতিক্রমে শাসনতান্ত্রিক আইনবিষয়ক ফৌজদারী, দেওয়ানী বা অন্য প্রকারের বিরোধের আপীল সুপ্রীম কোর্টে করা যাইতে পারে। (২) উচ্চ বিচারালয় যদি সম্মতি প্রদান না করে, তাহা হইলে সুপ্রীম কোর্ট নিজেই উক্তরূপ বিরোধ সম্পর্কে আপীল করিবার বিশেষ অনুমতি দান করিয়া অপীলের বিচার করিতে পারে। (৩) উপরি-উক্ত দুইটি বিধি প্রযোজ্য কি না, সে সম্পর্কেও কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার আপীল বিচার করিতে পারে।

(খ) দেওয়ানী (Civil) মামলার আপীল :

কোনও মোকদ্দমার বিচারে বা ডিক্রীতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্য যদি কুড়ি হাজার টাকার কম না হয় অথবা মামলাটি সুপ্রীম কোর্টে প্রেরণযোগ্য বলিয়া যদি উচ্চ বিচারালয় মত প্রকাশ করে, তাহা হইলে উক্ত বিষয় সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যাইতে পারে। এইরূপ মামলার ক্ষেত্রেও শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। নূতন আইন অনুসারে বর্তমানে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্য নিরপেক্ষভাবে উচ্চ বিচারালয় অথবা সুপ্রীম কোর্টের অনুমতি লইয়া সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যাইতে পারে।

(গ) ফৌজদারী (Criminal) মামলার আপীল :

ফৌজদারী মামলায় উচ্চ বিচারালয় যদি কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে অথবা উচ্চ বিচারালয় কর্তৃক কোন মামলা যদি সুপ্রীম কোর্টে আপীলযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলেও সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়। পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করিয়া সুপ্রীম কোর্টের ফৌজদারী মামলা-সংক্রান্ত আপীল শুনিবার অধিকার বৃদ্ধি করিতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে একমাত্র সামরিক আদালতের সিদ্ধান্ত ব্যতীত ভারতের অন্য যে-কোন বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল গ্রহণ করিতে পারে।

(৩) পরামর্শদান কার্য—Advisory function.

রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে কোন আইন-সম্পর্কিত বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের মতামত চাহিতে পারেন। সুপ্রীম কোর্টের কর্তব্য হইল রাষ্ট্রপতিকে ইহার মতামত জ্ঞাপন করা।

(৪) মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত ক্ষমতা—Functions in relation to Fudamental Rights.

এতদ্ব্যতীত ভারতের সুপ্রীম কোর্টের আর একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে। শাসনতন্ত্র কর্তৃক ভারতীয় নাগরিকগণের উপর যে সমস্ত মৌলিক অধিকার অর্পিত হইয়াছে, কোন কারণে যদি উক্ত অধিকারগুলি বিপন্ন হয়, তাহা হইলে সুপ্রীম কোর্ট অধিকারগুলিকে রক্ষা করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে সুপ্রীম কোর্ট নানাপ্রকার আদেশ ও নির্দেশ জারী করিয়া মৌলিক অধিকারগুলিকে সংরক্ষিত করে।

ভারতে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা পর্যালোচনা করিলে স্বভাবতই মনে হয় যে, এইরূপ ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী উচ্চ বিচারালয় আর অন্য কোন দেশে নাই। এই বিচারালয় শুধু যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় নয়, ইহা হইল ভারতের সর্বোচ্চ আপীল আদালত, সংবিধানের রক্ষক ও ব্যাখ্যাকার হিসাবে ইহাকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন করিতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখা ইহার গুরু দায়িত্ব। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ভারতীয় নাগরিকগণের সংবিধান-প্রদত্ত

মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করিবার ভার এই বিচারালয়ের উপর প্রদত্ত হইয়াছে। শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগ যাহাতে শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত গণ্ডি অতিক্রম করিয়া মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ করিতে না পারে, সেজন্য সুপ্রীম কোর্টকে সর্বদা অবহিত থাকিতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট আইনসভাপ্রণীত যে-কোন আইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারে। কিন্তু ভারতের সুপ্রীম কোর্টের সে ক্ষমতা নাই। ভারতীয় পার্লামেন্ট সভা বা রাজ্য আইনসভাগুলি যদি শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত ক্ষমতার বহির্ভূত কার্য করে, একমাত্র তাহা হইলে উক্ত আইনসভাগুলি কর্তৃক প্রণীত আইনগুলির উপর সুপ্রীম কোর্ট নির্দেশদান করিতে পারে। কিন্তু আইনসভাগুলি কর্তৃক প্রণীত আইনগুলি যদি শাসনতন্ত্র-বিরোধী না হয় তাহা হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের ন্যায় ভারতের সুপ্রীম কোর্টের উক্ত আইনগুলির গুণাগুণ বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের ন্যায় ভারতের সুপ্রীম কোর্টকে আইনসভার উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয় নাই।

সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা—The Role of the Supreme Court.

ভারতে বিচারব্যবস্থায় সুপ্রীম কোর্ট এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ও রাজ্য আইন বিষয়ে সর্বোচ্চ আপীল আদালত হিসাবে সুপ্রীম কোর্ট ভারতের বিচারব্যবস্থার শীর্ষস্থানে অবস্থিত। এই বিচারালয়ের প্রধান কার্য হইল সকল প্রকার আইনের ন্যায়সঙ্গত প্রয়োগ বলবৎ করা এবং বিচারপ্রার্থী কোন ব্যক্তি যাহাতে কোন বিচারালয় কর্তৃক ন্যায়বিচার হইতে বঞ্চিত না হয়। এই বিচারালয় কর্তৃক ঘোষিত আইন ভারতের সকল বিচারালয়ের উপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য এবং এই উদ্দেশ্যে এই বিচারালয়ে বিচারব্যবস্থার সমগ্র ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে। অন্য কোন দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতার এরূপ কেন্দ্রীকরণ করা হয় নাই। ভারতের সুপ্রীম কোর্টের কাজ আর এক দিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্র কর্তৃক ক্ষমতার বিভাজন বলবৎ রাখিয়া এই বিচারালয় উভয় সরকারের সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করে। পরিশেষে বলা যায় যে, এই

বিচারালয় শাসনতন্ত্রের এবং নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলির রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে। এই উদ্দেশ্যে সুপ্রীম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়গুলি ব্যক্তি, সংঘ এমন কি সরকারের উপরও নানাজাতীয় আদেশ ও নির্দেশ জারী করিতে পারে।

সুপ্রীম কোর্ট যাহাতে শাসনতন্ত্রের শুচিতা ও মৌলিক অধিকার রক্ষা করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই বিচারালয়কে আইনসভা-প্রণীত আইনের বৈধতা-বিচার করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ভারতে আইনসভা-প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করিবার ক্ষেত্র স্বল্প-পরিসর হইলেও যদি পার্লামেন্ট বা রাজ্য আইনসভা-প্রণীত কোন আইন শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সুপ্রীম কোর্ট এরূপ আইনকে অবৈধ বলিয়া বাতিল করিতে পারে। ইংলণ্ড বা ফরাসী দেশের উচ্চ আদালতের আইনসভা-প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করিবার এরূপ কোন ক্ষমতা নাই। অপর পক্ষে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের মত আইনসভা-প্রণীত আইনকে অযৌক্তিক বা ন্যায়-নীতি বিরোধী বলিয়া অবৈধ ঘোষণা করিতে পারে না। ভারতের সংবিধান সুপ্রীম কোর্টকে যুক্তরাষ্ট্র-সুলভ স্বাভাবিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিয়াছে। মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের মত ইহাকে আইনসভার ঊর্ধ্বে স্থান দেয় নাই।

এতদ্ব্যতীত ভারতের সুপ্রীম কোর্ট সর্বভারতীয় সর্বোচ্চ বিচারালয় হিসাবে কাজ করে। এই বিচারালয়ই হইল দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার সর্বোচ্চ আপীল আদালত। সংশ্লিষ্ট উচ্চ বিচারালয়ের সুপারিশে অথবা সুপ্রীম কোর্টের নিজ অনুমোদনে এই বিচারালয়ে আপীল করা যায়।

সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সুপ্রীম কোর্ট ভারতের সংবিধানের একমাত্র ব্যাখ্যাকার হিসাবে কাজ করে। আইনসভার অভিভাবকরূপে এই বিচারালয়কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করিয়া সংবিধানের রচয়িতাগণ ইহাকে শাসনতন্ত্রের রক্ষক ও শাসনকর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারের বাধারূপে গঠন করিয়াছেন।

রাজ্যের বিচার-ব্যবস্থা (State Judiciary)

প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া উচ্চ আদালত (হাইকোর্ট) আছে। এই

আদালত দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ মামলার বিচার করে। অন্যান্য নিম্ন বিচারালয়গুলি ফৌজদারী ও দেওয়ানী এই দুই ভাগে বিভক্ত। গুরুতর ফৌজদারী মামলাগুলি জুরীর সাহায্যে বিচার করা হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের আদালত গঠিত হয়। ইহা ছাড়া, শ্রমিক-মালিক বিরোধ প্রভৃতির নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ আদালত আছে। আইনের চক্ষে সব নাগরিকই সমান। নিম্নে আদালতগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

দেওয়ানী আদালত—Civil Courts.

(১) গ্রামের পঞ্চায়েৎ আদালতই হইল দেওয়ানী সর্বনিম্ন আদালত। এখানে ছোট-খাট মামলার বিচার হয়। ইহার উপর হইল (২) মুনসেফের আদালত। প্রত্যেক চৌকি, মহকুমা ও জেলার সদরে মুনসেফী আদালত থাকে। মুনসেফগণ সরকার কর্তৃক যোগ্যতার ভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মচারী। সাধারণতঃ ইঁহারা দুই হাজার বা বিশেষ ক্ষেত্রে তিন হাজার টাকা সম্পর্কিত দেওয়ানী মামলা পরিচালনা করিতে পারেন। ইহার উপর হইল (৩) জেলা জজের (District Judge) আদালত। ইনি হইলেন জেলার দেওয়ানী মামলা-সংক্রান্ত সর্বোচ্চ বিচারক। জেলা জজ তাঁহার সহকারী সাব্‌জজের সাহায্যে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। মুনসেফের আদালত হইতে জেলা জজের আদালতে আপীল করা যায় এবং যে সমস্ত মামলার বিষয় দুই হাজার টাকার অধিক তাহাদের সরাসরি প্রথমেই জেলা জজ বা সাব্‌জজের আদালতে শুনানী হয়। জেলা জজের রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্যের (৪) উচ্চ আদালতে আপীল করা যায়। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরে দেওয়ানী মামলার জন্য ছোট আদালত (Small Causes Court) আছে। দেওয়ানী মামলার দাবীর পরিমাণ ২০ হাজার টাকার বেশী হইলে উচ্চ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে (৫) সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়।

ফৌজদারী আদালত—Criminal Courts.

ফৌজদারী মামলার জন্য সর্বনিম্ন আদালত হইল (১) গ্রাম পঞ্চায়েৎ আদালত। পঞ্চায়েতী আদালত ছোট-খাট মামলার বিচার করে ও অল্প পরিমাণ জরিমানা করিতে পারে। অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধের জন্য প্রত্যেক

মহকুমা ও জেলা-সদরে (২) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বিচার-বিভাগীয় বিচারক (Judicial Magistrate) থাকে। খুন, গৃহদাহ প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের বিচার সরাসরি (৩) জেলার দায়রা জজের (Sessions Judge) আদালতে হয়। প্রত্যেক জেলায় একজন দায়রা জজ থাকেন। ইনি জেলা জজ ও দায়রা জজ উভয়রূপেই কাজ করেন। দায়রা জজ ও তাঁহার সহকারী দায়রা জজের (Assistant Sessions Judge) সাহায্যে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট হইতে আনীত গুরুতর ফৌজদারী মামলার বিচার করেন। সাধারণ ম্যাজিস্ট্রেটগণ গুরুতর ফৌজদারী মামলার বিবরণ শুনিয়া এই মামলাগুলি দায়রা আদালতে সোপর্দ করেন, কারণ, তাঁহাদের এই মামলাগুলি বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। দায়রা জজ অপরাধীকে প্রাণদণ্ড দিতে পারেন, কিন্তু এই দণ্ডাদেশ উচ্চ বিচারালয় কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। দায়রা জজ নিম্ন আদালতগুলি হইতে আনীত আপীলগুলিও বিচার করেন। গুরুতর মামলার বিচারকালে দায়রা জজকে জুরীর সাহায্য লইতে হয়। জুরীগণ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী বা নির্দোষ সাব্যস্ত করেন, কিন্তু দণ্ড সম্পর্কে তাঁহাদের কোন হাত নাই। জজ ও জুরীগণের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে এই মামলা উচ্চ আদালতে পাঠাইতে হয় এবং বিশেষ ক্ষেত্রে জজ নূতন জুরী নিযুক্ত করিয়া মামলার পুনর্বিচার করিতে পারেন। দায়রা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে (৪) উচ্চ আদালতে আপীল করা যায়। উচ্চ আদালত হইতে মাত্র নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে (৫) সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়।

কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় শহরে ফৌজদারী মামলার জন্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত আছে। ইহা ছাড়া, কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় শহরে নগর আদালত (City Court) সৃষ্টি হইয়াছে।

উচ্চ আদালত—The High Court.

শাসনতন্ত্রের ২১৪ নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক রাজ্যে একটি উচ্চ আদালত থাকিবে, কিন্তু পার্লামেন্ট ইচ্ছা করিলে একাধিক রাজ্যের জন্য একটিমাত্র উচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। এইরূপে আসাম ও নাগাভূমির জন্য একটিমাত্র আদালত প্রতিষ্ঠিত আছে। উচ্চ আদালতই হইল রাজ্যের বিচার-ব্যবস্থার উচ্চতম প্রতিষ্ঠান।

প্রত্যেক উচ্চ আদালত একজন প্রধান বিচারপতি (Chief Justice) সহ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক বিচারপতি লইয়া গঠিত হয়। অসমাপ্ত কার্য শেষ করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি দুই বৎসরের জন্য অতিরিক্ত বিচারপতি (Additional Judge) নিয়োগ করিতে পারেন। কোন বিচারপতির সাময়িক অনুপস্থিতির কালে রাষ্ট্রপতি অস্থায়ী বিচারপতি নিয়োগ করিতে পারেন। এই উভয় শ্রেণীর বিচারপতিগণ ৬২ বৎসর পর্যন্ত কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন।

বিচারপতি নিয়োগ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ ভারতের প্রধান বিচারপতি, সংশ্লিষ্ট রাজ্যপাল ও সংশ্লিষ্ট উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া নিয়োগ করেন।

বিচারপতিগণ মাসিক ৩,৫০০৲ টাকা এবং প্রধান বিচারপতি ৪,০০০৲ টাকা বেতন পান। বিচারপতিগণের অবসরকালীন ভাতা ও পেন্সন পার্লামেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত হয়। বিচারপতি নিযুক্ত হইবার পর পার্লামেন্ট বিচারপতিগণের অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের বেতন ও কার্যের আনুষঙ্গিক সুবিধার পরিবর্তন করিতে পারে না।

উচ্চ আদালতের বিচারপতির যোগ্যতা হইল যে, তাঁহাকে অনধিক ষাট বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। ভারতের যে-কোন অংশে তাঁহাকে বিচারপতির কার্য করিতে হইয়াছে কিংবা এক বা একাধিক উচ্চ বিচারালয়ে তিনি ব্যবহারজীবী হিসাবে কার্য করিয়াছেন।

কার্য ও ক্ষমতা—Powers and Functions.

প্রত্যেক উচ্চ আদালতের এলাকা সেই রাজ্যের এলাকার সমান। আবার অনেক ক্ষেত্রে একই উচ্চ আদালতের এলাকা একাধিক রাজ্যের উপর বিস্তৃত হইতে পারে এবং কতিপয় ক্ষেত্রে রাজ্যের এলাকা বহির্ভূত কেন্দ্রীয় শাসন অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে। কলিকাতা উচ্চ বিচারালয়ের এলাকা রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত প্রসারিত।

আদিম ক্ষমতা—Original Jurisdiction.

পূর্বে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতা এই তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরের উচ্চ

বিচারালয়ের আদিম ফৌজদারী ক্ষমতা ছিল অর্থাৎ এই তিনটি শহরের এলাকায় অনুষ্ঠিত গুরুতর ফৌজদারী মামলার প্রথম বিচার এই আদালত-গুলিতে অনুষ্ঠিত হইত। বড় বড় দেওয়ানী মামলার বিচারও এই আদালত প্রথম বিচারালয় হিসাবে পরিচালিত করিত। কিন্তু এই তিনটি শহরে নগর আদালত (City Court—Civil and Criminal) প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই ও মাদ্রাজ উচ্চ বিচারালয়ের ফৌজদারী মামলার প্রথম বিচারালয় হিসাবে কাজ করিবার কর্তব্য অর্থাৎ আদিম ক্ষমতা লোপ করা হইয়াছে। দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে আদিম ক্ষমতা অতি স্বল্প পরিমাণে আছে। কিন্তু নগর আদালত প্রতিষ্ঠার পরেও কলিকাতা উচ্চ বিচারালয়ের ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় বিষয়ে আদিম ক্ষমতা কিছু সংকুচিত হইলেও একেবারে বিলোপ করা হয় নাই।

আপীল ক্ষমতা—Appellate Jurisdiction.

উচ্চ বিচারালয়ের ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয়বিধ মামলার আপীল শুনিবার ক্ষমতা আছে। ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত আদালত-গুলি হইতে আনীত আপীল মামলার বিচার করিতে পারে ঃ—(১) দায়রা জজ, অতিরিক্ত বা সহকারী দায়রা জজ, (২) প্রেসিডেন্সী বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, (৩) উচ্চ আদালতের আদিম ক্ষমতার বিরুদ্ধেও আপীল শুনিতে পারে।

দেওয়ানী বিষয়-সংক্রান্ত মামলায় উচ্চ আদালতে প্রথম ও দ্বিতীয় আপীল বিচারালয় হিসাবে কাজ করে। প্রথম আপীল আদালত হিসাবে এই বিচারালয় আইন ও তথ্য উভয় বিষয়ে বিচার করিতে পারে কিন্তু দ্বিতীয় আপীল আদালত হিসাবে শুধু আইন-সংক্রান্ত বিষয়ের বিচার করে। ইহা ছাড়া বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা, এলাহাবাদ, পাটনা প্রভৃতি উচ্চ বিচারা-লয়গুলি বিশেষ ক্ষমতা বলে উচ্চ আদালতের একজন মাত্র বিচারপতি কর্তৃক বিচার করা মামলার আপীল শুনিতে পারে।

ইহা ছাড়া, একমাত্র সামরিক বিচারালয়গুলি ব্যতীত অন্যান্য বিচারালয়-গুলির উপর তদারক করিবার বিস্তৃত ক্ষমতা উচ্চ বিচারালয়ের আছে। রাজ্যের সাধারণ বিচারালয়গুলি ব্যতীত বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদালত, উদ্বাস্তু-

সম্পত্তির রক্ষক প্রভৃতি আধা-বিচারালয়গুলির উপরও উচ্চ আদালতের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে। কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে বা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে এই বিচারালয় নানা আদেশ ও নির্দেশ জারী করিয়া মৌলিক অধিকার রক্ষা করিতে পারে।

রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত নিম্ন আদালতগুলির উপরও এই বিচারালয়ের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে। জেলা জজের নিয়োগ, পদোন্নতি প্রভৃতি ব্যাপারে রাজ্যপাল এই বিচারালয়ের সহিত পরামর্শ করেন। জেলা আদালত ও অন্যান্য নিম্ন আদালতগুলির বিচারপতিগণের নিয়োগ, পদোন্নতি, ছুটি প্রদান প্রভৃতি এই বিচারালয়ের ক্ষমতাভুক্ত বিষয়।

উচ্চ আদালতের বিচারপতিগণ ৬২ বৎসর পর্যন্ত কাজ করিতে পারেন। তাঁহারা লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করিতে পারেন। অকর্মণ্যতা বা অসদাচরণের হেতু পার্লামেন্ট সভার উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অভিযোগে রাষ্ট্রপতি কোন বিচারপতিকে ভারমুক্ত করিতে পারেন।

বিচার-ব্যবস্থার স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার উপরই সু-শাসনব্যবস্থা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণ যাহাতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করিতে পারেন তজ্জন্য তাঁহাদের কার্যের স্থায়িত্ব সংবিধান কর্তৃক দৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। তাঁহাদের বেতনাদিও পার্লামেন্টের বাৎসরিক অনুমোদনসাপেক্ষ নহে। নিয়োগের পর বিচারপতিগণের বেতন, ভাতা বা অন্যান্য অধিকারগুলির পরিবর্তন পার্লামেন্ট করিতে পারে না। অবসর গ্রহণ করিবার পর কোন বিচারপতি সংশ্লিষ্ট উচ্চ বিচারালয়ে আর ব্যবহারজীবীর কাজ করিতে পারিবেন না।

পার্শ্ববর্তী রাজ্যের উচ্চ বিচারালয়গুলি সাধারণতঃ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আপীল আদালতের কার্য করিয়া থাকে। এইরূপ দিল্লী অঞ্চলের আপীল আদালত ছিল পাঞ্জাব উচ্চ বিচারালয় এবং কলিকাতা উচ্চ বিচারালয় আন্দামান ও নিকোবর অঞ্চলের আপীল শুনিয়া থাকে। কেবলমাত্র হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর ও ত্রিপুরা অঞ্চলের জন্য তিনটি জুডিসিয়াল কমিশনারের আদালত আছে। এই আদালতগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উক্ত অঞ্চলগুলির

উচ্চ বিচারালয়ের কার্য সম্পাদন করে এবং আদালতগুলির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়।

ভারতে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা—Independence of the Judiciary in India.

গণতন্ত্রে শাসনব্যবস্থার সকল বিভাগের উপরই জনগণের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে। এরূপ অবস্থায় বিচারবিভাগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভব নহে, কাম্যও নহে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা এরূপ অপরিহার্য যে, এই স্বাধীনতা ব্যতীত ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইয়া গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রহসনে পর্যবসিত হয়। বিচারবিভাগের স্বাধীনতার অর্থ হইল যে, বিচারকগণ নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগ করিয়া যাহাতে দোষী ও নির্দোষ স্থির করিয়া অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে শাস্তি বিধান করিতে পারেন। সেজন্য বিচারকগণ জনমত, শাসনকর্তৃপক্ষ বা আইনসভা-নিরপেক্ষ হইবেন। বিচারপতিগণ যদি ভয় বা অনুগ্রহের জন্য কাহারও মুখাপেক্ষী হন, তাহা হইলে এরূপ বিচারপতির দ্বারা ন্যায় বিচার সম্ভব নহে। যে শাসনব্যবস্থায় ন্যায় বিচার সম্ভব নহে, সে শাসনব্যবস্থাকে কোন মতেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলা যাইতে পারে না।

তিনটি উপায়ে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সৃষ্টি করা হয়। প্রথমতঃ, বিচারপতিগণের স্বাধীনতা তাঁহাদের নিয়োগ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। নিয়োগ পদ্ধতি এরূপ হইবে যে, একবার বিচারক নিযুক্ত হইলে তাঁহাদের স্বাধীন মতের জন্য যেন কোন কর্তৃপক্ষই তাঁহাদের পদচ্যুত করিতে না পারে। দ্বিতীয়তঃ, কার্যকালের স্থায়িত্বের উপরও তাঁহাদের স্বাধীনতা নির্ভর করে। এইজন্য অন্যায় ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে তাঁহাদের অপসারিত হইবার ভয় না থাকিলে তাঁহারা নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে তাঁহাদের গুরু দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন। তৃতীয়তঃ, তাঁহারা যাহাতে কোন প্রলোভনের দ্বারা আকৃষ্ট না হন, সেজন্য তাঁহাদের উপযুক্ত পরিমাণ বেতন দেওয়া উচিত এবং কার্যকালে তাঁহাদের বেতন পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি না করা উচিত। এখন দেখা যাউক, ভারতে উপরি-উক্ত উপায়-গুলির সাহায্যে বিচারবিভাগকে কতদূর স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করা হইয়াছে।

ভারতে বিচারপতিগণের নিয়োগ পদ্ধতি বহুলাংশে বৃটিশ ও মার্কিন ব্যবস্থার অনুরূপ। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। কিন্তু এরূপ নিয়োগ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে সুপ্রীম কোর্টের ও রাজ্যের উচ্চ বিচারালয়ের কিছু সংখ্যক বিচারপতিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া নিয়োগ করিতে হয়। প্রধান বিচারপতি ব্যতীত অন্য বিচারপতি নিয়োগ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে অবশ্যই ভারতের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করা বাধ্যতামূলক। রাজ্যের উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণের নিয়োগ ক্ষেত্রেও তাঁহাকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল, প্রধান বিচারপতি প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিতে হয়।

ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে বিচারপতিগণ যতদিন সদাচারী থাকেন ততদিন পর্যন্ত কার্যে বহাল থাকেন। ভারতে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ ৬৫ বৎসর ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণ ৬২ বৎসর পর্যন্ত কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন। বিচারপতিগণের এরূপ উর্ধ্ব বয়ঃসীমা নির্ধারণ করিবার কারণ হইল যে, তাঁহারা যাহাতে দীর্ঘদিন কাজ করিয়া আইন প্রয়োগের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারেন।

ভারতে বিচারপতিগণের অপসারণ পদ্ধতিও সহজসাধ্য নহে। সুপ্রীম কোর্ট বা উচ্চ বিচারালয়ের কোন বিচারপতিকে একমাত্র অবধারিত অসদাচরণ বা অক্ষমতার কারণে অপসারণ করা চলে। এরূপ ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের প্রত্যেক কক্ষ ইহার ২/৩ সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে ও সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে এই অপসারণের প্রস্তাব পাস করিয়া রাষ্ট্রপতি সকাশে উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং রাষ্ট্রপতি এই অপসারণের আদেশ জারি করিবেন।

বিচারপতিগণকে প্রলোভনের ঊর্ধ্বে রাখিবার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পরিমাণ বেতন দেওয়া প্রয়োজন। ভারতে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ৫,০০০৲ টাকা ও অন্যান্য বিচারপতিগণ ৪,০০০৲ টাকা বেতন পান। উচ্চ বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি ৪,০০০৲ টাকা ও অন্যান্য বিচারপতিগণ ৩,৫০০৲ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে বিচারপতিগণের এই বেতন যথেষ্ট বলা যাইতে পারে। তবে এস্থলে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যদিও অন্যান্য দেশের ব্যবস্থার ন্যায় ভারতের বিচারপতিগণের

বেতন পরিমাণ তাঁহাদের কার্যকালে পরিবর্তন করা যায় না, তবুও শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অর্থ-সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণা কালে বিচারপতিগণের বেতন পরিমাণ হ্রাস করা যাইতে পারে।

ভারতে বিচারবিভাগকে স্বাধীন করিবার উদ্দেশ্যে আর একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। সুপ্রীম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়গুলির কর্মচারিবৃন্দকে সম্পূর্ণরূপে এই বিচারালয়গুলির কর্তৃত্বাধীন করা হইয়াছে। এই কর্মচারিবৃন্দের নিয়োগ, বেতন পরিমাণ ও কার্যের অন্যান্য শর্তাদি প্রধান বিচারপতি বা অন্য কোন বিচারপতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই বিচারালয়গুলির জন্য যে ব্যয় হয়, তাহাও পার্লামেন্ট সভার বাৎসরিক অনুমোদনসাপেক্ষ নহে। এতদ্ব্যতীত আইনসভার সদস্যগণও তাঁহাদের বাক্‌স্বাধীনতার বলেও সুপ্রীম কোর্ট অথবা উচ্চ বিচারালয়ের কোন বিচারপতির আচরণ সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য করিতে পারেন না।

ভারতে বিচারপতিগণের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলেও এ স্থলে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারতের শাসনকর্তৃপক্ষ নিয়োগ করিতে পারিলেও বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে পারেন না। আইনসভা ইঁহাদের বেতন পরিমাণ হ্রাস করিতে না পারিলেও পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করিয়া বিচারপতিগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারে এবং এইরূপে সংখ্যাবৃদ্ধি দ্বারা সরকারের মনোমত বিচারপতি নিয়োগ করিয়া সরকার বিচারালয়গুলিতে আপন আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। ইহার ফলে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে একমাত্র সজাগ ও সক্রিয় জনমত এই দুর্নীতির প্রতিবিধান করিতে সক্ষম।

ভারতে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা পরোক্ষভাবে আইনসভার মাধ্যমে ক্ষুণ্ণ করা যাইতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত বা মন্তব্য দ্বারা যখনই শাসন বিভাগের অনুসৃত কোন নীতি বা কার্যসূচী বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখনই শাসন বিভাগ আইনসভার সাহায্যে প্রয়োজনীয় নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া বিচারালয়-সৃষ্ট অন্তরায় দূর করে। বেরুবাড়ী অর্পণ, ভূমি সংস্কারমূলক আইন, রাজন্য ভাতা বিলোপ আইন, প্রধান প্রধান ব্যাংকগুলির জাতীয়করণ

প্রভৃতি আইন প্রণয়ন ব্যাপারে ভারত সরকার সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তের ফলে যে সমস্ত বাধার সম্মুখীন হন, শাসন বিভাগ পার্লামেন্টের সাহায্যে প্রয়োজনীয় আইনপ্রণয়ন করিয়া সে সমস্ত বাধা দূর করিয়া লয়। সুতরাং ভারতে ক্ষমতার স্বাতন্ত্রীকরণ না থাকিবার ফলে আইনসভার মাধ্যমে শাসন বিভাগের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত।

ভারতে বিচার-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য—Features of the Indian Judicial System.

ভারতে বিচার-ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রায় দেড়-শতাব্দীকাল পর্যন্ত বৃটিশ শাসনাধীন থাকার ফলে ভারতের বিচার-ব্যবস্থায় বৃটিশ বিচার-ব্যবস্থার কতিপয় লক্ষণ দেখা যায়।

প্রথমতঃ, ভারতে আইনের চক্ষে সকল নাগরিকই সমান। সকল নাগরিকের একদফা নাগরিকত্বের অনুরূপভাবে সকলের জন্যই একই আইন ও একই বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিচারালয় গঠিত হইলেও ফরাসী দেশের মত ভারতে কোন শাসন বিভাগীয় বিচারালয় (Administrative Court) নাই। সাধারণ নাগরিক ও সরকারী কর্মচারী উভয় শ্রেণীর লোকই একই বিচারালয়ের বিচারাধীন—যদিও রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি বা সুপ্রীম কোর্ট এবং উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণের বিচারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও এখানকার বিচারব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ করা হইয়াছে। সর্বভারতের জন্য একমাত্র আপীল আদালত হইল সুপ্রীম কোর্ট। এই বিচারালয় রাজ্যগুলি হইতে আনীত ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলাগুলির আপীল শুনিয়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় সুপ্রীম কোর্টের এরূপ আপীল শুনিবার ক্ষমতা নাই।

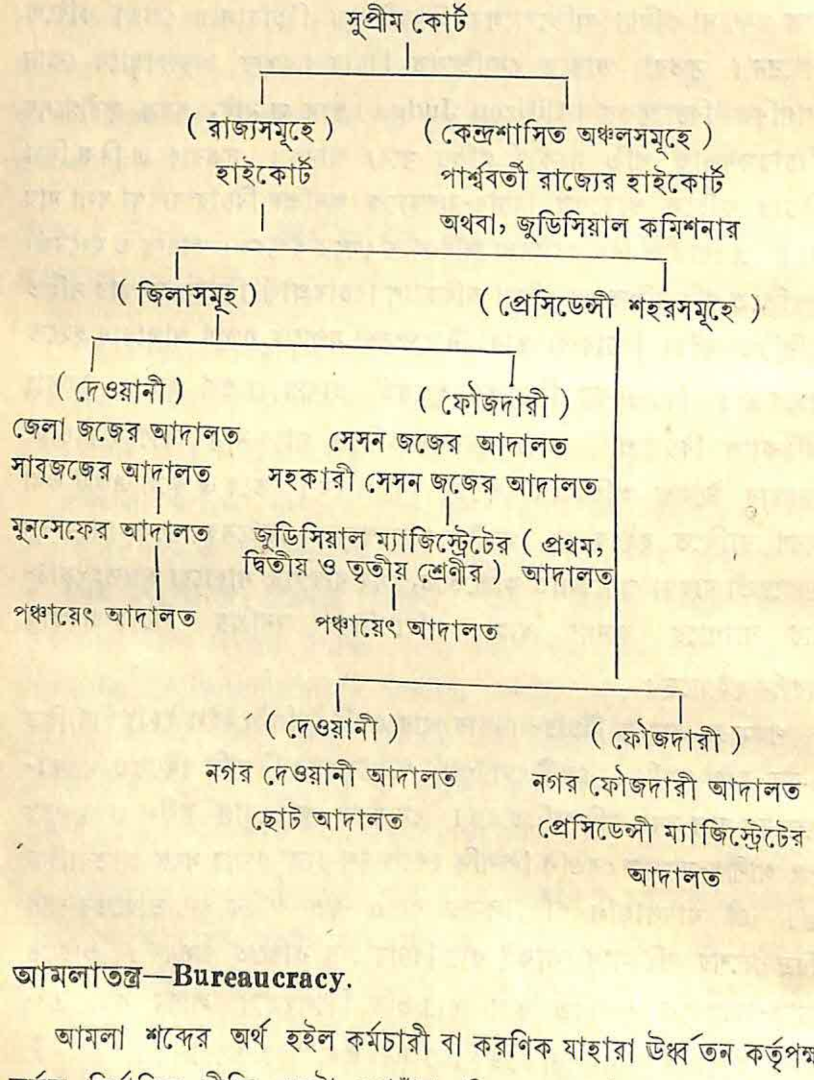
তৃতীয়তঃ, সর্বভারতের জন্য প্রায় একই ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিধি প্রবর্তিত হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, গুরুতর ফৌজদারী মামলা জুরীর সাহায্যে পরিচালিত হয়। জুরীগণ তথ্য সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করিতে পারিলেও আইন সম্পর্কিত

বিষয়ে তাঁহাদের কোনরূপ ক্ষমতা নাই। বিচারপতি তথ্য সম্পর্কে জুরীর মত গ্রহণ না করিয়া অভিযোগের বিষয়টি উচ্চ বিচারালয়ে প্রেরণ করিতে পারেন। সুতরাং ভারতে সোভিয়েত বিচার-ব্যবস্থার অনুরূপভাবে কোন নাগরিক বিচারকের (Citizen Judge) স্থান ত নাই, পরন্তু জুরীগণের বিচারক্ষমতাও অতি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। সুতরাং এ দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতের বিচার-ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় বিচার-ব্যবস্থা বলা যায় না। এতদ্ব্যতীত বিচার-ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষায় ও ইংরেজী পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় বলিয়া অধিকাংশ বিচারপ্রার্থী বিচার-ব্যবস্থার সহিত পরিচিত হইয়া বিচার-ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ আস্থাবান হইতে পারে না। বিচারকের সিদ্ধান্তও ইংরেজী ভাষায় দেওয়া হয়। সুতরাং অধিকাংশ বিচারপ্রার্থী তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কাজেই বিচার-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিফল হয়। তবে এ স্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের ফলে গ্রামে যে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা প্রসারলাভ করিতেছে, সেই ব্যবস্থার সাহায্যে অন্ততঃ ছোট-খাট ব্যাপারে জনগণ দ্বারা পরিচালিত জনপ্রিয় বিচার-ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ, ভারতে বিচার-ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল ইহার দীর্ঘায়িত ও ব্যয়-বহুল পদ্ধতি। একটি ছোট-খাট অভিযোগের নিষ্পত্তি হইতেও অন্ততঃ-পক্ষে ছয় মাস সময় অতিবাহিত হয়। যে সমস্ত অভিযোগ জটিল ও গুরুতর এবং আপীল-সাপেক্ষ সেগুলি নিষ্পত্তি হইতে দশ বার বৎসর সময় অতিবাহিত হয়। এই মামলাগুলি পরিচালনার ব্যয়ও এত অধিক যে, ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশের অধিকাংশ লোকই ন্যায় বিচার ক্রয় করিতে অসমর্থ। ভারতে বিচার-ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করা, ব্যয়-ভার বিশেষরূপে লাঘব করা এবং জনসাধারণের বোধগম্য পদ্ধতিতে পরিচালনা করা আশু প্রয়োজন।

ভারতে বিচার-ব্যবস্থা



আমলাতন্ত্র—**Bureaucracy.**

আমলা শব্দের অর্থ হইল কর্মচারী বা করণিক যাহারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নীতি একটা ধরাবাঁধা নিয়মে কার্যে রূপদান করেন। আমলা শব্দটির সহিত 'তন্ত্র' শব্দটি যুক্ত হইয়া শাসন বিভাগের এই প্রত্যঙ্গটিকে একটি পৃথক শ্রেণীতে পরিণত করিয়া ইহাকে একটি বিশেষ মর্যাদা দান করিয়াছে। এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, আমলাতন্ত্র রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র প্রভৃতির ন্যায় সরকারের একটি বিশেষ শ্রেণী নহে। আমলাতন্ত্র

সরকারের শাসন বিভাগের একটি নিম্নতন প্রত্যঙ্গ। এই প্রত্যঙ্গের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের জন্য ইহার আমলাতন্ত্র নামকরণ হইয়াছে।

আমলাতন্ত্র ইংরেজী ব্যুরোক্রাসী শব্দটির প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ব্যুরোক্রাসী শব্দটি ফরাসী ব্যুরো শব্দটি হইতে উদ্ভূত। ইহার অর্থ হইল ডেস্ক সরকার (a desk government) অর্থাৎ যে শাসনব্যবস্থার কার্য কতকগুলি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এই সরকারী বিভাগগুলির বৈশিষ্ট্য হইল অত্যধিক ক্ষমতা-প্রিয়তা, নিয়মানুবর্তিতা ও দীর্ঘসূত্রতা।

আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের দ্বারা দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালিত হয়। এই কর্মচারীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা যোগ্যতা স্থির করিয়া সরকারী কার্যে নিয়োগ করা হয়। একটা নির্দিষ্ট বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া একটা নির্দিষ্ট বয়সে তাঁহাদের শাসনকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। অবসর গ্রহণ করিবার পর তাঁহারা পেন্সন পান। এই সমস্ত কর্মচারিগণের বাঁধা নিয়মে দিনের পর দিন কাজ করিতে হয় বলিয়া তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রেই ধরাবাঁধা নিয়মের গণ্ডির বাহিরে কিছু করিতে রাজী হন না। সরকারী কার্যে নিযুক্ত বলিয়া তাঁহারা নিজেদের বিশিষ্ট পদমর্যাদাসম্পন্ন বলিয়া মনে করেন এবং সেজন্য সাধারণ লোকের সহিত তাঁহাদের প্রয়াই যোগাযোগ থাকে না। ফলে, সরকারী কর্মচারী হইলেও জনগণের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ সহানুভূতি থাকে না। তাঁহারা এক বিশেষ আমলাতান্ত্রিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া জনসাধারণ হইতে তাঁহাদের পার্থক্য রক্ষা করিতে যত্নবান হন। শাসনকার্যে দীর্ঘসূত্রতা আমলাতান্ত্রিক সরকারের আর একটি দোষ। সম্ভব হইলেও নিয়ম বহির্ভূত কোন কাজ করিতে ইঁহারা নারাজ। আমলাতান্ত্রিক সরকার সম্পর্কে মিল বলিয়াছেন যে, এই সরকার অস্বাভাবিকরূপে নিয়মানুবর্তী ও এই রোগেই ইহার মৃত্যু ঘটে। এই অস্বাভাবিক নিয়মানুবর্তিতার জন্য অনেক সময় জনস্বার্থও ব্যাহত হয়।

দীর্ঘসূত্রী ও অত্যধিক নিয়মানুবর্তী হইলেও আমলাতান্ত্রিক সরকারের কর্মদক্ষতা অস্বীকার করা যায় না। দীর্ঘদিনের সরকারী কার্যের অভিজ্ঞতার ফলে ইহাদের সরকারী কার্যে যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। জটিল সমস্যাসমূহের সমাধানে এই জাতীয় কর্মচারিগণ সিদ্ধহস্ত। অনেক সময় মন্ত্রি

পরিষদ কি আইন প্রণয়নে, কি নীতি নির্ধারণে এই কর্মচারীদের সাহায্যে উপকৃত হন। আমলাতন্ত্রের উপর মন্ত্রিপরিষদের এই নির্ভরশীলতা অনেক দেশে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াছে। আমলাতন্ত্রের বিশেষ দোষ হইল ইহার দায়িত্বশীলতার অভাব। সু-শাসনব্যবস্থার জন্য সরকারী কর্মচারিগণের মধ্যে কর্মদক্ষতা ও দায়িত্বশীলতা এই দুইটি গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক। আমলাতন্ত্র কর্মদক্ষ, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জনসাধারণের সংস্পর্শে আসিয়া সাধারণের স্বার্থ সম্পর্কে একটু অবহিত হইলে আমলাতন্ত্র আদর্শ শাসনব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। জনসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া আমলাতন্ত্রের গঠন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব ও কার্য—Importance and Functions of Bureaucracy.

আমলাতন্ত্র হইল শাসন বিভাগের একটি প্রত্যঙ্গ। এই প্রত্যঙ্গটিকে সমগ্র বিভাগের মেরুদণ্ড বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক দেশেই এই আমলাতন্ত্র লইয়া শাসনবিভাগ গঠিত হয়। শাসনবিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হইলেন স-মন্ত্রিপরিষদ রাজা বা রাষ্ট্রপতি। মন্ত্রিপরিষদ নির্ধারিত কালের জন্য নির্বাচিত বা নিযুক্ত হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং নির্দিষ্ট কাল অন্তে কার্যভার মুক্ত হন ও নূতন মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। উর্ধ্বতন শাসন কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করেন ও সরকারী কার্যসূচী স্থির করেন এবং এজন্য তাঁহারা পরোক্ষভাবে জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকেন। কিন্তু নীতি নির্ধারণ ও কার্যক্রম স্থির করাই শাসন পরিচালনার একমাত্র কার্য নহে। নির্ধারিত নীতি ও কার্যক্রমকে কার্যে রূপায়িত করিবার জন্য আর একদল দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মচারীর প্রয়োজন। এই কর্মচারিগণের শুধু দক্ষ ও কর্মকুশল হইলেই চলে না—তাঁহাদের কার্যের স্থায়িত্বও থাকা চাই। নতুবা উর্ধ্বতন শাসন কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদের পরিবর্তনের সঙ্গে এই কর্মচারিবৃন্দের পরিবর্তন ঘটিলে শাসন বিভাগের কার্য একেবারেই অচল হয়। সেইজন্য প্রত্যেক দেশের শাসনব্যবস্থায় দুই শ্রেণীর শাসক দেখা যায়—প্রথম শ্রেণীর শাসকগণ শাসন-বিষয়ক নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়ন করিলেও নির্দিষ্ট কালের জন্য নিযুক্ত হন। দক্ষতা অপেক্ষা দায়িত্বশীলতা

হইল এই শ্রেণীর শাসকবর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর শাসকগণ দক্ষতা ও কর্মকুশলতার ভিত্তিতে দীর্ঘকালের জন্য নিযুক্ত হন। দায়িত্বশীলতা অপেক্ষা কর্মকুশলতাই হইল এই শ্রেণীর শাসকবর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর শাসকবর্গ হইলেন আমলাতন্ত্র বা স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ। এই শ্রেণীর কর্মচারিগণ যাহাতে নিরপেক্ষভাবে দক্ষতার সহিত সরকারী কার্য পরিচালনা করিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে ইঁহাদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বেতন প্রভৃতি একটি নিরপেক্ষ নিয়োগ পরিষদ কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়।

সুতরাং দেখা যায় যে, আমলাতন্ত্র শুধু শাসন বিভাগের মেরুদণ্ড নহে, এই কর্মচারিবৃন্দ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দক্ষিণ হস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইঁহারা সরকারী কার্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন—ইঁহাদের কার্যকালের স্থায়িত্ব না থাকিলে ঊর্ধ্বতন শাসন কর্তৃপক্ষের পরিবর্তনে শাসনব্যবস্থা অচল হইত। আমলাতন্ত্র মন্ত্রিবর্গকে তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ করিয়া নীতি নির্ধারণে সাহায্য করে। সরকার যে নীতি বা কার্যক্রম স্থির করেন সেই কার্যক্রমকে রূপদান করার গুরুদায়িত্ব আমলাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত। আমলাতন্ত্র অনেকসময় আইনসভা প্রণীত আইনকে কার্যক্ষেত্রে প্রযোজ্য করিবার নিমিত্ত নানা উপবিধি (By-laws), নিয়ম-কানুন (Rules and regulations) প্রণয়ন করে। আমলাতন্ত্র প্রণীত এই উপবিধি ও নিয়মকানুনগুলিকে অর্পিত ক্ষমতা বলে আইন প্রণয়ন (Delegated Legislation) বলা হয়। এই কারণে সরকারী কার্যে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। সু-শাসনব্যবস্থা দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতা এই দুইটি গুণের উপর নির্ভর করে। শাসন বিভাগের এই দুইটি অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের (ঊর্ধ্বতন শাসনকর্তৃপক্ষ ও আমলাতন্ত্র) সুসামঞ্জস্যের উপর শাসনব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে। সুতরাং একটি দেশের শাসনব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

একাদশ অধ্যায়

জনমত ও দলব্যবস্থা

Public Opinion And Party System

জনমতের প্রকৃতি—Nature of Public Opinion.

জনমতের অর্থ এই নয় যে, দেশের সকল ব্যক্তি একমত হইবে। প্রত্যেকটি বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির ও বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মতামত থাকিতে পারে। জনমত বলিতে ইহাদের কোন একটি বিশেষ মত বুঝায় না। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতই যে সকল সময় নির্ভুল হইবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং জনমত বলিতে সর্ববাদিসম্মত মত বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বুঝায় না। এ অবস্থায় কোন্ মতকে জনমত বলা যায় তাহা স্থির করা এক সমস্যা। বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যে মত পোষণ করে, সাধারণতঃ তাহাই জনমতরূপে পরিগণিত হয়। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল এই জনমত সমর্থন না করিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা এই মতের প্রতি যেন বিদ্রোহভাবাপন্ন না হয়। সংখ্যালঘু দল যদি বিরুদ্ধমনোভাবাপন্ন হইয়া সক্রিয়ভাবে এই মতের বিরোধিতা করে, তাহা হইলে তাহাকে সুসংবদ্ধ জনমত বলা চলে না। তবে এ-কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যদি তাহাদের সংখ্যাধিক্যের বলে সংখ্যালঘু দলের স্বার্থের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া স্বীয় স্বার্থসাধনের নিমিত্ত কোন মত পোষণ করে, তাহা হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মত বলিয়াই তাহাকে প্রকৃত জনমত বলা সমীচীন নয়।

জনসাধারণের প্রায়ই নিজস্ব কোন মতামত থাকে না। বুদ্ধিমান্ ও কর্মঠ ব্যক্তিগণ জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহ ও তাহাদের সমাধানের উপায়গুলি স্থির করেন এবং এইগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া জনসাধারণের মধ্যে মতের সৃষ্টি করিতে সহায়তা করেন। জনসাধারণ তাহাদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া এই সকল চিন্তানায়কের মতে আস্থাবান্ হয়। এইরূপে জনসংখ্যার বিশাল এক অংশ যখন কোন নির্দিষ্ট মতের

সমর্থক হয়, তখন তাহাকে জনমত বলা হয়। সুতরাং যে মত জনগণের বিচারবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাহার উদ্দেশ্য হইল জনগণের বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করা, সেই মতকেই প্রকৃত জনমত বলা হয়। ব্যক্তিবিশেষ বা দল-বিশেষের স্বার্থ-সম্পর্কিত কোন মতকেই জনমত আখ্যা দেওয়া চলে না।

জনমত (Public Opinion)

জনমত ও গণতন্ত্রে ইহার গুরুত্ব—Public opinion and its importance in a Democracy.

গণতন্ত্র সফল করিবার একমাত্র উপায় হইল শিক্ষিত ও সচেতন জনমত সৃষ্টি করা। বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে শাসনকার্য-পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অথচ জনগণ যদি তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে আত্মসচেতন এবং অধিকারগুলি রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর না হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্রের অবসান হইয়া স্বৈরতন্ত্র বা একনায়কত্বের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য জনগণকে সর্বদা সজাগ থাকিয়া শাসকশ্রেণীর কার্যকলাপের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। শাসকশ্রেণী যদি বুঝিতে পারে যে, জনসাধারণ তাহাদের অন্যায় কার্যকলাপ কখনই বরদাস্ত করিবে না, তাহা হইলে তাহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া জনসাধারণকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। সুতরাং দেশের জনসাধারণ যদি ঐক্যবদ্ধ হইয়া সরকারী কার্যের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে—সরকারী কার্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিলে তাহারা যদি সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাহা প্রতিরোধ করে, তাহা হইলে সরকার কখনও বে-আইনী কার্য করিতে সাহসী হয় না। যেখানে জনগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নানাপ্রকারে শাসকবর্গের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, সেখানে জনগণের অধিকার কখনও ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একমাত্র পরিমাপক হইল শাসনব্যবস্থার উপর জনতের প্রভাব। শাসনব্যবস্থা যদি জনমত অনুসারে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে সেই শাসনব্যবস্থাকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলা যাইতে পারে। সুতরাং প্রকৃত গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা সক্রিয় ও সচেতন জনমতের উপর নির্ভর করে। সুইস দেশে গণভোট, গণনির্দেশাধিকার প্রভৃতি উপায়ের মাধ্যমে জনমত

সরকারের উপর সর্বদা প্রভাব বিস্তার করে। তাই সুইস দেশকে প্রকৃত গণতন্ত্রের লীলাভূমি বলা হয়।

জনমত গঠন ও প্রকাশের বিভিন্ন উপায়—Different Organs of Public Opinion.

জনমত সাধারণতঃ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এই সুপ্ত জনমতকে জাগ্রত করা আবশ্যক। জনমত একদিনে বা সহসা জাগ্রত হয় না—জনমতের সক্রিয় বহিঃপ্রকাশ সময়সাপেক্ষ। বিভিন্ন উপায়ে এই জনমতকে রাজনৈতিকচেতনা-সম্পন্ন করিয়া সক্রিয় করিয়া তুলিতে হয়। জনমত গঠনে নিম্নলিখিত উপায়গুলি বর্তমানযুগে বিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছে।

১। সংবাদপত্র—The Press.

জনমত গঠনে ও জনমত প্রকাশে সংবাদপত্র আজ এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। জনমত গঠনের প্রথম পদক্ষেপ হইল কোন বিষয় সম্পর্কে জনগণকে প্রকৃত তথ্য সরবরাহ করা যাহাতে এই তথ্যের ভিত্তিতে জনগণ বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া তাহাদের মত গঠন করিতে পারে। সংবাদপত্রগুলি এই তথ্য সরবরাহ করে। আইনসভার তর্ক-বিতর্ক, সরকারী আদেশ-নির্দেশ, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্‌গণের মতামত, সভা-সমিতিগুলিতে প্রদত্ত বক্তৃতা, রাজনৈতিক দলগুলির কর্মতৎপরতা প্রভৃতি বিষয়গুলি সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংবাদপত্রগুলি শুধু নিছক তথ্য সরবরাহ করে না—ইহারা এরূপ প্রণালীতে তথ্যগুলিকে বিন্যাস ও পরিবেশন করে যাহাতে সংবাদপত্র পাঠকবর্গ তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে মত গঠন করিতে পারে। প্রত্যেক সংবাদপত্রেরই একটি বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে। কোন সংবাদপত্র সরকারী নীতির সমর্থক, কোনটি বা বিরোধী, আবার কোনটি বা মধ্যপন্থী। প্রত্যেকটি সংবাদপত্র একই ঘটনার বিষয়বস্তু এরূপ বিভিন্নভাবে পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করে যাহাতে উক্ত সংবাদপত্রের পাঠকবর্গ উক্ত সংবাদপত্রে পরিবেশিত সংবাদের ভিত্তিতে তাহাদের মতামত গঠন করিতে পারে। তাই দেখা যায় যে, এক এক শ্রেণীর পাঠকবর্গের নিকট কোন একটি সংবাদপত্র

বিশেষ জনপ্রিয় হয়। সুতরাং সম্পাদকীয় মন্তব্য ও সংবাদপরিবেশনার মধ্য দিয়া সংবাদপত্রগুলি জনমত গঠন ও প্রভাবিত করে। এতদ্ব্যতীত সংবাদপত্রে চিঠিপত্র প্রকাশ করিবার সুযোগ দান করিয়া সংবাদপত্রগুলি জনমত প্রকাশ ও সংগ্রহ করে। সংবাদপত্রগুলি একদিকে যেরূপ জনমত গঠনে ও প্রকাশে সাহায্য করে অপরদিকে তদ্রূপ জনমত বিকৃত ও সংকীর্ণ করিতে পারে। বিকৃত তথ্য বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ইহারা জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা, সরকার-বিরোধী মনোভাব প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে পারে। বর্তমান যুগে শিক্ষাবিস্তারের ফলে সংবাদপত্র পাঠার্থীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং অধিকাংশ পাঠক সংবাদ পরিবেশনার ভিত্তিতে তাহাদের মত গঠন করে। সুতরাং সংবাদপত্রের দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। এজন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কাম্য হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণও সমভাবে কাম্য। যেহেতু সংবাদপত্রগুলি অজ্ঞ জনসাধারণকে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করিয়া গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রসারে সাহায্য করে, সেইহেতু সংবাদপত্রগুলি যাহাতে স্বল্প মূল্যে দরিদ্র জনসাধারণের নিকট বিক্রীত হয়, দেশের সরকারের সেই ব্যবস্থা করা উচিত।

২। সভা-সমিতি—Platform

জনগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হইল সভা-সমিতির মাধ্যমে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা। এক ব্যক্তি বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মত যতই যুক্তিযুক্ত হউক না কেন তাহা কার্যকর হয় না। সেইজন্য সমবেতভাবে বহুজন সমষ্টি মিলিত হইয়া শোভাযাত্রা, সভা বা সমিতির মাধ্যমে তাহাদের মত প্রকাশ করে এবং এই সঙ্ঘবদ্ধ মত শক্তিশালী জনমতে পরিণত হয়। কোন মতের বিশিষ্ট সমর্থকগণ এইরূপ সভা-সমিতির মাধ্যমে তাঁহাদের মতের সারবত্তা বক্তৃতার সাহায্যে জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া জনমত গঠন করিতে সাহায্য করেন। এরূপ সভা-সমিতি শুধু জনমত গঠন করে না—এইগুলি জনমত প্রকাশও করে। সভা-সমিতিগুলি জনস্বার্থের দাবীতে ও জনস্বার্থ-বিরুদ্ধ নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সেই প্রস্তাব কার্যকর করিবার উপায় হিসাবে আন্দোলন পরিচালনা করে। ইহাতে সুপ্ত জনমত জাগ্রত ও সক্রিয় হইয়া আত্মপ্রকাশ করে।

৩। চলচ্চিত্র—The Cinema

প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পরবর্তী কাল হইতে সবাক্ চলচ্চিত্র জনমত গঠন ও প্রভাবিত করিবার একটি অভিনব উপায় বলিয়া পরিগণিত হয়। সংবাদপত্র শুধু লিখন-পঠনপটু শিক্ষিত জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, কিন্তু অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনগণকে চাক্ষুষ প্রমাণসহ তথ্য সরবরাহ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় হইল চলচ্চিত্র। লোকে যুগপৎ চোখে দেখিয়া ও কানে শুনিয়া চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে এবং এই চলচ্চিত্রলব্ধ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাহাদের মত গঠন করিতে পারে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, চলচ্চিত্র সাধারণতঃ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হইয়া জনসাধারণের চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় দেশের সরকার ইহার অনুসৃত নীতির সমর্থনে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রচারকার্য পরিচালনা করেন। ব্যবসায়িগণও তাঁহাদের মুনাফা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। কিন্তু চলচ্চিত্র জনমত গঠনের একটি বিশিষ্ট উপায়।

৪। বেতার ও দূরদর্শন—The Radio and the Television

চলচ্চিত্রের ন্যায় বেতারও একটি জনমত গঠনকারী প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তবে চলচ্চিত্রের ন্যায় এই উপায়ও জনসাধারণের চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। বেতার কিছু তথ্য সরবরাহ করে এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সমালোচনাও করে। কিন্তু ভারত প্রভৃতি অধিকাংশ দেশে বেতার প্রতিষ্ঠান সরকারের একচেটিয়া আয়ত্তে থাকিবার ফলে সরকার অনুসৃত রাজনীতিই বেতার ভাষণে স্থান পায়। ফলে বেতারে প্রচারিত সংবাদ ও ভাষ্যগুলি নিরপেক্ষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সুতরাং বেতার শিক্ষার মাধ্যমে জনমত গঠনের একটি বিশিষ্ট উপায় হইলেও ইহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। দূরদর্শন যন্ত্র বর্তমানে জনমত গঠনে ও জনমত প্রভাবিত করিতে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। দূর-দূরান্তরের ঘটনা ও বক্তৃতা লোকে আজ ঘরে বসিয়া চাক্ষুষ দেখিতেছে ও শুনিতেছে। মার্কিন দেশে এই দূরদর্শনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি তাঁহার সাপ্তাহিক বাণী জনগণের মধ্যে প্রচার করেন।

৫। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—Educational Institutions

জনমত গঠনে শিক্ষায়তনগুলির প্রভাবও উপেক্ষণীয় নহে। এ সম্পর্কে বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গুরুত্ব আছে। বাল্যে, কৈশোরে ও যৌবনে মানুষ যে শিক্ষালাভ করে, পরবর্তী জীবনে সে শিক্ষার প্রভাব অনতিক্রমণীয় হয়। দেশের যাঁহারা নেতা ও বিভিন্ন মতবাদের স্রষ্টা তাঁহারা প্রায় সকলেই বাল্যের ও যৌবনের শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকেন। এই কারণে একনায়কতন্ত্র পরিচালিত দেশগুলিতে শিক্ষায়তনগুলির ছাত্রদের এই সমস্ত দেশের রাজনীতির মূল সূত্রগুলি সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয় যাহাতে তাহারা পরবর্তী জীবনে উক্ত আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে।

৬। রাজনৈতিক দল—Political Parties

জনমত গঠনে রাজনৈতিক দলগুলির অবদান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণই হইল রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড। কিন্তু জনসাধারণ হইল অসংবদ্ধ ও কোন রাজনৈতিক বিষয়ে স্বকীয় মত গঠনে সাধারণতঃ অসমর্থ। রাজনৈতিক দলগুলি এই অসংবদ্ধ ও রাজনৈতিক ব্যাপারে উদাসীন জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকার্যের মাধ্যমে রাজনৈতিক বিষয়ে কৌতূহল ও সচেতনতা সৃষ্টি করিয়া সুযোগ গ্রহণ করে। রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য হইল রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করা। কিন্তু জনসমর্থন ব্যতীত এই উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব নয়। তাই দলগুলি শোভাযাত্রা, সভা-সমিতি ও প্রচার পুস্তিকার মাধ্যমে উদাসীন ভোটদাতাকে উৎসাহশীল ভোটদাতায় পরিণত করে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলির কর্মতৎপরতা শিক্ষামূলক হইলেও দলগুলি যখন হীন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ করে তখন সামাজিক আবহাওয়া দূষিত হয়।

৭। আইনসভা—Legislatures

আইনসভা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। সরকার গঠনকারী দল ব্যতীতও সরকার সমর্থক ও সরকার-বিরোধী দলগুলি আইন-সভায় তাঁহাদের ভাষণ ও তর্ক-বিতর্কের দ্বারা জনমত জাগ্রত ও সক্রিয় করিতে সাহায্য করে। বিভিন্ন দলের নেতাগণ আইনসভায় তাঁহাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী

ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করেন। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণ এই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত পরিচিত হইয়া তাহাদের তুলনামূলক বিচার করিতে পারে। এইরূপে আইনসভা জনমত গঠনে সাহায্য করে।

আইন ও জনমত (Law and Public Opinion)

বর্তমান যুগে নাগরিকগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা রাষ্ট্র-প্রণীত আইন দ্বারা বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। আধুনিক রাষ্ট্রগুলি আইন প্রণয়ন করিয়া মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, ধর্মসম্বন্ধীয় ও কৃষ্টিগত জীবন-ধারা নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ববিকাশের সহায়তা করিবার অধিকার দাবী করে। বস্তুতঃ, মানবজীবনের এমন কোন অংশ নাই যাহাকে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রপ্রভাবমুক্ত বলা যাইতে পারে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-প্রণীত আইন-কানুন ও বিধিনিষেধগুলি যদি সার্বজনীন ও সর্ববাদিসম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্র-প্রবর্তিত আইনগুলি ব্যক্তিত্ববিকাশের সহায়ক না হইয়া তাহার অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে। এইজন্যই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন এবং গণতন্ত্রের মূল কথা হইল যে, শাসনব্যবস্থা জনমতের সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। জনগণের ভোট দ্বারা নির্বাচিত সদস্য লইয়া গঠিত আইনসভা আইন প্রণয়ন করে এবং আইনসভার প্রধান কর্তব্য হইল জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আইন প্রণয়ন করা। যে আইন জনস্বার্থের প্রতিকূল সে আইন সর্বথা পরিত্যাজ্য। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যদি জনস্বার্থ-বিরোধী আইন প্রণয়ন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা জনগণের আস্থাহীন হইবেন ও পরবর্তী নির্বাচনকালে জনগণের সমর্থনলাভে বঞ্চিত হইবেন। সুতরাং শাসনবিভাগ বা আইন-সভার পক্ষে দীর্ঘকাল পর্যন্ত জনমত-বিরোধী কার্য করা সম্ভব নয়। আইনসভা-প্রণীত আইন যদি দেশের জনমতকে প্রতিফলিত করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সে আইনের বিশেষ কোন মর্যাদা থাকে না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাকে জনমতের বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়। যে শাসনব্যবস্থা জনমত দ্বারা সমর্থিত নয়, তাহা কখনও সুদৃঢ় ও স্থায়ী হইতে পারে না। জনগণের অকুণ্ঠ আনুগত্য ও বশ্যতার অভাবে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। জনগণ সভা-সমিতি, সংবাদপত্র, শোভাযাত্রা, প্রচার-পুস্তিকা প্রভৃতির দ্বারা

আইনসভার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। নিয়মতান্ত্রিক উপায়গুলি ব্যর্থ হইলে জনসাধারণ তাহাদের চরম অস্ত্র 'বিদ্রোহ' দ্বারা শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। সুতরাং আইন-প্রণয়নে জনমতের জয় অবশ্যম্ভাবী।

ভারতের জনমত—Public Opinion in India

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ভারতে প্রকৃত জনমত বলিয়া কার্যতঃ কোন শক্তি ছিল না। জনমত-গঠনের প্রধান অন্তরায় ছিল দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও পরাধীনতা। পরাধীনতার অবসান হইবার ফলে ভারতবাসী ক্রমশঃ আত্ম-সচেতন হইয়া তাহার ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে অবহিত হইতে শিখিতেছে। শিক্ষাবিস্তার ও সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রদানের ফলে তাহাদের জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইতেছে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিও অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। রাজনৈতিক দলগুলি যদি তাহাদের সংকীর্ণ স্বার্থদ্বারা প্ররোচিত না হইয়া জাতীয় স্বার্থদ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, তাহা হইলে অচিরে ভারতে শক্তিশালী ও সক্রিয় জনমত গঠিত হইবে।

বর্তমানে প্রাদেশিকতা ভারতে জনমত-গঠনের একটি প্রধান অন্তরায়রূপে দেখা দিয়াছে। প্রাদেশিকতার মূল কারণ হইল প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার অভাব। প্রকৃত শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত হইলে বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসিগণ এক অখণ্ড জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজেদের ভারতবাসী বলিয়া মনে করিবেন। জনমত যাহাতে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়, সেইজন্য দেশে প্রকৃত শিক্ষার প্রবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দলব্যবস্থা—Party System

রাজনৈতিক দল—Political Party

বর্তমান সভ্য রাষ্ট্রগুলির শাসনব্যবস্থা দলীয় রাজনীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য আধুনিক গণতন্ত্রগুলিকে প্রতিনিধি-পরিচালিত গণতন্ত্র বলা যাইতে পারে। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে সকলে একমতাবলম্বী হইতে পারে না। যে সমস্ত লোক একই নীতিকে কার্যকরী করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, সেই সমস্ত লোক লইয়া

এক-একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। ব্যক্তিবিশেষের মত যতই যুক্তিযুক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন, তাহা এককভাবে কার্যকর হইতে পারে না। সেজন্য এক নীতিতে আস্থাবান্ অধিকসংখ্যক লোক যদি একতাবদ্ধ হইয়া তাহাদের নীতি ও কার্যক্রম সফল করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তাহা হইলে সেই সংঘবদ্ধ শক্তিকে প্রতিরোধ করা যায় না। দল-গঠন ব্যাপারে মানব-চরিত্রের দুইটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল যে, প্রত্যেক মানুষের একটি স্বকীয় মত থাকে এবং সেইজন্য মানুষে মানুষে মতভেদ হয়। কিন্তু এই মতভেদ থাকা সত্ত্বেও মানুষ সামাজিক জীব এবং সংঘবদ্ধভাবে সভ্য জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে মতানৈক্য দূর করিয়া যথাসম্ভব ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পায়। দ্বিতীয়তঃ, একই নীতিতে বিশ্বাসী জনসমূহ সুসংবদ্ধ-ভাবে তাহাদের নির্ধারিত নীতিকে রূপায়িত করিতে প্রয়াস পায়। সুতরাং রাজনৈতিক দল-গঠনের মূলনীতি হইল—একতাই বল। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া তাহাদের নীতি ও কার্যক্রম স্থির করে। জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ ও উৎকর্ষসাধন হইল রাজনৈতিক দলের মুখ্য উদ্দেশ্য। দলীয় স্বার্থসিদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে দল গঠিত হইলে সে দল আদর্শভ্রষ্ট হইয়া কুচক্রী দলে পরিণত হয়। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষসাধন করিবার নিমিত্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে। কিন্তু দলীয় শাসন ঈশ্বরানুমোদিত—এই কথা প্রচার করিয়া কোন রাজনৈতিক দলই বর্তমান যুগে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে না। দলীয় শাসনব্যবস্থার পশ্চাতে জনগণের সমর্থন থাকা চাই।

রাজনৈতিক দল গঠন করিতে নিম্নলিখিত চারিটি উপাদান একান্ত অপরিহার্য :—

১। দলগঠনের প্রাথমিক উপাদান হইল যে, যে-সমস্ত লোক লইয়া রাজনৈতিক দল গঠিত হইবে তাহাদের মধ্যে বিস্তারিত কার্যক্রমে মতভেদ থাকিলেও দলীয় মূলনীতিতে সকলেরই আস্থা ও সমর্থন থাকা চাই। এই মূলগত ঐক্যের অভাবে রাজনৈতিক দল সংঘবদ্ধভাবে কার্য করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্যসাধন করিতে পারে না।

২। রাজনৈতিক দলের প্রধান বল হইল একতা। সুতরাং দলের সদস্যবর্গকে সুসংবদ্ধ হইয়া তাহাদের নির্ধারিত নীতিকে কার্যকরী করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হয়। দলীয় সংগঠন যদি সুসংবদ্ধ না হইয়া শিথিল হয়, তাহা হইলে রাজনৈতিক দল একটি অসংবদ্ধ ও অনিয়ন্ত্রিত জনতায় পর্যবসিত হয়।

৩। রাজনৈতিক দলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহারা সর্বদা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে উহাদের উদ্দেশ্যসাধন করিতে চায়। যে দল বলপ্রয়োগে বা অন্য কোন অসৎ উপায়ে ক্ষমতা অধিকার করিবার প্রয়াস পায়, তাহা কখনই রাজনৈতিক দল পদবাচ্য হইতে পারে না। একমাত্র জনসাধারণের ভোট দ্বারা সমর্থনের উপরই রাজনৈতিক দলের অধিকার নির্ভর করে।

৪। রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্য হইল জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষসাধন করা। একমাত্র এই উদ্দেশ্যের দ্বারা রাজনৈতিক দলগুলিকে অন্যান্য সংগঠন হইতে পৃথক্ করা যায়। যখন কোন দল এই মহান্ আদর্শ-ভ্রষ্ট হইয়া ইহার দলীয় স্বার্থসংরক্ষণে সচেষ্ট হয়, তখন তাহাকে কুচক্রী দল (Faction বা Coteri) বলা হয়।

রাজনৈতিক দলের কার্য (Functions of Political Parties)

প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল একজন নেতা ও একাধিক উপনেতার অধীনে সংঘবদ্ধ হয়। কোন রাজনৈতিক দল যদি বাস্তবক্ষেত্রে ইহার মত কার্যকর করিতে কৃতসংকল্প হয়, তাহা হইলে তাহাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইল দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তাহাদের দলীয় নীতি স্থির করা। জাতীয় সমস্যাগুলি নির্ধারণ করিয়া সেই সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে রাজনৈতিক দলগুলিকে তাহাদের কার্যক্রম স্থির করিতে হয়। জাতীয় সমস্যা ও সমস্যা-সমাধানের নীতি স্থির হইলে দলের কার্য হইল সেই নীতিকে নানা উপায়ে দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা। সংবাদপত্র, সভাসমিতি ও পুস্তিকা প্রকাশ প্রভৃতির মধ্য দিয়া জনমতকে দলের অনুকূল করিয়া গঠন করিবার জন্য প্রত্যেক দলকে প্রচারকার্য চালাইতে হয়। যত অধিক সংখ্যক লোক এই প্রচারকার্যের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া দলীয় নীতিতে আস্থাবান হয়, দলের সমর্থকসংখ্যা ততই বৃদ্ধি পায়। আইনসভার সাধারণ নির্বাচনের

সময় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল সক্রিয় হয়। প্রার্থী নির্বাচন করিয়া সাধারণ নির্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়া রাজনৈতিক দলের আর একটি প্রধান কার্য। নিজ নিজ দলের প্রার্থীর পক্ষে ভোটসংগ্রহের জন্য এই সময় প্রত্যেকটি দলকে জোর প্রচারকার্য চালাইতে হয়। নির্বাচনের পর যে দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দলের নেতৃগণ মন্ত্রিসংসদ্ গঠন করিয়া শাসন-কার্য-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শাসনক্ষমতার অধিকারী হইলে রাজনৈতিক দল ইহার নীতি ও কার্যক্রম অনুসারে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধান করিতে সচেষ্ট থাকে। এইরূপে নির্বাচনের সময় জনসাধারণের সমর্থন লাভের জন্য যে সমস্ত প্রতি-শ্রুতি রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রদত্ত হয়, ক্ষমতালাভের পর সেগুলিকে যথা-সম্ভব রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হয়। যে দলগুলি আইনসভায় অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক আসন দখল করে, তাহারা বিরোধী দল বলিয়া পরিচিত হয়। প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকিলেও বিরোধী দল আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ও প্রশ্নোত্তরের দ্বারা মন্ত্রিমণ্ডলীকে তাঁহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বদা অবহিত রাখে। মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহাদের নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করিয়া খুশিমত শাসনকার্য পরিচালনা করিলে বিরোধী দল জনমত জাগ্রত করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে।

রাজনৈতিক দলগুলিকে ইহাদের মতের পার্থক্য অনুসারে সাধারণতঃ চার ভাগে ভাগ করা হয়—উগ্র বামপন্থী (Extreme Left), বামপন্থী (Left), দক্ষিণপন্থী (Right) ও উগ্র দক্ষিণপন্থী (Extreme Right)। উগ্র বামপন্থী দল সব কিছুরই আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া নূতন পরিবেশের সৃষ্টি করিতে চান। বামপন্থীরা প্রয়োজনমত বর্তমান অবস্থার প্রগতিমূলক পরিবর্তনে বিশ্বাসী। দক্ষিণপন্থীরা কোনরূপ পরিবর্তনের পক্ষপাতী নহেন। বর্তমান অবস্থাকে বজায় রাখা তাঁহারা সমীচীন মনে করেন। উগ্র দক্ষিণপন্থী দল অতিরিক্তমাত্রায় রক্ষণশীল। তাঁহারা অধুনালুপ্ত পুরাতন ব্যবস্থার পক্ষপাতী।

রাজনৈতিক দল সম্পর্কে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা অতীব প্রয়োজন। প্রথমতঃ, রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব ও কার্যকারিতা বহুলাংশে ইহাদের নীতি ও কার্যসূচীর উপর নির্ভর করে। যে দল ইহার নীতি ও কার্যক্রম

সময়োপযোগী করিয়া পরিবর্তন করিতে পারে না, সে দলের পক্ষে স্থায়িত্ব-লাভ করিয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করা সম্ভব নয়। দলের নীতি ও কার্যক্রম যদি জাতীয় অগ্রগতির সমান পর্যায়ে না চলিতে পারে, তাহা হইলে দলীয় শাসনব্যবস্থা অসাড় ও পঙ্গু হইয়া পড়ে। এইজন্য কি রক্ষণশীল, কি উদার-নৈতিক—সব দলেরই নীতি ও কার্যক্রমের পরিবর্তন অপরিহার্য।

দ্বিতীয়তঃ, কোন দেশেই রাজনৈতিক দল শাসনতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত বা সমর্থিত হয় না। সকল দেশেই রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ শাসনতন্ত্র-বহির্ভূত এলাকায় সীমাবদ্ধ (Extra-legal growth)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রটেন প্রভৃতি দেশে যেখানে শাসনব্যবস্থা দলীয় রাজনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে সমস্ত দেশেও রাজনৈতিক দলগুলির শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত কোন অস্তিত্ব নাই—অথচ সরকার-গঠনে এবং সরকারী কার্য-পরিচালনায় দলীয় সংগঠন অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই দলীয় সংগঠন শাসনতন্ত্রের কঠোরতা প্রশমিত করিয়া শাসনতন্ত্রকে বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকর করিতে সহায়তা করিয়াছে। দলীয় সংগঠনের অবর্তমানে মার্কিন শাসনতন্ত্র কর্তৃক সৃষ্ট শাসনব্যবস্থা চরম ক্ষমতা স্বাতন্ত্র্যবিধানের জন্য পঙ্গু হইয়া পড়িত।

আধুনিক কালে কয়েকটি দেশে রাজনৈতিক দল শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও কিছুদিন পূর্বে বাংলা দেশের সংশোধিত শাসনতন্ত্র একটি রাজনৈতিক দলকে (সরকারী দল) স্বীকৃতি দান করিয়া দলীয় প্রাধান্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক দলগুলি মানুষের স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ও স্বাধীনভাবে কার্য করিবার সহজাত অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও বর্তমান যুগে রাজনৈতিক দলগুলি অর্থ নৈতিক সমস্যাসমূহ সম্পর্কে মানুষের মতানৈক্যের ভিত্তির উপর গঠিত হইয়াছে। সাময়িক উত্তেজনা বা লঘু কারণে মানুষের মধ্যে যে মতভেদ হয় তজ্জন্য স্থায়ী কোন দল গঠিত হইতে পারে না। উত্তেজনা প্রশমিত হইলে মতভেদও দূর হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ও ভোগ এবং অন্যান্য অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের ধারণার মধ্যে যে মূলগত পার্থক্য দেখা যায়, রাজনৈতিক দলগুলি প্রধানতঃ এই অর্থ-নৈতিক সমস্যা-সম্পর্কিত মূলগত পার্থক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক সময়

আবার ধর্মমতের পার্থক্যের জন্য সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক দল বিরল, কিন্তু ভারত প্রভৃতি প্রতীচ্য দেশে রাজনৈতিক শিক্ষার অভাবে এখনও পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক দল দেখিতে পাওয়া যায়।

দলীয় শাসনের গুণ—Merits of Party System

বর্তমান যুগে দেশের শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। রাজনৈতিক ব্যাপারে সাধারণতঃ জনসাধারণের কোন সুস্পষ্ট অভিমত থাকে না বা থাকিলেও সেই অভিমত কার্যকর করিতে পারে না। রাজনৈতিক দল এই অসংবদ্ধ জনমতকে সুসংবদ্ধভাবে গঠন করিয়া ইহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলে। এই উদ্দেশ্যে দলগুলি নানা প্রকারে প্রচারকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। রাজনৈতিক দলগুলি দেশের বিভিন্ন সমস্যা ও তাহাদের সমাধানের প্রস্তাব জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া জনসাধারণকে ঐ সমস্ত বিষয়ে সচেতন করিবার প্রয়াস পায়। প্রচারকার্যের মধ্য দিয়া দেশবাসী ঐ সমস্ত জাতীয় সমস্যা ও তাহাদের সমাধান প্রস্তাবগুলির সহিত পরিচিত হয়। ফলে, সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে জনসাধারণের উৎসাহ জন্মে ও তাহাদের রাজনৈতিক অধিকার ও কর্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। সুতরাং রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপের মধ্য দিয়া জনশিক্ষা বিস্তারলাভ করে।

সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দলের অবর্তমানে শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসংসদ গঠন করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং দলের নীতি ও নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি যথাসম্ভব সফল করিতে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু আইনসভার সদস্যগণ যদি তাঁহাদের দলের নেতৃগণ কর্তৃক গঠিত মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যে সহায়তা না করিয়া তাঁহাদের খুশিমত ভোট দেন, তাহা হইলে মন্ত্রিমণ্ডলীর শাসন পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। দলের সদস্যগণের নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার অভাবে শাসনকর্তৃপক্ষ স্থায়িভাবে কোন শাসননীতি প্রবর্তন করিতে পারে না।

দলের সমর্থন ব্যতীত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থায়িত্ব লাভ করিয়া দলীয় নীতি ও কার্যক্রম সফল করিতে পারে না।

দলীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন না হইলে শাসনকার্যের কোনরূপ উৎকর্ষ-সাধন হওয়া সম্ভবপর হইত না। ক্ষমতার অধিকারী দল নিজ ইচ্ছানুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া যাইত। একমাত্র বলপ্রয়োগ পদ্ধতি ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে ক্ষমতার অধিকারী দলকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব হইত না। বর্তমান যুগে দলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল শাসনকার্য পরিচালনা করিবার সুযোগ পায় এবং এই পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া শাসনকার্যের উৎকর্ষ সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসনকার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেও সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের বিরুদ্ধে সমালোচনার ভয়ে তাহারা জনস্বার্থ-বিরোধী কোন কাজ করিতে সাহসী হয় না। আইনসভার বিরুদ্ধ দলগুলির সদাজাগ্রত দৃষ্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে তাহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত রাখে। এইরূপে দলীয় শাসনব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বৈরাচারের প্রতিবন্ধকতা করে ও দলীয় প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া শাসনকার্যের উৎকর্ষসাধনে সহায়তা করে।

দলীয় শাসনব্যবস্থার আর একটি গুণ হইল যে, যে-সমস্ত দেশে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান-নীতি শাসন-পরিচালনাক্ষেত্রে কার্যকরী করা হইয়াছে, সে সমস্ত দেশে রাজনৈতিক দলের মধ্য দিয়াই সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। এই যোগসূত্রের অভাবে শাসনব্যবস্থায় অচল পরিস্থিতি উদ্ভবের সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু দলীয় শাসনব্যবস্থার ফলে শাসন-কর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে যোগসূত্র ও সহযোগিতা স্থাপিত হইয়া শাসনব্যবস্থা অব্যাহত আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসন-কর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি এবং কংগ্রেস সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল একই রাজনৈতিক দলভুক্ত বলিয়া ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান সত্ত্বেও তাঁহার একযোগে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন।

দলীয় শাসনের দোষ—Demerits

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল অপরিহার্য বিবেচিত হইলেও দলীয় শাসনব্যবস্থাকে ত্রুটিহীন বলা যায় না। দলীয় শাসনব্যবস্থা আদর্শচ্যুত

হইলেও শাসনকার্য পরিচালনা ব্যাপারে অনেক গলদ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজনৈতিক দল মানুষের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দলাদলির সূত্রপাত করে। দলের প্রাধান্য বজায় রাখিবার নিমিত্ত অনেক সময় ব্যক্তিত্ব উপেক্ষিত হয়। দলীয় সংহতি অব্যাহত রাখিবার জন্য কোনরূপ মতানৈক্য বরদাস্ত করা হয় না। দলীয় নেতার মাধ্যমে যে-দলীয় নীতি নির্ধারিত হয়, বিবেকবুদ্ধি-বিরোধী হইলেও প্রত্যেক সদস্যকে সেই নীতি মানিয়া চলিতে হয়। ফলে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করা বা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। কোন কোন দেশে দলীয় বিধিনিষেধগুলি এত কঠোরভাবে কার্যকর করা হয় যে, দলের সমর্থকগণ দলের ক্রীড়নকে পর্যবসিত হয়। সুতরাং দলীয় শাসনব্যবস্থা ব্যক্তিত্ববিকাশের অন্তরায় সৃষ্টি করে।

দলীয় অনুশাসনের প্রতি এই অন্ধ ও অখণ্ড আনুগত্যের ফলে দলের সমর্থকগণ দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভুলিয়া দলীয় স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হয়। জাতীয় সমস্যাগুলিকে নিরপেক্ষভাবে জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়া বিবেচনা না করিয়া দলীয় ক্ষুদ্র স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয়। আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবার জন্য প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ভোটসংগ্রহ ব্যাপারে তৎপর হয়। আর এই ভোটসংগ্রহ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণতঃ যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করে তাহাতে দেশের নৈতিক আবহাওয়ার ও নৈতিক মানের অবনতি ঘটে। বিভিন্ন দলের বিশিষ্ট নেতৃগণ তাঁহাদের সামাজিক পদমর্যাদা ভুলিয়া পরস্পরের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ চালনা করিয়া সমাজে এরূপ দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন যাহাতে জনশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। দুর্নীতি, মিথ্যাভাষণ ও মিথ্যাপ্রচার, কলহ-দ্বন্দ্ব প্রভৃতি নানাবিধ দোষ সমাজদেহে দুষ্ট ব্রণের মত আবির্ভূত হয়।

নির্বাচনদ্বন্দ্বে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দল রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয় ও মন্ত্রিসংসদ্ গঠন করে। দলীয় আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকারী চাকুরী, সরকারী সাহায্য ও সম্মান যোগ্যতা বিচার না করিয়া দলের সমর্থনকারীদের মধ্যে অকুণ্ঠভাবে বিতরণ করিয়া দলের সংহতি বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। ফলে, যোগ্য ব্যক্তি অপর দলভুক্ত বলিয়া সরকারী কার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারে না। ইহাতে

শাসনব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে। অপরপক্ষে, যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতালাভ করিতে পারে না, সে দল বিরোধী দল বলিয়া পরিচিত হয় ও সর্বদা সরকারী কার্যের ভাল-মন্দ বিবেচনা না করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ছিদ্রান্বেষণ করে ও সর্বপ্রকারে সরকারী কার্যে অন্তরায় সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট থাকে। এইরূপ আত্মকলহের ফলে জাতীয় প্রগতিমূলক কার্যসমূহ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

দলীয় শাসনের আর একটি প্রধান ত্রুটি হইল যে, দলের নেতৃত্ব যখন জনকয়েক স্বার্থপর কুচক্রী লোকের হস্তগত হয়, তখন এই কুচক্রী দল নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থসাধনের নিমিত্ত জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিতে দ্বিধাবোধ করে না।

উপসংহার—(Cnoclusion)

দলব্যবস্থার উপরি-উক্ত দোষগুলি থাকার জন্য অনেকে দলীয় শাসনের অবসান ঘটাইতে ইচ্ছা করেন। দলব্যবস্থার নিষ্পেষণে ব্যক্তিগত ইচ্ছা অসাড় ও মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছে। দলব্যবস্থা বিলুপ্ত হইলে ব্যক্তিগত ইচ্ছা আত্ম-প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়া ব্যক্তিত্ববিকাশে সহায়তা করিবে। কিন্তু এখানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দলব্যবস্থার অবর্তমানে ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অভিমত এককভাবে কার্যকরী করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত ইচ্ছা সমষ্টিগতভাবে দলব্যবস্থার মধ্য দিয়া কার্যকর হয়। অপরপক্ষে দলব্যবস্থার অবর্তমানে কোন শাসনব্যবস্থারই পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব নয়। শাসক-গোষ্ঠীকে পরিবর্তন করিতে হইলে একমাত্র বল-প্রয়োগ-পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পরিবর্তন করা যায় না। সুতরাং ব্যক্তিগত অভিমত কার্যকর করিবার নিমিত্ত ও শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য দলব্যবস্থা অপরিহার্য বলিয়া গণ্য হয়। সত্য বটে যে, দলীয় শাসনের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, কিন্তু সেজন্য দলব্যবস্থার অবসান না ঘটাইয়া ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি যাহাতে দূর করা যায় সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

নাগরিকগণকে লইয়াই রাজনৈতিক দলগুলি গঠিত হয়। নাগরিকগণ যদি প্রকৃত শিক্ষিত ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইয়া জাতীয় স্বার্থকে বড় করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দলব্যবস্থায় কোনরূপ সংকীর্ণতা প্রবেশ করিতে পারে না। দলের নেতার প্রতি দলের সমর্থকগণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকা একান্ত

আবশ্যক ; কিন্তু দলের নেতা যদি বিপথগামী হন ও জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থকে উচ্চতর স্থান দেন, তাহা হইলে এরূপ নেতাকে প্রতিরোধ করা প্রত্যেক লোকেরই নৈতিক কর্তব্য। দলব্যবস্থায় সাফল্য অনেক পরিমাণে নেতৃত্ব-নির্বাচনের উপর নির্ভর করে। দলপতি নির্বাচন করিলে জনগণের কর্তব্য শেষ হয় না। দলপতির কার্যক্রম ও কার্যপদ্ধতির উপরে জনগণের সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক। নতুবা দলপতি স্বৈরাচারী হইয়া পড়িতে পারেন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, জনসাধারণের বিচারবুদ্ধি কম। তাহারা তাহাদের নেতার দ্বারা পরিচালিত হয়। নেতা যাহাতে স্বীয় স্বার্থ-সাধনের নিমিত্ত জনগণকে বিপথে পরিচালিত করিতে না পারেন সেজন্য শিক্ষিত, সচেতন ও সক্রিয় জনমতই চাই। জনমত যদি হিতাহিতবোধসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে দলব্যবস্থার সমস্ত দুর্বলতা দূর হইয়া গণতন্ত্রকে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করিতে পারে।

এক রাজনৈতিক দল—One Party

বিগত প্রথম বিশ্ব সমরের পরবর্তীকালে ইয়ুরোপের কয়েকটি দেশে একদলীয় সরকারের সূত্রপাত হয়। রুশ দেশে প্রথম সাম্যবাদী দল কর্তৃক পরিচালিত একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্যবাদী দল বলপ্রয়োগ দ্বারা অন্য দলগুলিকে উৎসাদিত করিয়া দলীয় এক নায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে। রুশ দেশের বর্তমান শাসনতন্ত্রেও সাম্যবাদী ব্যতীত অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। রুশ দেশের পর জার্মানি ও ইতালীতে যথাক্রমে নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী দলের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এক-দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। নাৎসী দল ও ফ্যাসিবাদী দল সাম্যবাদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে বলপ্রয়োগ দ্বারা সমূলে উৎপাটিত করে। ইংলণ্ডে যুদ্ধের সময় যে জাতীয় সরকার গঠিত হয়, তাহাকে কার্যতঃ এক-দলীয় সরকার বলা যাইতে পারে। জাতীয় বিপদের সময় ইংলণ্ডের বিভিন্ন দল তাহাদের দলগত বিভেদ বিসর্জন দিয়া জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণে যত্নবান্ হয়। সুতরাং রাশিয়া, জার্মানি প্রভৃতি দেশের এক-দলীয় সরকার ও ইংলণ্ডের জাতীয় সরকারকে এক পর্যায়ভুক্ত করা সমীচীন নয়।

'এক-দলীয় সরকার' ব্যবস্থার সমর্থকগণ বলেন যে, কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করিয়া জাতিকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিলে জাতীয় শক্তি ও সংহতির অপচয় ঘটে। জনসাধারণের বিচারবুদ্ধি সাধারণতঃ কম। জনসাধারণকে প্রচারকার্যের দ্বারা বিভ্রান্ত করিয়া বিভিন্ন দলের সমর্থন লাভ করা হয়। ইহাতে জাতীয় শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। কাজেই শুধুমাত্র যুদ্ধ প্রভৃতি আপৎকালে জাতীয় সরকার গঠন না করিয়া সর্ব কালের জন্য এক-দলীয় সরকার গঠন করিলে জাতীয় শক্তির কোনরূপ অপচয় ঘটে না। জাতির সমগ্র সদস্যই যদি একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তাহা হইলে জাতীয় শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এক দলীয়, দ্বি-দলীয় বা বহু দলীয় সকল শাসনব্যবস্থায়ই জনসাধারণ দলের নেতৃগণ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। দলের নির্দেশ জনগণ অন্ধভাবেই পালন করিয়া থাকে। কোনরূপ দলীয় ব্যবস্থায়ই ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। সুতরাং কৃত্রিম উপায়ে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া নানারূপ দল গঠন করিবার পরিবর্তে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকিলে জাতীয় ঐক্য অধিকতররূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

এক-দলীয় সরকারের সপক্ষে যতই যুক্তির অবতারণা করা হউক না কেন, এক-দলীয় সরকার যতদিন পর্যন্ত জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না হইবে ততদিন এই সরকার স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে না। জার্মানি ও ইতালিতে এক-দলীয় সরকারের অবসান ঘটিয়াছে। কিন্তু রুশ দেশে এক-দলীয় সরকার আজও সুপ্রতিষ্ঠিত ও ক্রমশঃই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। তাহার কারণ রুশ দেশের এক-দলীয় সরকার বলপ্রয়োগ-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও নানাবিষয়ে দেশের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া জনসংখ্যার বিশাল এক অংশের আস্থাভাজন হইতে সমর্থ হইয়াছে। রুশ দেশের এক-দলীয় সরকারের ভবিষ্যৎ ইহার জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট গঠনমূলক কার্যের উপর নির্ভর করে।

এক-দলীয় শাসন ও গণতান্ত্রিক শাসন পরস্পর-বিরোধী। গণতান্ত্রিক শাসন জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ইচ্ছা ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। জনগণ বিভিন্ন দলের মাধ্যমে তাহাদের অভিমত প্রকাশ সাহায্যে শাসক শ্রেণী নির্বাচন করে। গণতন্ত্রে আলাপ-আলোচনা ও মতবিরোধ নিষ্পত্তির পথ উন্মুক্ত থাকে। ভোটদাতাগণ নিজেদের পছন্দমত প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া তাহাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বলবৎ করিতে পারে। কিন্তু এক-দলীয়

শাসনব্যবস্থায় ভোটদাতার ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করিবার ক্ষেত্র নাই বলিলেও চলে। যে-ব্যবস্থায় ক্ষমতা একটি মাত্র দলের হস্তে কেন্দ্রীভূত, সেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। একটি মাত্র দলের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে আলাপ-আলোচনা দ্বারা বিরোধ-নিষ্পত্তির কোন ক্ষেত্র নাই। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমতার একচেটিয়া অধিকারী দলের স্তাবক হইতে হয় অথবা তাহার নিজস্ব মতামত বিসর্জন দিয়া আধ্যাত্মিক মৃত্যুবরণ করিতে হয়।

দুই দল ও বহু-দল—Bi-Party System and Multi-Party System.

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। অনেকে মনে করেন যে, শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য বহু দল অপেক্ষা দুইটি দল দেশের স্বার্থের পক্ষে অধিকতর অনুকূল। ইংলণ্ডে বহুদিন হইতে দুইটি প্রধান দলের দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও দুইটি প্রধান দল দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় ব্যবস্থার সপক্ষে ও বিপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করা হইয়া থাকে।

দুই দলের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি—Arguments for and against Two-Party System.

দেশে দুইটি রাজনৈতিক দল থাকিলে যে-দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দল ক্ষমতার অধিকারী হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে। ইহাতে রাষ্ট্রীয় সরকার স্থায়িত্বলাভ করিয়া নির্দিষ্ট নীতি অনুসারে ইহাদের কার্যক্রম রূপায়িত করিতে সক্ষম হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল স্থায়িত্বলাভ করিলেও ইহারা জনমত-বিরোধী কার্য করিতে সাহস পায় না। কারণ, বিরোধী দলের সদাজাগ্রত দৃষ্টি ইহাদের কার্যকলাপের উপর নিবদ্ধ থাকে। শাসনকার্যে কোনপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিলে বিরোধী দল সমালোচনা দ্বারা জনমতকে ইহাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতে পারে। ফলে পরবর্তী নির্বাচনকালে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নির্বাচন-দ্বন্দ্বে পরাজিত হইয়া ক্ষমতাচ্যুত হইবার

সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়তঃ, দুইটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হওয়ার ফলে শাসনকার্যও উৎকর্ষ লাভ করে। তৃতীয়তঃ, দুইটি দল বর্তমান থাকিলে ভোটদাতাগণের পক্ষে প্রার্থী নির্বাচন করাও অধিকার সহজ ও সরল হয়। ভোটদাতাগণের মাত্র দুইটি নীতির সমর্থক দুইজন প্রার্থীর মধ্যে একজনকে নির্বাচন করিতে হয়। সুতরাং তাহারা সহজেই প্রার্থী স্থির করিতে পারে।

দেশে দুইটি মাত্র দল থাকিবার বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ইহাতে জনমতের বিভিন্ন দিক সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। দেশে যদি উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল দুইটি মাত্র দল থাকে, তাহা হইলে মধ্যপন্থী কোন লোকের পক্ষে উল্লিখিত দুইটি দলের কোন দলেই বিবেকবুদ্ধিসম্মতভাবে যোগদান করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, দেশের সমস্যাগুলিও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। তৃতীয়তঃ, দুইটি মাত্র দল থাকিলে দেশের শাসকগোষ্ঠীও স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনলাভ করিয়া মন্ত্রিসংসদ্ স্থায়িত্বলাভ করে। ক্ষমতাচ্যুত হইবার আশংকা কম থাকিলে মন্ত্রিসংসদ্ তাহাদের খুশিমত শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া সর্ববিষয়ে একাধিপত্য-স্থাপনে প্রয়াস পায়। ফলে, মন্ত্রিসংসদ্ সর্বেসর্বা হইয়া উঠে ও আইনসভার প্রাধান্য খর্ব হয়। গ্রেট বৃটেনের শাসনব্যবস্থায় এই প্রকারে মন্ত্রিসংসদ্ আইন-প্রণয়নে, রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে, সর্ববিষয়েই শাসন-পরিচালনায় একাধিপত্য বিস্তার করিয়া আইনসভার সার্বভৌমত্বের হানি করিয়াছে। চতুর্থতঃ, দুই-দল ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহাতে কোন ব্যক্তির স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের ক্ষমতা থাকে না। ভোটদাতা নিজের বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া দলের অনুশাসন অনুসারে ভোট দিতে বাধ্য হয়। পঞ্চমতঃ, দুইটি মাত্র রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা দ্বারা যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সেই নির্বাচনের ফলে প্রকৃত জনমতকে কতদূর প্রতিফলিত করিতে পারে সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকিতে পারে।

বহু-দলের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি—Arguments for and against Multiple Party System.

দুই-দল ব্যবস্থার উল্লিখিত গলদ থাকার জন্য অনেকে বহু-দলের অস্তিত্ব

সমর্থন করেন। বহু-দল থাকিলে জনমত এই বিভিন্ন দলের মাধ্যমে প্রকাশিত হইতে পারে ও আইনসভাও অধিকতর প্রতিনিধিমূলক হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, জনগণ তাহাদের স্বাধীন অভিমত ব্যক্ত করিবার অধিকতর সুযোগ লাভ করে। এই ব্যবস্থা দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের একাধিপত্য-বিস্তার প্রতিরোধ করা যায়। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন দল আলাপ-আলোচনার দ্বারা সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে। ফলে, আইন-প্রণয়ন-কার্য ও শাসনকার্য বহু-দলের সমর্থনলাভ করিয়া ব্যাপক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। চতুর্থতঃ, বহু-দল ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু দলও শাসনকার্য-পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়। মন্ত্রিসংসদ্ একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া বহু-দলের সম্মিলিত সমর্থনপুষ্ট বলিয়া স্বৈরাচারী হইতে পারে না। পঞ্চমতঃ, এক-দল দ্বারা গঠিত মন্ত্রিসংসদ্ অপেক্ষা বহু-দল-সমর্থিত মন্ত্রিসংসদ্ দেশের জনমতকে অধিকতর প্রতিফলিত করিতে পারে এবং জাতীয় স্বার্থকে অধিকতর সংরক্ষিত করিতে সক্ষম হয়।

কিন্তু বহু-দলের বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে, এই ব্যবস্থায় শক্তিশালী ও স্থায়ী মন্ত্রিসংসদ্ গঠন সম্ভব নয়। দুই বা ততোধিক দলের সমর্থনে যে মন্ত্রিসংসদ্ গঠিত হয়, দলগুলির মধ্যে সামান্য মতানৈক্য হইলেই ঐ মন্ত্রিসংসদ্ ভাঙ্গিয়া পড়ে। আইনসভায় কোন দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকার ফলে মন্ত্রিসংসদ্‌কে দলগুলির সম্মিলিত সমর্থনের উপর নির্ভর করিতে হয়। মন্ত্রি-গণের মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটিলে এক বা একাধিক দলের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইয়া মন্ত্রিসংসদের পতন অনিবার্য হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিসংসদ্ যে শুধু অস্থায়ী হয় তাহা নয়, উহার দুর্বলতাও প্রকাশ পায়। মন্ত্রিসংসদের কোন সদস্যই অন্যনিরপেক্ষ হইয়া একক ও স্বাধীনভাবে তাঁহার নিজের বিভাগের কার্য পরিচালনা করিতে পারেন না। সর্বদাই আলাপ-আলোচনা দ্বারা অন্য দলের সদস্যদের সম্মতির উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয়। ফলে, কোন নীতি কার্যকরী করিতে গেলে বহু সময় অতিবাহিত হয়। তৃতীয়তঃ, কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ইহাতে দেশের সুশাসন ও হিতকর কোন কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। চতুর্থতঃ, স্বল্প সময়ের ব্যবধানে মন্ত্রিসংসদ্ পুনর্গঠিত হয় বলিয়া মন্ত্রিসংসদের সদস্য-

নির্বাচনে অনেক সময় দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। ফরাসী দেশে এই ব্যবস্থার ফলে সে দেশের মন্ত্রিসভা বহুল পরিমাণে দুর্বল হইরা পড়িয়াছিল। কি আভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপারে, কি বৈদেশিক ব্যাপারে কোন দীর্ঘমেয়াদী নীতি বা কার্যক্রম সেখানে স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে না। পঞ্চমতঃ, বহু-দল থাকার জন্য জনসাধারণের পক্ষে প্রার্থী নির্বাচন করাও একটা সমস্যারূপে দেখা দেয়। বিভিন্ন দল তাহাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপিত করিয়া ভোটদাতার কাছে একটা সমস্যার সৃষ্টি করে।

এই সমস্ত কারণে দুই-দল ব্যবস্থার ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ লেখক বহু-দল অপেক্ষা দুই-দল ব্যবস্থাকে শাসনকার্যের অধিকতর অনুকূল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। দুই-দল ব্যবস্থার জন্যই গ্রেট বৃটেনের শাসনব্যবস্থা স্থায়িত্ব ও দক্ষতা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

দল-ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করিবার উপায়—Means of removing the defects of the Party System.

রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন মতাবলম্বী নাগরিক সমষ্টি লইয়া গঠিত হয়। দল-ব্যবস্থার যে অসুবিধাগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা বহুলাংশে নাগরিক জীবনের অসম্পূর্ণতার জন্য দেখা যায়। দল-ব্যবস্থার কুফলগুলি দুই প্রকারে দূর করা সম্ভব। প্রথমতঃ, শাসনব্যবস্থা এরূপভাবে গঠিত হইবে যাহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষ শাসন-ব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিতে না পারে। জনসাধারণের অভিমতকে গুরুত্ব প্রদান করিবার ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক। দেশের শাসনতন্ত্রে যদি গণভোট, গণপ্রস্তাব ও প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিবার অধিকার থাকে, তাহা হইলে দলীয় এক-নায়কত্বের পরিবর্তে সার্বজনীন সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। জনগণ যতই অধিকতর সক্রিয়ভাবে শাসন-ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইবে, শাসনব্যবস্থা হইতে সেই পরিমাণে দলীয় একনায়কত্বের ত্রুটিগুলি দূরীভূত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী সাহায্য, সম্মান ও সরকারী চাকুরী বিতরণ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তাহাদের সমর্থকগণকে বশীভূত রাখে। ইহাতে অনেক সময় নানাবিধ দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। এই ত্রুটি দূরীকরণের জন্য শাসনতন্ত্রে এরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত যে, একমাত্র যোগ্যতা ব্যতীত অন্য

কোন কারণে কোন ব্যক্তি সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। একটি স্বাধীন ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সংসদের দ্বারা সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ব্যবস্থা থাকিবে। তৃতীয়তঃ, শাসকবর্গ যাহাতে নিজেদের খুশিমত শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে সমর্থ না হয় সেজন্য দেশের সংবিধান যথাসম্ভব অ-নমনীয় রাখিতে হইবে। শাসনতান্ত্রিক আইনগুলি যদি সাধারণ আইন-গুলির মত সহজে পরিবর্তনশীল হয়, তাহা হইলে শাসকগোষ্ঠী তাহাদের সুবিধা অনুসারে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধন করিয়া দলীয় একনায়কত্ব স্থায়ী করিতে পারে। জনগণের মৌলিক অধিকারগুলিও লিখিত ও অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রদ্বারা সুরক্ষিত করা একান্ত আবশ্যক। চতুর্থতঃ, শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং সরকারের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ উচ্চ-বিচারালয় বর্তমানে শাসনব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। বিচারপতিগণ যাহাতে দল-নিরপেক্ষ হইয়া বিচারকার্যের পবিত্রতা ও ন্যায়পরায়ণতা রক্ষা করিতে পারেন সেজন্য তাঁহাদের নিয়োগ, বেতন ও পদচ্যুতির বিধিগুলি সুনির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন। পঞ্চমতঃ, সরকারের স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ যাহাতে দলনিরপেক্ষভাবে তাহাদের দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন করিতে পারে সেজন্য শাসনতন্ত্রে তাহাদের নিয়োগ, বেতন ও পদচ্যুতির বিধিগুলি সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। কোনরূপ প্রলোভন বা ভয়ের দ্বারা তাহারা যাহাতে কর্তব্যচ্যুত না হয় সেজন্য শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ষষ্ঠতঃ, সংখ্যালঘু দলগুলির অধিকার যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্যও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায় যে, নাগরিকগণ যদি সৎশিক্ষা পাইয়া প্রকৃত রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহারা সাম্প্রদায়িক বা দলগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠিয়া সব সময়ে জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণে যত্নবান্ হয়। শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি কখনই দলীয় প্রচারকার্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া সমষ্টিগত স্বার্থের হানি করিতে পারে না। দলগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষসাধন—এই কথাটি সম্বন্ধে যদি দলের সমর্থকগণ অবহিত থাকেন, তাহা হইলে রাজনৈতিক দলগুলি রাষ্ট্রীয় জীবনকে নানাদিক দিয়া সমৃদ্ধ করিতে পারে। প্রকৃত শিক্ষাবিস্তার দ্বারা জাতীয় জীবনের এই ত্রুটিগুলি দূর করা সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হয়।

দলবিহীন শাসন—Non-Party Government

দল-প্রথার কুফল দেখিয়া অনেক লেখক দল-প্রথার বিলোপসাধন করিয়া দলশূন্য স্বাধীন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, দলীয় শাসনের কোন বিকল্প ব্যবস্থা সম্ভব কি? মানুষ হিতাহিতবোধসম্পন্ন চিন্তাশীল জীব। যতদিন মানুষের স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি থাকিবে, ততদিন মানুষে মানুষে মতভেদ থাকিবে ও এই বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে বিভিন্ন দল গঠিত হইবে। সুতরাং মানব-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলের অস্তিত্বকে স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী বলা যাইতে পারে। রাজনৈতিক জীবনেও রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান মানুষের এই স্বাধীন চিন্তাশক্তির এক অভিব্যক্তি মাত্র। বলপূর্বক এই স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে বিনাশ করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দলের অভ্যুত্থান যদি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে দলীয় শাসনের বিকল্প হিসাবে অনেকে বহু দলের সহযোগিতায় (Coalition) শাসনব্যবস্থা সংগঠনের সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু বহুদলের সহযোগিতায় যে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তাহা কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। ফরাসী দেশের শাসনব্যবস্থা এই কারণে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, দলীয় শাসনের বিকল্প হিসাবে এক-দলীয় শাসনের (One-Party Government) সপক্ষে অনেকে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু এক-দলীয় শাসন অনেক বিষয়ে শ্রেয় হইলেও এই ব্যবস্থা যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার অন্তরায় ইহা অনস্বীকার্য। তৃতীয়তঃ, দলীয় শাসনের অবসান ঘটাইয়া প্রাচীন কালের ব্যক্তিগত শাসন (Monarchy) প্রবর্তন করিতে পারা যায়। কিন্তু বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে ব্যক্তিগত শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, দলীয় শাসনের বিকল্প কোন ব্যবস্থা বর্তমানে গণতন্ত্রে সম্ভব নয়। বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে যথাসম্ভব মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করা কাম্য। দেশে যদি শিক্ষিত ও সচেতন জনমত গঠিত হয়, তাহা হইলে দলীয় শাসনের কুফল রাজনৈতিক জীবনকে বিষাক্ত করিতে পারে না।

গণতন্ত্রে দলব্যবস্থার গুরুত্ব—Importance of the Party system in Democracy.

গণতন্ত্র হইল জনগণের শাসন অর্থাৎ যে শাসনব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত জনমত অনুসারে পরিচালিত হয় এবং শাসকগোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত জনগণের নিকট তাঁহাদের অনুসৃত নীতি ও কার্যের জন্য দায়ী থাকেন। কিন্তু প্রত্যেক দেশেই জনগণ বলিতে একটা অনির্দিষ্ট, অসংবদ্ধ ও বিভিন্ন মতাবলম্বী জনসংখ্যা বুঝায়, যে জনসংখ্যা ইহার অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও ঔদাসীন্যের জন্য সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের প্রধান কার্য হইল এই অজ্ঞ ও অসংবদ্ধ জনগণকে সুসংবদ্ধ করিয়া সভা-সমিতি, প্রচার-পত্রিকা প্রভৃতির সাহায্যে তাহাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগরিত করা। এজন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে জনগণের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন। সুতরাং রাজনৈতিক দল ব্যতীত জনমত গঠিত হইতে পারে না। রাজনৈতিক দলের কর্মতৎপরতায় জনমত জাগ্রত হইলে প্রত্যেকটি দল ইহার কর্মসূচী জনগণের নিকট উপস্থাপিত করে এবং জনগণ তাহাদের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া কোন একটি দলের সদস্যভুক্ত হয়। প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দলের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য কোন অসাধু উপায় বা বলপ্রয়োগ নীতি প্রয়োগ করা হয় না। জনগণ তাহাদের নিজ ইচ্ছানুসারে ও বিবেকসম্মতভাবে কোন দলভুক্ত হয়।

রাজনৈতিক দল ব্যতীত কোন শাসনব্যবস্থাই স্থায়ী হইতে পারে না। বর্তমান যুগে ঐশ্বরিক উৎপত্তির (Divine Origin) দোহাই দিয়া কোন শাসক বা শাসকগোষ্ঠী দীর্ঘদিন শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে না। স্থায়ী শাসনব্যবস্থা গঠন করিতে হইলে এই শাসনব্যবস্থার পশ্চাতে শক্তিশালী সমর্থন থাকা চাই।

স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রে বা স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রে পশুবলের সাহায্যে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়—এরূপ শাসনব্যবস্থায় কোনরূপ নৈতিক সমর্থন থাকে না। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য হইল যে, পশুবলের সাহায্যে কোন শাসনব্যবস্থাকেই চিরস্থায়ী করা যায় না। যে-কোন শাসনব্যবস্থা হউক-না-কেন, ইহার একটা নৈতিক সমর্থন থাকা চাই। আর এই নৈতিক সমর্থন হইল জনমত অর্থাৎ যে শাসনব্যবস্থা জনমতের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত এবং জনমত অনুসারে পরিচালিত হয়, একমাত্র সেই শাসনব্যবস্থাই স্থায়িত্ব

লাভ করিতে পারে। সুতরাং স্থায়ী শাসনব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি হইল জনমত এবং রাজনৈতিক দলগুলি এই জনমত গঠন করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমত অনুসারে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল ইহার গঠনমূলক সমালোচনার দ্বারা সরকার গঠনকারী দলকে সর্বদা জনস্বার্থ সম্পর্কে অবহিত রাখে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল জনমত অনুসারে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা না করিলে পরবর্তী নির্বাচনে ইহা জনসমর্থন হইতে বঞ্চিত হইয়া সংখ্যালঘিষ্ঠ দলে পরিণত হইবে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করে। এইরূপে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে গঠনমূলক প্রতিযোগিতার ফলে শাসনব্যবস্থায় উৎকর্ষ সাধিত হয়। এমন কি একনায়কতন্ত্রেও দলীয় সমর্থন থাকা চাই।

দল-ব্যবস্থার অবর্তমানে ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অভিমত এককভাবে কার্যকর করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত ইচ্ছা সমষ্টিগতভাবে দল-ব্যবস্থার মধ্য দিয়া কার্যকর হয়। অপর পক্ষে দল-ব্যবস্থার অবর্তমানে কোন শাসনব্যবস্থারই পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব নয়। শাসকগোষ্ঠীকে পরিবর্তন করিতে হইলে একমাত্র বলপ্রয়োগ পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পরিবর্তন করা যায় না। সুতরাং ব্যক্তিগত ইচ্ছা কার্যকর করিবার নিমিত্ত ও মধ্যে মধ্যে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য দল-ব্যবস্থা অপরিহার্য বলিয়া গণ্য হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার
(Adult Franchise)

প্রাপ্তবয়স্ক—Adult

আধুনিক যুগে গণতন্ত্র বলিতে পরোক্ষ গণতন্ত্র বুঝায়। জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না, তাই তাহারা একটি নির্দিষ্টকালের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং এই নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনসাধারণের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করা সকল দেশেই একটা বিশেষ মূল্যবান রাজনৈতিক অধিকার বলিয়া বিবেচিত হয়। ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার অধিকার কাহাদের থাকা উচিত, নির্বাচনব্যবস্থা কি ধরনের হওয়া উচিত, ইহা লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

দেশে যে সমস্ত লোকের ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার অধিকার থাকে, তাহাদের সমষ্টিগতভাবে ভোটদাতৃমণ্ডলী বা নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়।

এখন প্রশ্ন হইল এই নির্বাচকমণ্ডলী কাহারা। ইহার উত্তর হইল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রই ভোটদানের অধিকারী। প্রায় সকল দেশের আইনানুসারে যে সমস্ত ব্যক্তি একুশ বৎসর পূর্ণ করিয়াছে তাহাদের প্রাপ্তবয়স্ক বলা হয়। কারণ একুশ বৎসর পূর্ণ হইলে ধরিয়া লওয়া হয় যে, লোকের বিচার-বুদ্ধি এরূপ একটি স্তরে উন্নীত হয় যখন সে তাহার ভোটদান ক্ষমতা নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করিতে পারে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ও পরবর্তীকালে গ্রেট বৃটেনে আঠার বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিমাত্রকেই প্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া ধরা হয় এবং আঠার বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিমাত্রই এই উভয়দেশে ভোটদানের অধিকারী। আঠার বৎসর ও একুশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিগণের মধ্যে বিচার-বুদ্ধির তারতম্য নিরূপণ করা সহজসাধ্য নহে, তবে একথা বলা যায় যে আঠার বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিগণকে প্রাপ্তবয়স্ক ধরিয়া লইলে গণতন্ত্র আরও ব্যাপক হয়।

Franchise—ভোটদান ক্ষমতা

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণ নিজ ইচ্ছানুসারে যখন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইন-সভাগুলিতে এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে, তখন এই প্রতিনিধিনির্বাচন ক্ষমতাকে ভোটদান ক্ষমতা বলা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণ নিজেদের পছন্দমত প্রার্থীর নামের পার্শ্বে ঢেরা (×) চিহ্ন দিয়া তাহাদের পছন্দ প্রকাশ করেন। এই ভোটদান পদ্ধতি সকল দেশেই গোপনে অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ ভোটদান পদ্ধতি এরূপভাবে পরিকল্পিত ও পরিচালিত হয় যে, ভোটদাতা কাহাকে ভোট দিতেছেন তাহা অপরে জানিতে পারে না। প্রকাশ্যে ভোটদান করিলে অনেক সময় ভোটদাতা তাহার নিজ পছন্দমত ভোট দিতে নাও পারেন এবং তাঁহার নিগৃহীত হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে। এইজন্য সকল দেশেই প্রকাশ্য ভোট দানের (Open Voting) পরিবর্তে গোপন ভোট (Secret Voting) প্রবর্তিত হইয়াছে।

ভোটদাতাগণ যখন ভোটদান করিয়া সরাসরি প্রতিনিধি নির্বাচন করে তখন তাহাকে প্রত্যক্ষ নির্বাচন (Direct election) বলা হয়। আবার প্রাথমিক ভোটদাতাগণ যখন ভোট দিয়া মাধ্যমিক ভোটদাতা নির্বাচন করে এবং এই শেষোক্ত ভোটদাতাগণ প্রতিনিধিগণকে নির্বাচন করে তখন তাহাকে পরোক্ষ নির্বাচন (Indirect election) বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার (Legislative Assembly) সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন কিন্তু কেন্দ্রীয় রাজ্যসভার অধিকাংশ সদস্য পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারঃ ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি —Adult Franchise: Arguments for and against the System

গণতান্ত্রিক আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ভোটদানক্ষমতা আর মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। বর্তমানে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই ভোটদানের অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়। যত অধিক সংখ্যক লোক ভোট-দানের অধিকারী হইবে গণতন্ত্র হইবে তদনুরূপ ব্যাপক। অপরপক্ষে যত বেশী সংখ্যক লোককে ভোটদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইবে

গণতন্ত্রের পরিসর সেই অনুপাতে সঙ্কীর্ণতর হইবে। একটি দেশে যখন আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই ভোটদানের অধিকার থাকে, তখন তাহাকে ব্যাপক বা সার্বজনীন ভোটাধিকার বলা হয়। কিন্তু সার্বজনীন ভোটাধিকার কার্যকর হইলেও একটি দেশের সমস্ত নাগরিকেরই এই অধিকার থাকে না। সমস্ত জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ ভোটদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকে।

ভোটদান-ক্ষমতাকে সাধারণতঃ একটা অধিকার বলা হয়। কিন্তু একদিকে ইহা যেমন একটি অধিকার বলিয়া গণ্য হয়, অন্যদিকে ইহা আবার একটি গুরুদায়িত্ব বলিয়া পরিগণিত হয়। ভোটদান করার অধিকার হউক আর কর্তব্যই হউক, প্রত্যেক ভোটদাতার এই অধিকার অর্জন করিবার ও যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। যেক্ষেত্রে এই অধিকার অর্জনের ও কর্তব্যপালনের ক্ষমতার অভাব দেখা যায়, সেখানে ভোটদান-ক্ষমতা অর্পণ করা সমীচীন নয়। এই কারণে প্রত্যেক সভ্যদেশে অপ্রাপ্তবয়স্ক, বিকৃতমস্তিষ্ক, দেউলিয়া, দুর্বৃত্ত, বিদেশীয় প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদিগকে ভোটাধিকার দেওয়া হয় না।

প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রের ভোটাধিকার নীতির সপক্ষে বলা হয় যে, এই ক্ষমতা ব্যক্তিমাত্রেরই জন্মগত অধিকার। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ভিত্তি হইল জনসাধারণের সমষ্টিগত ইচ্ছা। সমষ্টিগত ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিবার একমাত্র পন্থা হইল সার্বজনীন ভোটাধিকার-দান। ভোটদান করিবার মাধ্যমেই জনসাধারণ শাসনকার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া তাহাদের ইচ্ছাকে কার্যকর করিতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জনগণের সম্মতি তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সুতরাং জনগণের ভোটদান-ক্ষমতা না থাকিলে কোন শাসনব্যবস্থাকেই গণতন্ত্রসম্মত শাসন-ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, শাসকগোষ্ঠী স্বৈরাচারী হইয়া যাহাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে না পারে তজ্জন্য জনগণের ভোটাধিকার একান্ত আবশ্যক। ভোটদান-ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া জনগণ দায়িত্ববোধহীন ও অকর্মণ্য সরকারকে অপসারিত করিয়া নূতন সরকার গঠন করিতে পারে। পরিশেষে বলা যায় যে, রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসাবে সকল নাগরিকই সমান

অধিকার দাবী করিতে পারে। একদল লোককে ভোটাধিকার দান করিয়া অন্য সকলকে একই অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিলে, রাষ্ট্র তাহার সকল নাগরিকের নিকট হইতে সমান আনুগত্য লাভ করিতে পারে না। ফলে, রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়ে ও এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার জন্য নাগরিকের মধ্যে ভেদবুদ্ধি ও ঈর্ষার সৃষ্টি হয়। সার্বজনীন স্বার্থের পরিবর্তে মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। এরূপ রাষ্ট্রকে কখনও কল্যাণরাষ্ট্র বলা যায় না।

প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দান করিবার বিরুদ্ধে মিল, মেইন, লেকি প্রভৃতি মনীষিগণ অনেক যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভোটদান-অধিকার নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করিবার যোগ্যতা যাহাদের নাই, তাহাদের ভোটদান-অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা যুক্তিযুক্ত। মিল্ ভোটদান-ব্যাপারে ভোটদাতার শিক্ষার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যাহারা লিখিতে-পড়িতে জানে না ও গণিত শাস্ত্রের প্রাথমিক সূত্রগুলির সহিত অপরিচিত, তাহাদের ভোটদান-অধিকার দেওয়া সমীচীন নয়। সুতরাং মিলের মতে পূর্বে জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া পরে তাহাদের ভোটদান-অধিকার দেওয়া উচিত ("Universal teaching must precede universal enfranchisement")। শুধুমাত্র লিখিতে-পড়িতে শিখিলে ও অঙ্কশাস্ত্রের প্রাথমিক সূত্রগুলির সহিত সামান্য পরিচয় হইলেই যে লোকের ভোটদানের যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়—এ কথা সত্য নয়। ভোটদান-ব্যাপারে সাধারণ কর্তব্যবুদ্ধি ও হিতাহিতজ্ঞান থাকা আবশ্যক, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও মিলের উক্তির সমর্থন করা যায় না। সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভোটদাতা হিসাবে যে নিরক্ষর ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর তাহা সব সময়ে সত্য নয়। অধিকন্তু বর্তমানকালে দেখা যায় যে, ভিন্নমুখী নানাবিধ মতবাদ-প্রচারের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া শিক্ষিত ব্যক্তির নিজস্ব মতের যতটা বিকৃতি ঘটিবার সম্ভবনা থাকে, অজ্ঞ এবং সংবাদপত্র ও প্রচার-পুস্তিকা পাঠে অক্ষম ব্যক্তির নিজস্ব মতের ততটা বিকৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সাধারণ বুদ্ধি, পরার্থপরতা বা সমষ্টিগত হিতজ্ঞান প্রভৃতি যে গুণগুলি ভোটদানক্ষমতা-প্রয়োগের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়, সেগুলি অশিক্ষিত লোকের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। ভোট-

দানের অধিকার থাকিলে লোকে তাহাদের অন্য অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হইয়া অন্য অধিকারগুলি দাবী করিতে পারে। সুতরাং পূর্বে শিক্ষা বিস্তার, পরে ভোটদান-ক্ষমতার সম্প্রসারণ-নীতি গ্রহণ করা যায় না। মিলের নিজ দেশ ইংলণ্ডেও মিল-বর্ণিত নীতি অনুসৃত হয় নাই। ইংলণ্ডে সংস্কার আইনগুলি পাস করিয়া যত সংখ্যক লোককে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, তদপেক্ষা অল্পসংখ্যক লোকই তখন লিখিতে-পড়িতে পারিত। ভোটদান-ক্ষমতা সম্প্রসারণের ফলে জনগণের শিক্ষাবিস্তারের দাবী স্বীকৃত হইয়া শিক্ষাবিস্তারের পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল।

অনেকে বলেন যে, ভোটদাতার কিছু সম্পত্তির মালিক হওয়া চাই এবং কিছু কর-প্রদানের ক্ষমতা থাকা চাই। সম্পত্তিহীন ব্যক্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্য ও মর্যাদা বুঝিতে পারে না, সেজন্য তাহারা সকল সময়েই ব্যক্তিগত সম্পত্তি যাহাতে নষ্ট হয় সেজন্য সচেষ্ট থাকে। কিন্তু অধুনা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা ভোটদান-অধিকারের একটি যোগ্যতা বলিয়া বিশেষ পরিগণিত হয় না। প্রকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রেরই ভোটদানের অধিকার থাকা উচিত এবং এই প্রকৃত শিক্ষাবিস্তার করা বর্তমান কল্যাণরাষ্ট্রের একটি প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

প্রশ্নাবলী

একাদশ শ্রেণী

প্রথম অধ্যায়

১। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক ইহার বিষয়বস্তু আলোচনা কর।

২। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কি বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে? যুক্তিসহ উত্তর লিখ।

৩। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত (ক) সমাজবিজ্ঞান, (খ) ধনবিজ্ঞান ও (গ) নীতিশাস্ত্রের সম্বন্ধ আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

৪। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর ও ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে কি রাষ্ট্র বলা যাইতে পারে?

৫। সামাজিক চুক্তি মতবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। মতবাদটির গুরুত্ব নির্ণয় কর।

৬। ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ ও বলপ্রয়োগ মতবাদ—এই দুইটির মূল্য নির্ধারণ কর।

৭। তোমার মতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছিল তাহা বর্ণনা কর।

৮। সার্বভৌমিকতা কি? ইহার বৈশিষ্ট্যগুলির বিবরণ দাও।

তৃতীয় অধ্যায়

৯। জাতি গঠনের উপাদান কি কি? ভারতীয়গণকে কি একজাতি বলা চলে?

১০। আত্মনির্ধারণের নীতি বলিতে কি বুঝ? কখন আত্মনির্ধারণের নীতিটির প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে কর?

১১। জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা বলিতে কি বুঝ? তোমার মতে কোন্‌টি ভাল এবং কেন ভাল?

চতুর্থ অধ্যায়

১২। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কি অবস্থায় এবং প্রধানতঃ কোন্ কোন্ রাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় গঠিত হয়? এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

১৩। নিম্নলিখিত সংস্থাগুলির গঠন, প্রকৃতি ও কার্য আলোচনা কর :—(১) নিরাপত্তা পরিষদ, (২) আন্তর্জাতিক আদালত ও (৩) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক সংগঠন।

১৪। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাকার্যে ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করিতে কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা সংক্ষেপে লিখ।

পঞ্চম অধ্যায়

১৫। আইনের সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক ইহার উৎসগুলির বিবরণ দাও।

১৬। আইন ও স্বাধীনতা কি পরস্পর-বিরোধী? যুক্তিসহ উত্তর লিখ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১৭। নাগরিক কাহাকে বলে? কি পদ্ধতিতে নাগরিকতা অর্জন করা যায় বিশদভাবে লিখ।

১৮। নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য বলিতে কি, বুঝ? ভারতে নাগরিকগণের প্রধান প্রধান অধিকারগুলির বিবরণ দাও।

১৯। ভারতের সংবিধানে উল্লেখিত নির্দেশাত্মক নীতিগুলি কি, উদাহরণ সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

২০। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর টিকা লিখ :—

(১) প্রাকৃতিক অধিকার, মৌলিক অধিকার ও (২) অর্থনৈতিক অধিকার।

দ্বাদশ শ্রেণী

সপ্তম অধ্যায়

২১। শাসনতন্ত্রের অর্থ কি? নমনীয় ও অনমনীয় শাসনতন্ত্রের পার্থক্য দেখাও।

২২। ভারতের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

২৩। এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য কর ও ভারতরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রসুলভ প্রকৃতির বিবরণ দাও।

২৪। পার্লামেন্ট-প্রধান ও রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসনব্যবস্থার পার্থক্য দেখাও। ভারতের শাসনব্যবস্থা উপরি-উক্ত কোন্ শ্রেণীভুক্ত যুক্তিসহ তাহা লিখ।

২৫। রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের পার্থক্য কি? ভারতকে কেন প্রজাতন্ত্র বলা হয় তাহার কারণ লিখ।

নবম অধ্যায়

২৬। গণতন্ত্র বলিতে কি বুঝ? ইহার গুণ ও দোষ আলোচনা কর।

২৭। গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের পার্থক্য কর। কি কি অবস্থার উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে?

দশম অধ্যায়

২৮। আইনসভার কার্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।

২৯। ক্ষমতা স্বাতন্ত্র্য-বিধান নীতিটির সত্যাসত্য নির্ণয় কর।

৩০। একক ও সমষ্টিগত শাসনকর্তৃপক্ষের পার্থক্য দর্শাও। ভারতের শাসনকর্তৃপক্ষের অংশগুলির উল্লেখ কর এবং এই শাসনকর্তৃপক্ষ কি একক অথবা সমষ্টিগত তাহা লিখ।

৩১। ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সংক্ষেপে লিখ।

৩২। ভারতের প্রধানমন্ত্রী কি পদ্ধতিতে নিযুক্ত হন? তাঁহার ক্ষমতা ও পদমর্যাদার যথাযথ বিবরণ দাও।

৩৩। দ্বি-পরিষদ আইনসভার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা কর।

৩৪। ভারতের পার্লামেন্ট সভার গঠনপ্রকৃতি ও ক্ষমতা পর্যালোচনা কর।

৩৫। পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার ক্ষমতা আলোচনা কর। এই সভা কি পদ্ধতিতে আইন পাস করে সংক্ষেপে লিখ।

৩৬। ভারতের সুপ্রীম কোর্টের গঠনপ্রকৃতি ও ক্ষমতা আলোচনা কর।

৩৭। বিচারবিভাগের স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝ? ভারতে বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা কি উপায়ে রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার বিবরণ দাও।

৩৮। আমলাতন্ত্র কাহাকে বলে? আমলাতান্ত্রিক সরকারের গুণ ও দোষ আলোচনা কর।

একাদশ অধ্যায়

৩৯। জনমতের প্রকৃতি আলোচনা কর। জনমত গঠনে বিভিন্ন উপাদানগুলির গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৪০। দল-ব্যবস্থার সহিত গণতন্ত্রের সম্পর্ক আলোচনা কর। সংক্ষেপে রাজনৈতিক দলের কার্য আলোচনা কর।

৪১। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য একদলীয়, দ্বিদলীয় বা বহুদলীয় ব্যবস্থা—কোন্‌টি সর্বাধিক সহায়ক? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও।

দ্বাদশ অধ্যায়

৪২। প্রাপ্তবয়স্ক বলিতে কাহাদের বুঝায়? প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার সম্বন্ধে যুক্তিসহ তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবার পর ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শাসনতন্ত্র ৪২তম সংশোধন আইন পাস হয়। ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লোকসভার ষষ্ঠ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের ফলে কংগ্রেস দল কেন্দ্রে ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং ভারতে সর্বপ্রথম জনতা দল কর্তৃক অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পরই জুন মাসে ১১টি রাজ্যের বিধান সভায় ও ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধান সভায় নূতন নির্বাচন হয়। এই সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনার ফলে ভারতের সংবিধানে তথা ভারতের শাসনব্যবস্থায় বহু সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পাঠ্যসূচী অনুযায়ী সেই পরিবর্তনগুলি যথাস্থানে সংযোজিত হইল। ৪২তম সংশোধন আইনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণও পরিশিষ্টের শেষে যোগ করা হইল।

পরিশিষ্ট

ষষ্ঠ অধ্যায়—পৃষ্ঠা ১৩০-১৩১

মূল সংবিধানের আইন অনুসারে সরকার কাহাকেও উপাধি প্রদান করিতে পারিতেন না। কিন্তু পরবর্তীকালে ভারত সরকার প্রধানমন্ত্রীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ভারত-রত্ন, পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী প্রভৃতি উপাধি বিতরণ করিয়া আসিতেছিলেন। কেন্দ্রের বর্তমান জনতা সরকার পূর্বতন কংগ্রেস সরকার কর্তৃক এই উপাধি বিতরণকার্য রদ করিয়া পার্লামেন্ট সভায় একটি ঘোষণা করিয়াছেন। এখন হইতে সরকার শাসনতন্ত্র কর্তৃক ঘোষিত এবং স্বীকৃত সাম্যনীতি-বিরোধী এই উপাধি বিতরণকার্য হইতে বিরত থাকিবেন। জনতা সরকারের এই সিদ্ধান্ত অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও সমর্থন করিয়াছে।

পৃষ্ঠা—১৫৬

শাসনতান্ত্রিক ৪২তম সংশোধনী আইন সংবিধানের ৩৯ (গ) ধারায় বর্ণিত নির্দেশাত্মক নীতিগুলি প্রয়োগ সম্পর্কিত আইনের পরিবর্তন সাধন

করিয়াছে। আদি শাসনতন্ত্রের চতুর্থ ভাগের ৩৯ ধারায় 'খ' ও 'গ' উপসূত্রে বলা হইয়াছিল যে, (খ) জাতীয় নৈসর্গিক সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ এরূপভাবে বণ্টিত হইবে যাহাতে সমষ্টিগত মঙ্গল সাধিত হয় এবং (গ) দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে যাহার ফলে সম্পদ ও উৎপাদনের উপায়গুলি যেন সমষ্টির কল্যাণ ব্যাহত করিয়া কেন্দ্রীভূত না হয়। উপরি-উক্ত দুইটি নির্দেশাত্মক নীতি কার্যকরী করিবার জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিতে পারিত। সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার বা সম্পত্তির অধিকার-বিরোধী বলিয়া এইরূপ রাষ্ট্রপ্রণীত আইন অবৈধ বিবেচিত হইতে পারিত না। বর্তমান সংশোধন আইনে বলা হইয়াছে যে, নির্দেশাত্মক নীতিগুলির যে-কোন একটি অথবা সমগ্রভাবে কার্যকরী করিবার জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং এরূপ আইন মৌলিক অধিকার-বিরোধী বলিয়া অবৈধ বিবেচিত হইবে না। এই সংশোধন দ্বারা সমস্ত নির্দেশাত্মক রীতিগুলি মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে পর্যবসিত হইল। ফলে মৌলিক অধিকারগুলি ইহার পূর্বতন বিশেষ মর্যাদা ও অগ্রাধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। এ সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, মৌলিক অধিকারগুলি হইল ব্যক্তিগত অধিকার, আর নির্দেশাত্মক নীতিগুলি হইল সমষ্টিগত অধিকার। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে সমষ্টিগত অধিকারের প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

৩৯ ধারার (চ) উপধারায় কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে এবং নূতন 'চ' উপধারায় বলা হইয়াছে যে, শিশুগণ যাহাতে স্বাধীনতা ও সম্ভ্রমের পরিবেশে বর্ধিত হইতে পারে সেই সুযোগ ও সুবিধা দিতে হইবে। ৩৯ (ক) ধারায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র দেশের আইন-প্রয়োগ-ব্যবস্থা এরূপভাবে কার্যকর করিবে যাহাতে সমান সুযোগের ভিত্তিতে ন্যায় বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং কোন ব্যক্তিই যাহাতে অর্থনৈতিক কারণে বা অন্য অক্ষমতাহেতু ন্যায় বিচার লাভে বঞ্চিত না হয়।

সংবিধানের ৪৩ ধারায় ৪৩ (ক) ধারা যুক্ত হইয়াছে। এই নূতন ধারা অনুসারে শ্রমিকগণ উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনায় যাহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে রাষ্ট্রকে উপযুক্ত আইন-প্রণয়ন বা অন্য উপায়ে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

নূতন ৪৮ (ক) ধারার মর্ম হইল যে, রাষ্ট্র পারিপার্শ্বিক পরিবেশ রক্ষা

করিবে ও ইহার উন্নতি সাধন করিবে। দেশের বনসম্পদ ও বন্য প্রাণীগুলিকে সংরক্ষণ করিবে।

দরিদ্র ব্যক্তিগণ যাহাতে অর্থনৈতিক কারণে ন্যায় বিচার লাভে বঞ্চিত না হয়—এরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তন দ্বারা সমাজে সাম্যের অধিকার সুদৃঢ় করা হইয়াছে। শ্রমিকগণকে উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার প্রদান করিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রসার সাধন করা হইয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনপ্রতি এক ভোট প্রদান করিলে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও বিচার ব্যবস্থায়ও এই নীতি সমভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং সংবিধানের এই সংশোধন কয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সংশোধন দ্বারা ভারতে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার গোড়াপত্তন করা হইল।

চতুর্থ 'খ' ভাগ

৪২তম শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী আইনের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল ভারতের সংবিধানে নাগরিকগণের ১০ দফা মৌলিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্তি। কর্তব্যগুলি হইল :

(ক) সংবিধান মান্য করা ও ইহার আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানগুলির, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

(to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem)

(খ) যে মহান্ আদর্শগুলি আমাদের স্বাধীনতা লাভের জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল সেই আদর্শগুলিকে পোষণ ও অনুসরণ করা।

(to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom)

(গ) ভারতের সার্বভৌমিকতা, একতা ও অখণ্ডতা সমর্থন করা ও রক্ষা করা।

(to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India)

(ঘ) দেশ রক্ষা করা এবং উক্ত ব্যপদেশে আহ্বান আসিলে জাতীয় সেবামূলক কার্যে নিযুক্ত হওয়া।

(to defend the country and render national service when called upon to do so)

(ঙ) ধর্মগত, ভাষাগত ও স্থানগত বা গোষ্ঠীগত ভিন্নতা অতিক্রম করিয়া ভারতের সমগ্র জনগণের মধ্যে সদ্ভাব ও সাধারণ ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব বর্ধিত করা ; নারীর সম্মানহানিকর আচরণ পরিহার করা।

(to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women)

(চ) উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আমাদের সমৃদ্ধ সংমিশ্র কৃষ্টি মান্য করা ও সংরক্ষণ করা।

(to value and preserve the rich heritage of our composite culture)

(ছ) বনসম্পদ, হ্রদ, নদী ও বন্য প্রাণীসহ আমাদের জাতীয় পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি করা এবং জীবজগতের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা।

(to protect and improve the national environment including forests, lakes, rivers and wild life and to have compassion for living creatures)

(জ) বৈজ্ঞানিক মনোভাব, মানবিকতা এবং অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কারমুখী মন বিকাশ করা।

(to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform)

(ঝ) জনসাধারণের সম্পত্তি রক্ষা করা এবং বল প্রয়োগ পরিহার করা।

(to safeguard public property and to abjure violence)

(ঞ) ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কর্মক্ষেত্রের সর্বত্রই উৎকর্ষের জন্য সচেষ্ট হওয়া যাহাতে সমগ্র জাতি সর্বদা উদ্যম ও কৃতিত্বপূর্ণ কার্যের উচ্চস্তরে উন্নীত হইতে পারে।

(to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievements)

ভারতের সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী আইনে নাগরিকগণের ১০ দফা মৌলিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্তি এই সংশোধনী আইনের একটি বিশেষ অভিনবত্ব।

৭ দফা মৌলিক অধিকারের তুলনায় নাগরিকগণের উপর ১০ দফা মৌলিক কর্তব্য আরোপ করিয়া সংশোধন কর্তৃপক্ষ বোধহয় নাগরিকগণের উপর কিঞ্চিৎ অবিচার করিয়াছেন। তবে সুখের বিষয় যে, এই কর্তব্যগুলি পালন করিবার কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা নাই—এই কর্তব্যগুলি হইল নৈতিক কর্তব্য মাত্র। সুতরাং এই কর্তব্যগুলি পালন করা বা না করা ব্যক্তিগত অভিরুচির উপর নির্ভর করে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত স্টালিন সংবিধানে সর্বপ্রথম নাগরিকগণের মৌলিক কর্তব্য স্থান পায় এবং এই কর্তব্যগুলির সংখ্যা হইল মাত্র ৩+১=৪। শাসনতন্ত্র অনুসারে সোভিয়েত নাগরিকগণের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইল কাজ করা, কারণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলনীতি হইল, যে কাজ করিবে না সে খাইতেও পাইবে না। ভারতের সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী আইন যদিও ভারতকে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে তথাপি নাগরিকগণের কাজ করিবার কর্তব্যের আদৌ কোন উল্লেখ করে নাই। নেপালের সংবিধানে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা নাগরিকগণের প্রধান কর্তব্য বলিয়া স্থান পাইয়াছে। ভারতের সংবিধানে উল্লেখিত অসংখ্য কর্তব্যের তালিকায় উপরি-উক্ত কর্তব্যটির স্থান হয় নাই। ভারতের সংশোধিত সংবিধানের কর্তব্যের তালিকায় নাগরিকগণের উপর আরোপিত পঞ্চম কর্তব্যটির দ্বিতীয়াংশটি সংবিধানে যোজনা করা কতদূর সমীচীন হইয়াছে এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ থাকিতে পারে। এই কর্তব্যটি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতের অধিকাংশ লোক, অন্ততঃ বেশ কিছু লোক নারীর সম্মানহানিকর আচরণে অভ্যস্ত। নব-সংযোজিত কর্তব্যগুলি অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট ও সাধারণ লোকের বোধগম্য নহে। নাগরিকগণ যাহাতে স্বাভাবিকভাবে কর্তব্যগুলি পালন করিতে পারে এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কর্তব্যগুলির তালিকা প্রণয়ন করা অধিকতর ফলপ্রসূ হইত। ইহা ছাড়া বলা যাইতে পারে যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমশৃংখলা রক্ষা করিবার দায়িত্ব নাগরিকগণের বাধ্যতামূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সপ্তম অধ্যায়—পৃষ্ঠা-১৫

১। প্রস্তাবনা সমন্বিত—১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪২তম সংশোধন আইনের দ্বারা প্রস্তাবনার পরিবর্তন করা হইয়াছে। মূল প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলা হইয়াছিল। সংশোধন আইনটি

ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (Sovereign Socialist Secular Democratic) বলিয়া আখ্যা দিয়াছে। প্রস্তাবনায় আরও একটি পরিবর্তন করা হইয়াছে এবং এই পরিবর্তনটি হইল 'ব্যক্তির মর্যাদা ও রাষ্ট্রের সংহতি সুনিশ্চিত করিবার জন্য'—ইহার পরিবর্তে করা হইয়াছে 'ব্যক্তির মর্যাদা ও রাষ্ট্রের সংহতি ও অখণ্ডতা সুনিশ্চিত করিবার জন্য'......

এই সংশোধন দ্বারা ভারত রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্য ও ধর্ম-নিরপেক্ষতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

পৃষ্ঠা-১৯

৯। নির্দেশাত্মক নীতিগুলির ৪২তম সংশোধন আইনের ফলে পরিবর্তিত রূপের বিষয় পরিশিষ্টের ১ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে।

১০। ৪২তম সংশোধন আইনে ভারত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি স্পষ্টরূপে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখিত হইয়াছে।

পৃষ্ঠা-২০

১৪। **সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র**—৪২তম সংশোধন আইন ভারতকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। ভারত সরকার ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য দূর করিয়া ভারতের জনগণের মধ্যে পূর্ণ ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী ভাব সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দটি বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক শব্দটির উল্লেখ না থাকিলেও চলিত। কারণ যখনই ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলিয়া প্রস্তাবনায় ঘোষণা করা হইয়াছে তখনই ইহার সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কারণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যতীত পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইহা ছাড়া নির্দেশাত্মক নীতিগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে সমাজতান্ত্রিক নীতি ঘোষিত হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়—পৃষ্ঠা ৫৬

ভারত সরকারের প্রকৃতি :

৪২তম সংশোধন আইনে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতিকে শাসন পরিচালনা কার্যে সাহায্য করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রীসহ একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে এবং

রাষ্ট্রপতি শাসন পরিচালনা ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অবশ্যই গ্রহণ করিবেন। সুতরাং এই সংশোধন আইন অনুসারে রাষ্ট্রপতি ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় নিছক একজন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতিতে পর্যবসিত হইলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত কোন ক্ষমতা নাই। প্রধান মন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভাই হইল প্রকৃত শাসক এবং শাসনকার্যের জন্য তাঁহারা লোকসভার নিকট দায়ী। সুতরাং ভারতকে বর্তমানে নিঃসন্দেহে একটি পার্লামেন্ট-প্রধান শাসনব্যবস্থা বলা চলে।

দশম অধ্যায়—পৃষ্ঠা-১০১-১২০

মূল শাসনতন্ত্রের ৭৪ (১) ধারা সংশোধিত হইয়াছে। এই সংশোধনে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিবার জন্য একজন প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে। মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্য পরিচালনা করিবেন।

এই সংশোধন দ্বারা রাষ্ট্রপতি পদের পূর্বের শাসনতান্ত্রিক ত্রুটিগুলি দূর করিয়া রাষ্ট্রপতিকে যুক্তরাজ্যের রাজার ন্যায় নিছক নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান-রূপে পর্যবসিত করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি পদে যে বিপুল ক্ষমতা আদি শাসনতন্ত্র কর্তৃক ন্যস্ত হইয়াছিল ও বর্তমান সংশোধন আইন নূতন ক্ষমতা অর্পণ করিল তৎসমুদয়ই স-মন্ত্রিপরিষদ প্রধান মন্ত্রীর দ্বারা পরিচালিত হইবে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে, রাজ্যশাসন ক্ষেত্রে রাজ্যপালের ক্ষমতার (১৬৩ ধারা) অনুরূপ কোন পরিবর্তন করা হয় নাই।

পৃষ্ঠা—১০৯

রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতির তিন প্রকার জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা আছে।

১। প্রথমত, যুদ্ধ ঘটিলে বা আক্রমণাত্মক কার্য অনুষ্ঠিত হইলে অথবা আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে অথবা এই বিপদগুলি কার্যতঃ না ঘটিলেও প্রত্যাসন্ন বলিয়া বিবেচিত হইলে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের শাসনতান্ত্রিক অষ্টাত্রিংশ সংশোধন আইনে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতি খুশি হইলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে

পারেন এবং এ বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্তই হইল চূড়ান্ত—এইরূপ ঘোষণার বৈধতা কোন বিচারালয় প্রশ্ন করিতে পারে না। উক্ত আইনে আরও বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতি একই সঙ্গে বিভিন্ন কারণে একাধিক প্রকার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন এবং একপ্রকার জরুরী অবস্থা থাকাকালে অন্য প্রকার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের শাসন-তান্ত্রিক ৪২তম সংশোধন আইনে আরও বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতি সমগ্র ভারত অথবা ইহার যে-কোন অংশের জন্য জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন।

২। রাজ্যগুলির শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা-সংক্রান্ত ঘোষণা

এইরূপ ঘোষণা পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে এক বৎসর করিয়া ঘোষণাটির মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া তিন বৎসরের অধিক কাল পর্যন্ত ইহাকে বলবৎ রাখা চলিবে না।

৩। অর্থ-সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণা

উপরি-উক্ত তিন প্রকার জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং কোন বিচারালয়ের বিচারযোগ্য নহে।

রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন-সংক্রান্ত বিরোধ

১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের শাসনতন্ত্র ৩৯তম সংশোধন আইন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন-সংক্রান্ত বিরোধ ভারতের সুপ্রীম কোর্টের বিচার্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের শাসনতন্ত্র ৪২তম সংশোধন আইন এই ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের এলাকা বহির্ভূত করিয়া একটি সংসদের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছে। এই সংসদ পার্লামেন্ট সভা কর্তৃক নিযুক্ত হইবে। সুতরাং বর্তমানে রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের বৈধতা বিচার করিবার অধিকার কোন বিচারালয়েরই নাই। প্রধানমন্ত্রী ও লোকসভার অধ্যক্ষের নির্বাচন-সংক্রান্ত বিরোধের ক্ষেত্রেও এই আইন প্রযোজ্য হইবে। কিন্তু এই আইন সম্প্রতি পরিবর্তিত হইয়া—সুপ্রীম কোর্টের হস্তে বিরোধ-নিষ্পত্তির ক্ষমতা পুনরায় দেওয়া হইয়াছে।

পৃষ্ঠা—১৪৮

লোকসভা ও রাজ্যবিধান সভাগুলির কার্যকাল ৫ হইতে ৬ বৎসরে বৃদ্ধি করা হইল এবং পূর্বতন লোকসভার কার্যকালও এই আইন অনুসারে এক

বৎসর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সংশোধন আইন দ্বারা পার্লামেন্ট সভার উপস্থিতির সংখ্যা (কোরাম) সংক্রান্ত নিয়ম দুইটি (১০০ ধারার ৩-৪) বাতিল হইল।

পার্লামেন্ট ও রাজ্য আইনসভা-সংক্রান্ত দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হইল যে, পার্লামেন্টের যে-কোন কক্ষের কোন সদস্য যদি নির্ধারিত অযোগ্যতার দায়ে অভিযুক্ত হন বা পার্লামেন্ট সভা বা রাজ্য আইনসভার কোন নির্বাচনে অসাধু পন্থা অবলম্বনের দায়ে অভিযুক্ত হন তাহা হইলে এইরূপ অভিযোগ ও তাহা প্রমাণ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তির প্রকৃতি ও পরিমাণ একমাত্র রাষ্ট্রপতি নির্ধারণ করিবেন ও এসম্পর্কে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে অবশ্যই নির্বাচন সংসদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

সংশোধন আইন অনুসারে রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত সমুদয় ক্ষমতা স-মন্ত্রিপরিষদ প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হইবে। সুতরাং সদস্যগণের যোগ্যতা বা অযোগ্যতা এবং নির্বাচনে সাধু অথবা অসাধু উপায় অবলম্বন করা এবং অযোগ্যতা ও অসাধুতার ক্ষেত্রে শাস্তিপ্রদান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিচার বিভাগের এলাকা হইতে শাসন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

পার্লামেন্ট বা রাজ্য আইনসভার সদস্যগণ কি কি সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হইবেন তাহা সংশ্লিষ্ট আইনসভাই স্থির করিবেন।

আইনসভার 'কোরাম' (কার্যকরী উপস্থিতির) সম্পর্কিত নিয়মও আইনসভাগুলি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

পৃষ্ঠা—১৪৯-১৫০

১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লোকসভার নূতন নির্বাচনে কংগ্রেসের যে ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে ও জনতা পার্টির অভ্যুত্থান হয়, সেই নূতন লোকসভা ২২টি রাজ্য ও ৯টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি হইতে নিম্নলিখিত সংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত হইয়াছে।

রাজ্য

অন্ধ্রপ্রদেশ—৪২
আসাম—১৪
বিহার—৫৪

রাজস্থান—২৫
উত্তরপ্রদেশ—৮৫
পশ্চিমবঙ্গ—৪২

গুজরাত—২৬	হরিয়ানা—১০
মহারাষ্ট্র—১৮	জম্মু ও কাশ্মীর—৬
কেরল—২০	হিমাচল প্রদেশ—৪
মধ্যপ্রদেশ—৪০	নাগাভূমি—১
তামিলনাড়ু—৩৯	মণিপুর—২
কর্ণাটক—২৮	মেঘালয়—২
উড়িষ্যা—২১	ত্রিপুরা—২
পাঞ্জাব—১৩	সিকিম—১

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল

দিল্লী—৭	লাক্ষাদ্বীপ—১
গোয়া, দমন, দিউ—২	দাদ্রা ও নগরহেভেলি—১
অরুণাচল প্রদেশ—২	পণ্ডিচেরি—১
চণ্ডিগড়—১	মিজোরাম—১
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ—১	= ৫৪২

বর্তমান লোকসভায় বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা :

জনতা—৩০০, কংগ্রেস—১৫২, মার্কসবাদী সাম্যবাদী—২২, এ আই এ ডি এম কে—১৯, ভারতের সাম্যবাদী—৭, আকালী—৮, আর এস পি—৪, ফরওয়ার্ড ব্লক—৩, ডি এম কে—১, আর সি পি আই—২, আর ডব্লু পি—৫, মুশলিম লীগ—২, কেরল কংগ্রেস—২, নির্দল—১২, এন সি—২।

পৃষ্ঠা—১৬০

১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ৯টি রাজ্যের বিধান সভায় পুনর্নিবাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই ৯টি রাজ্য ব্যতীতও তামিলনাড়ু ও জম্মু-কাশ্মীরেও নূতন নির্বাচন হয়। দিল্লী, পণ্ডিচেরি, গোয়া, দমন, দিউ এই তিনটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলেও পুনর্নিবাচন হয়। নূতন বিধান সভাগুলির সদস্যসংখ্যা জনসংখ্যার ভিত্তিতে বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে নিম্নলিখিত সংখ্যায় ধার্য হইয়াছে :

হরিয়ানা—৯০	রাজস্থান—২০০	উড়িষ্যা—১৪৭
পাঞ্জাব—১১৬	মধ্যপ্রদেশ—৩২০	পশ্চিমবঙ্গ—২৯৪
হিমাচল প্রদেশ—৬৮	তামিলনাড়ু—২৩৪	জম্মু ও কাশ্মীর—৭৬
উত্তরপ্রদেশ—৪২৫	বিহার—৩২৪	

অন্যান্য রাজ্যগুলিতে আগামী বৎসর মার্চ মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে বিধান সভাগুলির বর্ধিত আসন সংখ্যা স্থির হইবে। পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু এবং জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত অন্য ৮টি রাজ্যে নব-গঠিত জনতা দল বিধান সভাগুলিতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছে। ত্রিপুরা, গুজরাট ও সিকিম রাজ্যে কংগ্রেস দল ভাঙ্গিয়া জনতা সরকার গঠন করিয়াছে। ত্রিপুরায় মার্ক্সবাদী সাম্যবাদী দল জনতাদলের সহিত যুক্ত সরকার গঠন করিয়াছেন।

জম্মু ও কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থা—

বর্তমানে কাশ্মীর রাজ্য ভারতের প্রধান হিসাবরক্ষকের, নির্বাচন সংসদের ও সুপ্রীম কোর্টের বিশেষ নির্দেশ এক্তিয়ারভুক্ত হইয়াছে। প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী গান্ধীর সহিত কিছুদিন পূর্বে শেখ আবদুল্লার যে চুক্তি হয় তাহার ফলে প্রধান মন্ত্রী কাশ্মীরের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ক্ষুণ্ণ করিবেন না এই আশ্বাস দানে শেখ সাহেব তাঁহার গণভোট দাবী প্রত্যাহার করেন। কিন্তু বিগত দুই মাসের মধ্যে কাশ্মীরের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কেন্দ্রে জনতা দল কর্তৃক সরকার গঠিত হওয়ার পর কাশ্মীরের সরকার কংগ্রেস সমর্থন হারায় এবং ইহার ফলে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। অতঃপর সেখানে রাজ্যপালের শাসন চালু হয়। কয়েকদিন পূর্বে কাশ্মীর রাজ্যে নূতন নির্বাচন হয় এবং নির্বাচনের ফলে শেখ আবদুল্লার জাতীয় সভা (National Conference) বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হইয়া শেখ সাহেবের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। জনতা ও কংগ্রেস দল যথাক্রমে মাত্র ১৩টি ও ১০টি আসন সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে। অবশ্য, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও নব-গঠিত কাশ্মীর সরকার উভয়ের সহিত উভয়ে সহযোগিতা করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই এম এর নেতৃত্বে বামজোট সরকার গঠন করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের ফল নিম্নে দেওয়া হইল।

বামজোট—সি পি আই এম—১৭৮, ফঃ বঃ—২৫, মার্কসবাদী ফঃ বঃ—৩, আর এস পি—২০, আর সি পি আই—৩, বিপ্লবী বাঃ কঃ—১ = ২৩০

জনতা—২৯, কংগ্রেস—২০, এস ইউ সি আই—৪, সি পি আই—২,

গোর্খা লীগ—২, সি পি আই এম এল—১, মুসলীম লীগ—১, নির্দল—৪ = ৬৩ = ২৯৩

একটি নির্বাচন কেন্দ্রে পরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

পৃষ্ঠা—১৭৪

৪২তম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা সুপ্রীম কোর্টের বিচার-সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হইয়াছে।

(ক) কেন্দ্রীয় আইনের সাংবিধানিক বৈধতা বিচারের ক্ষমতা একমাত্র সুপ্রীম কোর্টের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে।

(খ) কিন্তু রাজ্য আইনসভা প্রণীত কোন আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের নাই। তবে কোন রাজ্য আইনের সহিত যদি কেন্দ্রীয় আইন জড়িত থাকে, তাহা হইলে সেরূপ ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট সেই আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারিবেন।

(গ) কোন একটি মামলাকে সুপ্রীম কোর্ট এক উচ্চ বিচারালয় হইতে অন্য উচ্চ বিচারালয়ে স্থানান্তরিত করিতে পারেন।

(ঘ) যে-কোন কেন্দ্রীয় বা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনের সাংবিধানিক বৈধতা বিচারের জন্য সুপ্রীম কোর্টের অন্যূন সাতজন বিচারপতির উপস্থিতি অপরিহার্য এবং মোট বিচারপতিগণের অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ব্যতীত উক্ত আইনকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা চলিবে না।

পৃষ্ঠা—১৭৬

বর্তমানে ফৌজদারী মামলা পরিচালনার জন্য বিচার বিভাগীয় হাকিম (Judicial Magistrate) নিযুক্ত হইয়াছেন।

পৃষ্ঠা—১৭৭

৪২তম শাসনতন্ত্র সংশোধন আইন পাস করিয়া উচ্চ বিচারালয়গুলির ক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস করা হইয়াছে।

১। কোন উচ্চ বিচারালয় কেন্দ্রীয় আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারিবে না।

২। রাজ্য আইনের বৈধতা বিচার ক্ষেত্রে উচ্চ বিচারালয়ের কম পক্ষে ৫ জন বিচারপতির উপস্থিতি প্রয়োজন। উপস্থিত ৫ জন বিচারপতির দুই-তৃতীয়াংশ বিচারপতি কর্তৃক সমর্থিত হইলে উক্ত আইন অবৈধ হইবে। যে

রাজ্যে বিচারপতির সংখ্যা ৫ জনের কম সেখানে উচ্চ বিচারালয়ের সকল বিচারপতির উপস্থিতি অপরিহার্য।

৩। উচ্চ বিচারালয়গুলি বর্তমানে যে-কোন উদ্দেশ্যে আদেশ, নির্দেশ বা লেখজারী করিতে পারিবেন না। কেবলমাত্র দুইটি বিশেষ ক্ষেত্রে উচ্চ বিচারালয়গুলি এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন। বৈধ আইন লংঘন অথবা কোন কর্তৃপক্ষের পদ্ধতিগত অবৈধতার জন্য অত্যধিক ক্ষতি সাধিত হইলে এবং অন্য কোন আইনের সাহায্যে প্রতিকারের ব্যবস্থার অবর্তমানে উচ্চ বিচারালয়গুলি এইরূপ আদেশ, নির্দেশ ও লেখজারী করিতে পারিবেন।

৪। সাধারণতঃ উচ্চ বিচারালয়গুলি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ (Interim Orders) জারী করিতে পারিবেন না। কোন ক্ষেত্রে এরূপ আদেশ জারী করিবার প্রয়োজন হইলে বিপক্ষ দলকে নোটিশ দিতে হইবে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হইবে।

৫। রাজস্ব, জমিজমা, চাকুরি সম্পর্কিত বিরোধ মীমাংসা উচ্চ বিচারালয় আর করিতে পারিবেন না। এই সকল বিরোধ নিষ্পত্তি ট্রাইবিউনালের (Tribunal) হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। তবে উচ্চ বিচারালয় ট্রাইবিউনালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারে।

শাসনতন্ত্র দ্বিচত্বারিংশ সংশোধন আইন, ১৯৭৬—প্রধানতঃ শরণ সিং কমিটির সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর এই বিলটি লোকসভায় উত্থাপিত হয়। কিছু নূতন প্রস্তাব উক্ত বিলে সংযোজিত হইয়া এই বিলটি লোকসভা, রাজ্যসভা, অধিকাংশ রাজ্য ও পরিশেষে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করিয়া আইনের মর্যাদা পায়। বিলটিতে সর্বসমেত ৫৯টি ধারা আছে।

৪২তম সংশোধন দ্বারা মূল শাসনতন্ত্রের যে সমুদয় পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

১। সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের' স্থলে 'সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' কথাগুলি ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, প্রস্তাবনায় উল্লিখিত 'জাতীয় ঐক্য' শব্দগুলির স্থলে 'জাতীয় ঐক্য ও সংহতি' (Unity and integrity of the Nation) যোজনা করা হইয়াছে।

২। এই সংশোধনে বলা হইয়াছে যে, নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে রূপায়িত করিতে গিয়া কোন আইন যদি সাম্যের অধিকার (১৪নং ধারা), স্বাধীনতার অধিকার (১৯নং ধারা) ও সম্পত্তির অধিকার (৩১নং ধারা) ক্ষুণ্ণ করে তাহা হইলেও উক্ত আইনকে কোনক্রমেই অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করা যাইবে না। ইহার ফলে নির্দেশাত্মক নীতিগুলি মৌলিক অধিকারগুলির উপর স্থান পাইল।

৩। জাতীয়তা-বিরোধী সংঘ ও কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করিবার ক্ষমতা পার্লামেন্টের হস্তে ন্যস্ত করা হইল। এই উদ্দেশ্যে পার্লামেন্ট প্রণীত আইন সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার ও সম্পত্তির অধিকারের পরিপন্থী হইলেও বাতিল করা যাইবে না।

৪। সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে কয়েকটি নূতন নির্দেশাত্মক নীতি যোগ করা হইয়াছে। যথা, শিশুগণ যাহাতে একটি স্বাস্থ্যকর, মর্যাদাসম্পন্ন ও স্বাধীন পরিবেশে মানুষ হইবার সুযোগ লাভ করে এবং শিশুকাল ও যৌবন হইতে শোষণ ও পার্থিব দুঃখ-দুর্দশার হস্ত হইতে রক্ষা পায় তজ্জন্য রাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ করিবে। দরিদ্র ব্যক্তিরা যাহাতে বিনা ব্যয়ে আইনের সাহায্য পায় তাহার ব্যবস্থা রাষ্ট্র করিবে, শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা রাষ্ট্র করিবে, ইত্যাদি।

৫। সংবিধানের চতুর্থ অংশের সহিত ৪ক নামে একটি নূতন অংশ যোজনা করিয়া ভারতীয় নাগরিকগণের দশ দফা মৌলিক কর্তব্য পালনের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কর্তব্যগুলি পরিশিষ্টে ৩ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে।

৬। সংশোধন দ্বারা সংবিধানের ৭৪ (১) ধারাটির সংশোধন করিয়া রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছে।

৭। লোকসভার ও রাজ্যবিধান সভাগুলির কার্যকালের মেয়াদ ৫ হইতে ৬ বৎসরে বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

৮। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভার সদস্যগণের যোগ্যতা বা নির্বাচন-সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। অবশ্য এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন সংসদের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে।

৯। আইনসভাগুলির সদস্যগণের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা সদস্যগণই স্থির করিবেন।

১০। আইনসভাগুলির উপস্থিতির সংখ্যা (কোরাম) নির্ধারণের নীতিও তাঁহারা স্থির করিবেন।

১১। সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতার বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে যাহা পরিশিষ্টের ১২ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে।

১২। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের হিসাব-পত্র রাখিবার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রধান হিসাবপরীক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন।

১৩। এই সংশোধনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহার দ্বারা রাজ্য উচ্চ বিচারালয়গুলির ক্ষমতা বিশেষভাবে হ্রাস হয়। পরিশিষ্টের ১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৪। পার্লামেন্ট আইন-প্রণয়নের মাধ্যমে ট্রাইবুনাল গঠন করিয়া সরকারী কর্মচারীসমূহের চাকুরি-সংক্রান্ত সর্altবিধ বিরোধ মীমাংসা করিতে পারিবে। ইহা ছাড়া, শিল্প, ভূমি সংস্কার, খাদ্য সংগ্রহ ও বন্টন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত বিরোধও সংশ্লিষ্ট আইনসভা আইন বলে ট্রাইবুনাল গঠন করিয়া নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

১৫। ভারত সরকার যে-কোন অঙ্গরাজ্যে আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ করিতে পারিবে।

১৬। রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনবোধে দেশের যে-কোন অংশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন। রাজ্যগুলিতেও তিনি শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। কিন্তু এরূপ ঘোষণা পার্লামেন্টের সম্মতি ব্যতীত দুই মাসের অধিক কাল বলবৎ থাকিতে পারে না। বর্তমান সংশোধনের ফলে পার্লামেন্ট প্রতিবার ১ বৎসর করিয়া বৃদ্ধি করিয়া ৩ বৎসর পর্যন্ত কার্যকর রাখিতে পারে।

১৭। এই সংশোধনের ফলে সংবিধান সংশোধনের বৈধতা বিচার করিবার ক্ষমতা বিচারালয়ের এলাকা বহির্ভূত করা হইয়াছে। তবে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংবিধান সংশোধিত হইয়াছে কিনা তাহা বিচারালয় বিচার করিতে পারিবে।

১৮। পার্লামেন্ট আইন-প্রণয়ন সাহায্যে সর্বভারতীয় বিচার বিভাগীয় কৃত্যক (All-India Judicial Service Commission) সৃষ্টি করিতে পারিবে।

১৯। সরকারী কর্মচারিগণ কেবলমাত্র তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান চলাকালে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাইবেন। পূর্বের ন্যায় শাস্তিদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আর তাঁহারা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুবিধা পাইবেন না।

২০। ৪২তম সংশোধনের সাহায্যে শিক্ষাকে (Education) রাজ্য তালিকা হইতে যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

কোন দেশের সংবিধানই চিরকালের জন্য অনমনীয় রাখা সম্ভব নয়। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সংবিধানের সময়োচিত পরিবর্তন আবশ্যক। ভারতের সংবিধান এক বিশেষ অবস্থায় দ্রুতগতিতে এবং কতিপয় বিদেশী শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে মূলতঃ বৃটিশ সরকারের নির্দেশে স্বল্প সংখ্যক ভারতীয় নেতাগণ কর্তৃক রচিত হয়। এই সংবিধান বহু অস্পষ্টতা, পুনরুক্তি, জটিলতা ও অনাবশ্যক বিষয়ের অবতারণা দোষে দুষ্ট। সুতরাং ইহার সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু ক্ষমতাসীন দল জনমত উপেক্ষা করিয়া শুধু দলীয় একনায়কত্ব চিরস্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে মূল সংবিধানের এরূপ কতিপয় সংশোধন করিয়াছেন যাহাতে ভারতে গণতন্ত্রের প্রসার রুদ্ধ হইয়া স্বৈরতন্ত্র প্রসারের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। সংবিধানের আপত্তিকর সংশোধনই হইল নির্বাচনে কংগ্রেস দলের শোচনীয় পরাজয়ের অন্যতম কারণ।

———